সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

মানা, সপ্রাণবাদ ও জীববাদ

আদিম ধর্মবিশ্বাসের উৎস সন্ধান করতে গিয়ে বিভিন্ন নৃবিজ্ঞানী ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ সৃষ্টি করেছেন— যেগুলির মধ্যে জীববাদ বা আত্মাবাদ (animism), সপ্রাণবাদ (animatism) ও মানাধারণা (mana) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই মতবাদগুলি প্রত্যেকে সমানভাবে মেনে নেননি, অর্থাৎ মতবাদগুলি বিতর্কিত। কারোর মতে আদিম মানুষের ধর্মবিশ্বাস যেভাবে গড়ে উঠেছে, তাতে জীববাদই সমর্থিত হতে পারে; কেউ মনে করেন সপ্রাণবাদেই তার ব্যাখ্যা স্পষ্ট হয়। আবার কোনো কোনো বিজ্ঞানী শুধু mana-কেই ধর্ম উন্মেষের একমাত্র কারণ বলে মনে করেন।

আদিম ধর্মবিশ্বাসের সূচনা কীভাবে হল— এ প্রশ্নের নৃবিজ্ঞানভিত্তিক উত্তর সর্বপ্রথম ই.বি. টাইলর-এর কাছ থেকেই পাওয়া যায়। তিনি তাঁর জীবাত্মাবাদ (animism) তত্ত্বে বলেন যে মানুষ ঘুমের মধ্যে বিভিন্ন স্বপ্ন দেখে, ঘুমের মধ্যে দুরান্তরে পাড়ি দেয়, শিকার করে, কথা বলে; আবার জেগে উঠে তার ভুল বুঝতে পারে এবং বিস্মিত হয়। ফলে স্বভাবতই আদিম মানুষ স্বপ্ন বিষয়টির ব্যাখ্যা চায় এবং ধ'রে নেয় মানুষের ভিতর দু'ধরনের প্রাণবস্তু বা আত্মা বিদ্যমান, একটি মুক্ত-আত্মা বা স্বাধীন আত্মা (free soul) এবং অন্যটি দেহগত আত্মা বা শারীরিক আত্মা (body soul)। মুক্ত আত্মা যে কোনো সময়— বিশেষত ঘুমের সময় দেহের বাইরে বের হয়ে ঘুরে ফিরে বেড়াতে পারে এবং সেই আত্মা পুনরায় দেহেব ভিতর প্রবেশ করলে মানুষের ঘুম ভেঙে যায়। স্বপ্ন হল মুক্ত আত্মার বাইরের জগতে পরিভ্রমণের সময়কালীন অভিজ্ঞতা। কিন্তু দৈহিক আত্মা দেহ থেকে মুক্ত হলে মানুষের মৃত্যু হয়। টাইলরের ধারণা, আদিম মানুষের বিশ্বাস ছিল আত্মা অবিনশ্বর। কেননা মানুষ মৃত মানুষের স্বপ্ন দেখে, তার সঙ্গে কথা বলে, এছাড়া আত্মা অমর বলেই মৃত মানুষের আত্মা (দেহগত আত্মা) ভূত-প্রেতে পরিণত হয়। এই কারণে বহু আদিবাসী সমাজে দ্বৈত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া (double funeral) দেখা যায়। মানুষের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে হয সবুজ অন্ত্যেষ্টি (green funeral) এবং বেশ কিছুদিন পরে হয় শুষ্ক অন্ত্যেষ্টি (dry funeral)। হিন্দুদের ক্ষেত্রেও দেখা যায় প্রায় একবৎসর পরে মৃতের আত্মার উদ্দেশে গয়ায় পিণ্ডদান করা হয় এবং এই সময় যে 'বাৎসরিক কাজ' সম্পন্ন হয়, তা আসলে দ্বিতীয় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। 'বাৎসরিক কাজ' ক্ষেত্র বিশেষে ছ'মাস পরেও কেউ কেউ সম্পন্ন করেন, কিন্তু এই অনুষ্ঠান না হলে সাধারণত ঐ পরিবারে বিবাহ ইত্যাদি শুভকাজ করা যায় না। সুতরাং এটি যে প্রকৃতপক্ষে শুষ্ক অন্ত্যেষ্টি তা বলাই বাহুল্য। যাই হোক টাইলরের এই মতবাদ বলে যে, এই আত্মার কল্পনা থেকেই ক্রমে বিভিন্ন

ধর্ম-সংস্কার এবং দেবতা-কল্পনার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ। স্যার হারবার্ট স্পেনসারও জীববাদকে সমর্থন করেছেন। অর্থাৎ ওই আদিম মানব সমাজ অশরীরী ভৌতিক আত্মাকে সন্তুষ্ট রাখতে চেয়েছে (তাদের ধারণা আত্মা রুষ্ট হলে অমঙ্গল সাধন করে), তাই পূর্ব পুরুষ ও সমাধিস্তম্ভ পুজোর সূচনা এবং কালক্রমে ধীরে ধীরে মানুষের ধর্ম-সংস্কার-ধর্মবিশ্বাসের পরিণতি ঘটে।

টাইলরের এই মতবাদ মানুষের ধর্মবিশ্বাসের প্রথম সোপান ব'লে কোনো কোনো নৃতাত্ত্বিকের কাছে গৃহীত না হলেও, তাঁরা মনে করেন আত্মার ধারণা অভ্রান্ত, কিন্তু তা অনেক পরে ধীরে ধীরে মানুষের কল্পনায় সৃষ্টি হয়েছিল। কেননা সভ্যতার ঊষালগ্নে আদিম মানুষ নিঃসন্দেহে এতটাই চিন্তাশীল ছিল না যে প্রথম অবস্থাতেই তাদের দ্বারা এ সম্পর্কে একটি সংহত (concrete) ধারণা গড়ে তোলা সম্ভবপর হবে। তাই টাইলরের বিরুদ্ধে অনেকের অভিযোগ হ'ল এই যে : ...Tylor made a philosophic and a rationalist out look of primitive man, which he certainly is not and must never have been.[১]

এছাড়া কোনো কোনো নৃতত্ত্ববিদ মনে করেন যে, বর্তমানে অনেক উপজাতি, এমনকি সুসভ্য জাতির মধ্যেও আত্মা সম্বন্ধে বিশেষ কোনো স্পষ্ট ধারণা দেখা যায় না। কাজেই এই মতবাদটিকে সার্বিক ও যথার্থ বলে মনে করা সমীচীন নয়। ফলে অনেকেই মনে করেন আদিম মানব সমাজে অনিবার্যতই একটি প্রাক-জীবাত্মাবাদী (pre-animistic) ধ্যান-ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল এবং এরই ভিত্তিতে নৃবিজ্ঞানী আর. আর. ম্যারেট (R. R. Marrett) সর্বপ্রাণবাদ বা সপ্রাণবাদ (animatism) নামক মতবাদটির উদ্ভব ঘটান। সপ্রাণবাদ আসলে জড়পূজা— প্রাণহীন বস্তুতেও প্রাণের আরোপ। তাঁর মতে, আদিম মানুষের শিশুসুলভ মানসিকতা বিশ্বের সবকিছুকেই প্রাণময় মনে করেছিল, যেহেতু জড়বস্তুও স্থানচ্যুত হয়, তার রূপ বদলায় (তা অবশ্যই প্রাকৃতিক কারণে)। যেমন গাছের পাতা নড়ে, মেঘ ভেসে বেড়ায়, নদী প্রবাহিত হয় ইত্যাদি।

ম্যারেটের সপ্রাণবাদ আরো সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে মানাবাদের ছায়ায়। বস্তুত এই কারণে অনেকে সপ্রাণবাদের দু'টি পর্যায়ের কথা বলেন। একটি হল জড়বস্তুকে বা সব জিনিসকে প্রাণবান মনে করা, দ্বিতীয়টি মানা।

মেলানেশীয় ও পলিনেশীয়রা বিশেষ এক অতিপ্রাকৃত শক্তিকে বিশ্বাস করে, যাকে তারা 'মানা' (mana) বলে উল্লেখ করে। ব্রিটিশ ধর্মযাজক আর. এইচ. করডিংটনই এই বিষয়টিকে সকলের নজের আনেন। 'মানা' বিশেষ এক প্রকার নৈর্ব্যক্তিক শক্তি (impersonal force) যা যাবতীয় জাগতিক বস্তুর উপর প্রভাব বিস্তার ক'রে তাকে অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন বা উৎপাদনশীল ক'রে তুলতে পারে। যেমন, ক্ষেত্রে বা বৃক্ষে যদি অধিক পরিমাণে ফসল বা ফল উৎপন্ন হয়, তাহলে ধরে নিতে হবে ঐ ক্ষেত্রে বা বৃক্ষে 'মানা'র অস্তিত্ব আছে;— অন্তত মেলানেশীয়দের তাই বিশ্বাস। আবার মানা ভূত-প্রেতের সঙ্গেও সম্পর্কযুক্ত। তাই মড়ার হাড়ে সেই মৃত

ব্যক্তির বিশেষ শক্তি সঞ্চিত থাকে, যাকে স্পর্শ করিয়ে অন্য ক্ষেত্রে কাজে লাগানো হয়। প্রাচীন যাদুকরের যাদুদণ্ডে (যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মৃত পশু বা মানুষের হাড়) 'মানা' বা তার সমরূপ নৈর্ব্যক্তিক শক্তি নিহিত আছে বলেই যাদুকর যাদুদণ্ড স্পর্শ করিয়ে অভীষ্ট সাধন করতে সক্ষম হয়। এই নৈর্ব্যক্তিক সঞ্চরণক্ষম শক্তিকে বিদ্যুৎশক্তির সঙ্গে তুলনা করা যায় এবং বিদ্যুৎশক্তির মতই, '... it can be channelled, directed and used to achieve a desired end by one who knows how to manipulate it.'[২] পৃথিবীর বিভিন্ন আদিবাসী, এমনকি সভ্য সমাজেও কম বেশি 'মানা'র সমরূপ শক্তির অস্তিত্ব দুর্লক্ষ্য নয়। যেমন বেশ কিছু আমেরিকান আদিবাসীর কাছে যা ওরেন্দা (Orenda), বা ভারতের ছোটনাগপুর অঞ্চলে বসবাসকারী কোনো কোনো আদিবাসীর কাছে যা বোঙ্গা (Bonga), পলিনেশীয়দের কাছে তাই-ই আসলে মানা (mana)। অতএব জীবাত্মাবাদ, সর্বপ্রাণবাদের মত মানাবাদের মধ্যেও একটা সার্বিক বিস্তৃতি ও সত্য লক্ষ্য করা যায়। উল্লেখ্য জীবাত্মাবাদের মত অন্য দুটি মতবাদও সমালোচিত। তবু বলা যায় এগুলি মানবধর্ম বিকাশের ইতিহাসে পরস্পরের পরিপূরক মতবাদ— বিশেষত মানার ধারণা ও এ সম্পর্কিত মতবাদটি এ প্রসঙ্গে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আবার এই ধারণা বা বিশ্বাসগুলি থেকেই যে মানুষের যাদু সংক্রান্ত আচার বিশ্বাস গড়ে উঠেছে, তা বলাই-বাহুল্য। বাংলা লোকসাহিত্যের বিভিন্ন অঙ্গনে আত্মা সম্পর্কিত প্রাগুক্ত ধারণা যে কি স্বচ্ছন্দে প্রকাশ লাভ করেছে এবার তা লক্ষ্য করা যেতে পারে:

লোকসঙ্গীতে আত্মা-অনুষঙ্গ

লোকসঙ্গীতের বিপুল ভাণ্ডারে— বিশষত লৌকিক বাউল গানে বিভিন্নভাবে আত্মার অস্তিত্ব ও বিচিত্র কর্মক্ষমতা প্রকাশলাভ করেছে। যেমন:

১। 'আসি ধর্ম হেন কালে হরিশ্চন্দ্রের প্রীতিবলে
বাঁচাইব মড়া ছেলে ভাবনা কর কেনে।
পদ্ম হস্ত বুলাইয়া দিল পুত্রে বাঁচাইয়া
রাজা রাণী লোটাইয়া পড়ে ধর্মের চরণে।'[৩]

এখানে ধর্মের হস্তের ছোঁয়ায় মৃতব্যক্তি প্রাণ ফিরে পায়, অর্থাৎ দেহগত আত্মা দেহে পুনঃপ্রবেশ করে— এ কথাই বলা হয়েছে।

২। 'তুমি আত্মা কর্তা, তুমি হে জগতের পিতা,
তোমা বিনে নাই ক্ষমতা, এই অধীনে দিওগো নিস্তার।'
(বাউল)

— উদ্ধৃত গানে স্পষ্টতই আত্মার সর্বব্যাপী অস্তিত্বের কথাই ঘোষিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, আত্মাই যে সর্বশক্তির উৎস, সমস্ত কর্মের নিয়ন্ত্রক তাও স্বীকার করা হয়েছে।

৩। 'ও মন, দেখরে চেয়ে আজব তামাসা,
স্বর্গ মর্ত্য রসাতল জুড়ে এক পাখীর বাসা।
সকলে রয়েছে সে বাসায় বাসা দেখা যায় রে।
ধরতে গেলে ধরা নাহি যায় বাসায়।[৪]

(বাউল)

বাউল গানে সর্বদাই পাখি শব্দটি আত্মার রূপক হিসেবে ব্যবহৃত; আলোচ্য গানে আত্মার সর্বব্যাপী অস্তিত্বের কথা যেমন বলা হয়েছে তেমন আত্মা যে অধরা ও অদৃষ্ট, তাও স্বীকার করা হয়েছে। শুধু বাউল নয়, জাভা, বোর্ণিও বা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বসবাসকারী কতিপয় উপজাতি আত্মা যে পাখির মত— এমন বিশ্বাস পোষণ করে। কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে তারা চাল ইত্যাদি শস্য ছড়িয়ে, পাখি ডাকার মত মুখে বিশেষ আওয়াজ ক'রে গমনোদ্যত আত্মাকে ধ'রে রাখতে চায়।[৫]

ঘুমপাড়ানি ছড়া ও আত্মাবাদ

অনেকে মনে করেন ঘুমপাড়ানি ছড়াগুলির মধ্যে কোথাও কোথাও ইতিহাসের কিছু অস্পষ্ট প্রতিফলন থাকলেও সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই।

কিন্তু এই ঘুমপাড়ানি ছড়াগুলি যদি আমরা একটু অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করি তবে দেখব, এখানে শিশুর চোখে ঘুমকে এক বিশেষ শক্তি হিসেবে আবাহন করা হয়েছে এবং এর বিপরীতধর্মী ছড়াগুলিতে ঘুমকে বিদায় নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। ঘুম আদিম মানুষের কাছে নিঃসন্দেহে এক রহস্যময় বিষয় বলে গণ্য হয়েছিল কেননা মৃত্যু এবং ঘুম— এ দুয়ের পার্থক্য ও কারণ মানুষ অনুসন্ধান করতে চেয়েছে, তাই মুক্ত বা স্বাধীন আত্মা ও শরীরী আত্মার অস্তিত্ব কল্পিত হয়েছে— পূর্বেই আমরা তা আলোচনা করেছি। আমাদের ঘুমের ছড়াগুলিতে স্বাধীন আত্মাকে দেহ থেকে চলে যাবার অনুরোধ ক'রে মা তার সন্তানকে ঘুম পাড়ান না— এমনকি কোনো দেশেই তা হয় না। বরং এই ছড়াগুলিতে ঘুমই আত্মা হিসেবে কল্পিত হয়; তাকে উদ্দেশ করেই মা-মাসির আবেদন-নিবেদন। তাই ঘুম কখনো হয় মাসি, কখনো পিসি এমনকি কখনো হয় মা। এ সম্পর্কে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য 'বাংলার লোকসাহিত্য (দ্বিতীয় খণ্ড)' গ্রন্থে বলেছেন 'ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি স্বপ্ন ও নিদ্রার জগতের দূতী', — 'তিনি পক্ষী জাতীয় কোন জীব; কারণ খিড়কির দুয়ার দিয়া তিনি ফুড়ুৎ করিয়া উড়িয়া গিয়া থাকেন।' তিনি মর্ত্য-মানবী নন, নিদ্রার অধিষ্ঠাত্রী দেবী! —এ থেকে বোঝা যায়, মা-মাসি-পিসি — যাই বলা হোক না কেন, এই রূপ-কল্পনায় লোক-সমাজের আত্মাবাদ সংক্রান্ত ধারণাটিই আসলে প্রতিফলিত হয়েছে। এক অদৃশ্য শক্তিই (স্বাধীন আত্মা) মানুষের ঘুমের জন্য দায়ী— এই প্রচ্ছন্ন বিশ্বাসই ঘুমের ছড়াগুলির মধ্যে বিভিন্নভাবে প্রকাশ পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ সংগৃহীত একটি ছড়া এ প্রসঙ্গে উদ্ধৃত না ক'রে পারা যায় না :

"ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি আমার বাড়ি এসো।
শেজ নেই মাদুর নেই পুঁটুর চোখে ব'সো।।
বাটা ভরে পান দেব গাল ভরে খেয়ো।
খিড়কি দুয়ার খুলে দেব ফুড়ুত করে যেয়ো।।"

আবার ঘুমের আত্মা 'নিদ্রালি মা' বলেও সম্বোধিত হয়, ড. ভট্টাচার্যের সংগ্রহ থেকে উদ্ধৃত হল চট্টগ্রামের একটি ছড়া:

'নিদ্রালি মাউরে আমার বাড়ীত্ আইস।
খাট নাই পালঙ নাই,
পিঁড়ি দিতাম জাগা নাই,
আমার মণির চখের উপর বৈস।।'

কখনো আবার ঘুমের এই আত্মা ঘুমের পরী হিসেবে কল্পিত হয়েছে ঃ

'ঘুমের পরী আসে যায়
আঁধার ঘরের আঙ্গিনায়
চুপি চুপি আয়রে ঘুমের পরী ...'

ঘুমের পরী আসে এবং সে যেন ঘুম পাড়িয়ে চলে যায়। আমাদের ছড়ায় ঘুমই যেন সজীব আত্মা। সে আসে বলেই খোকা ঘুমিয়ে পড়ে, সে চ'লে গেলে খোকা জেগে ওঠে। কিন্তু লোকমানসের অজানা নয় যে ঘুম মানুষের বিশেষ এক শারীরিক অবস্থা। তবু সরাসরি ঘুমকেই সম্বোধন ক'রে আহ্বান করা হয় বা চলে যেতে বলা হয় কেন? উত্তরে বলা যায় ঘুমের কারণ ও তার ফলশ্রুতি ঘুম— এ দু'টি বিষয় লোকমানসে সম্ভবত আলঙ্কারিক প্রয়োজনে সমার্থক হয়ে ওঠে। কেননা 'ঘুম' বিষয়টি মানুষের কাছে অতি স্পষ্ট এবং লোকসাহিত্যে বহুল ব্যবহৃত সমাসোক্তি অলঙ্কার ব্যবহার-প্রবণতায় অদৃষ্ট ঘুমের কারণের স্থলে 'ঘুম' বিষয়টিকে স্থাপন করা সহজসাধ্য। তবু তর্কের খাতিরেও যদি স্বীকার করা হয় যে, এই ঘুম সম্বন্ধীয় 'স্বাধীন আত্মার' ধারণা লোকমানসে বিদ্যমান নেই, তথাপি ঘুম যে বিশেষ কোনো আত্মা সংক্রান্ত অদৃষ্ট অ-শরীরী শক্তি তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। তদুপরি ঘুমের আসা-যাওয়ার বর্ণনায় ও ঘুমকেই প্রত্যক্ষভাবে সম্বোধন করার মধ্যে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়—

'ঘুম আয় ঘুম
নিশিথ নিঝুম
এই বেলা ছেড়ে খেলা দিয়ে যারে চুম্।'

কিংবা

'হাটের ঘুম বাটের ঘুম
পথে পথে ফিরে।'

অথবা

'আয় ঘুম আয় বাগদি পাড়া দিয়ে'। ইত্যাদি।

ঘুমকে চলে যেতে বলার মধ্যেও একই সুরের অনুরণন :

১. 'ঘুম যারে দুধের বাছা ঘুম যারে তুই।
নাকুয়া কলাত পড়গে বাদুড় ধাফাই আইয়ম মুই।'

২. 'অলি অলি বাঁশ পাতার অলি।
উত্তর দক্ষিণের অলি বাছা ঘুম যা।।'

৩. 'ঘুম যারে ঘুম যা
বাদুড়ানির ছা।
বাদুড়ানি ত ঘরত নাই
পাড়িয়া ঘুম যা।'[৬]

—সুতরাং এখানে ঘুম যেন এক বিদেহী আত্মা। যেভাবে তাকে আহ্বান করা হয়, সেভাবেই তাকে চ'লে যেতে বলা হয়। আসলে এই ঘুমপাড়ানি ছড়াগুলিতে ঘুমের কার্য-কারণ সম্পর্ক ব্যাখ্যাত হয়নি,— কারণ তার অবকাশ নেই, আবার ঘুম ও আত্মা সংক্রান্ত ধারণাও একেবারে প্রচ্ছন্ন থাকেনি। কিন্তু বিভিন্ন লৌকিক মন্ত্রে সরাসরি আত্মাকে স্বীকার করার অবকাশ থাকে। মানুষের শরীরে আত্মা আসা-যাওয়া করতে পারে বলেই, মানুষের মধ্যে কখনো কখনো দুষ্ট আত্মা প্রবেশ ক'রে রোগ ব্যাধির সৃষ্টি করে ব'লে লোকমানসের বিশ্বাস। মন্ত্র পড়ে বিভিন্ন ক্রিয়াচারের দ্বারা ব্যাধিগ্রস্ত মানুষের দুষ্ট আত্মাকে ওঝা দেহ থেকে বিতাড়িত ক'রে তার রোগমুক্তি ঘটায়। যেমন একটি মন্ত্র দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থাপিত হতে পারে :

'জলসার জলসার / মহা জলসার
আল্লা ও নবীর / করি সোরসার।
মারি হাক/করি ফাক
আফত্ আর বালা / জলদি ছাড়ি পালা।
দোহাই আল্লাজীর / দোহাই নবীজীর।'[৭]

কাজেই স্বচ্ছন্দে বলা যায় ঘুমপাড়ানি ছড়াই হোক বা 'মন্ত্র'র ছড়াই হোক,-- প্রতিক্ষেত্রেই মানুষের আত্মা সংক্রান্ত ধ্যান-ধারণার চিহ্ন এগুলি বহন ক'রে চলেছে। আর ঘুমের ছড়াগুলিতে খুব অস্পষ্ট হ'লেও ঘুম ও আত্মা সম্পর্কিত লোকমানসের যে বিশ্বাস তার প্রতিফলন আছে। রূপকথার বিভিন্ন গল্পে তা আরও স্পষ্ট। তাই দেহকে ফেলে রাজপুত্রের আত্মা যথেচ্ছ ভ্রমণ ক'রে পুনরায় দেহে প্রবিষ্ট হয় হামেশাই। রূপকথার প্রসঙ্গে বিষয়টি দৃষ্টান্তসহ আলোচিত হবে।

প্রবাদ-প্রবচনে আত্মা

বাংলা প্রবাদে বা বচন-প্রবচনে বিভিন্নভাবে আত্মাবাদ সংক্রান্ত ধ্যান-ধারণার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়,— বিশেষত দেহ বা জীবনকেন্দ্রিক প্রবাদে। দেহ যে কতটা অন্তঃসার শূন্য ও পল্কা, প্রাণ-ভ্রমরের অস্তিত্বই যে জীবের সকল শক্তির উৎস —এই সত্য অকপটে স্বীকৃত হয়েছে। যেমন—

১. আইলে দম, না আইলে বেদম।

— অর্থাৎ প্রাণ বা আত্মাই সমস্ত জৈবিক ক্ষমতার একমাত্র উৎস বা শক্তি। আরো উদাহরণ—

২. পদ্মপত্রে জল, জীবের আয়ুষ্কাল।

৩. দেহ রক্ষা করা।

৪. তেল থাকলেও বাতি নেবে, হায়াত থাকলেও লোকে মরে।

৫. ধূলার শরীর ধূলাতে মিশাবে।

৬. দেহের বড়াই করো না ভাই, এই আছে এই নাই।

— উপর্যুক্ত উদাহরণগুলিতে স্পষ্টতঃই স্বীকার করা হয়েছে যে দেহ বস্তুতঃপক্ষে পঞ্চভূতের সমষ্টি, অদৃশ্য শক্তি বা আত্মা পঞ্চভূতের জড়দেহকে প্রাণময় ক'রে তোলে, আবার সেই আত্মা যে কোন সময়েই দেহ থেকে মুক্ত হতে পারে। কাজেই জীবের অস্তিত্ব দেহে নয়, তা নশ্বর, আসলে ঐ আধিভৌতিক আত্মাই মূল কথা।

ধাঁধায় আত্মা সম্পর্কিত ধারণার প্রতিফলন

বিষয় বৈচিত্র্যের দিক থেকে বাংলা লৌকিক ধাঁধা বিশেষভাবে সমৃদ্ধ। এমন কোনো বিষয় নেই, যা নিয়ে ধাঁধা রচিত হয়নি। কাজেই মানবাত্মা, মৃত্যু ইত্যাদি বিষয়ও ধাঁধার উপজীব্য হয়েছে। যেমন—

'ওড়ার কান্দি কোড়ার বাসা।/লাল টুকটুক করে
সোনা কইতর উইড়া গ্যালে।/কে ধরিতে পারে।' (প্রাণ)

—সোনার কবুতর উড়ে গেলে তাকে আর ধরা যায় না। এই অধরা শক্তি বা আত্মার স্বরূপ মানুষের কাছে আজও রহস্যাবৃত। মানুষ তথা জীবের সামগ্রিক অস্তিত্বের কারণ এই আত্মা, যে কোন মুহূর্তে প্রাণীদেহ বা খোলস পরিত্যাগ করতে পারে। অনুরূপ আর একটি দৃষ্টান্ত :

'ছিট্‌কি গাছের তলে সাপ ভুড় ভুড় করে
সোনার কইতর উড়ে গেলে কে ধরতে পারে।'

পরমায়ু তথা আত্মা সম্বন্ধে একটি কাব্যধাঁধা লক্ষণীয়, যেখানে আত্মাকে 'সেজন' বলে ঘোষণা করা হয়েছে।—

'সুরিক্ষা কহিছে তাকে সর্ব্বলোকে খায়
অথচ কেমন কেহ দেখিতে না পায়।।
যথাকালে সেজন যখন যায় ছেড়্যা।
সকল সয়াল সুখ সব থাকে পড়্যা।।
সদাই চঞ্চল কিন্তু সংসার ব্যাপিত।
বুঝ্যা দেখি বল সেন বট শাস্ত্রবিৎ।।

বস্তুত এমন আরো দৃষ্টান্ত বিরল নয়। বাংলা ধাঁধায় স্বাভাবিকভাবেই এই আত্মা বিষয়বস্তু হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

কথা

বিচিত্র লোককথার মধ্যে আত্মাবাদ বিষয়টি বিভিন্নভাবেই এসে পড়েছে। শুধুমাত্র বাংলা লোককথাতেই নয়, পৃথিবীর প্রায় যাবতীয় লোককথায় বিষয়টি যে বিধৃত তা Stith Thompson-এর 'মোটিফ ইনডেক্স'ই বলে দেয়। লোকমানসের বিশ্বাস অদৃশ্য আত্মাকে প্রয়োজনে দেহ থেকে বিবিক্ত করে কোনো গোপন জায়গায় সংরক্ষিত ক'রে রাখা যায়, আবার প্রয়োজনে দেহে ফিরিয়ে আনাও সম্ভব। আবার কতিপয় লোকসমাজের বিশ্বাস হ'ল, আত্মা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, দৃশ্যমান, বস্তুতুল্য, তাকে ছোঁয়া যায়, হাতে ক'রে স্থানান্তরিত করা যায়, এমনকি ভেঙে টুকরো টুকরো করা যায়।[৮] কিন্তু পৃথিবীর বেশিরভাগ লোকসাহিত্যের মত বাংলা লোকসাহিত্যে আত্মাকে অদৃশ্য বস্তু হিসেবেই কল্পনা করা হয়। এবারে বাংলা লোককথা থেকে কয়েকটি দৃষ্টান্ত চয়ন করা যাক :

১। 'ডালিম কুমার,[৯] গল্পে দেখা যায় যে, ডালিমকুমারের প্রাণ বা আত্মা পুকুরে একটি বোয়াল মাছের পেটে একটি সুন্দর বাক্সের মধ্যে স্থিত একটি হারের মধ্যে আবদ্ধ। দুয়োরাণী কৌশলে সেই হারটি হস্তগত করে। যে মুহূর্তে মাছটি ধরা পড়ে, তৎক্ষণাৎ ডালিমকুমার অসুস্থ হয়ে পড়ে, এবং হারটি দুয়োরাণী গলায় পরামাত্র ডালিমকুমারের মৃত্যু হয়। রাত্রে দুয়োরাণীর কাছে প্রত্যহ রাজা আসেন এবং হারটি তখন রাণী খুলে রাখলে ডালিমকুমার বেঁচে ওঠে। অর্থাৎ দেহগত আত্মা অন্যত্র আবদ্ধ থাকলে দেহে মৃত্যুর লক্ষণ ফুটে ওঠে এবং লোকচেতনায় আত্মার দেহবিবিক্ত হয়ে অন্যত্র আবদ্ধ থাকার বিষয়টি অত্যাশ্চর্য কিছু নয় (External Soul E. 710)।

'কচুপাতায় প্রাণ' ব্রতকথায় এক ব্রাহ্মণের ছয়টি পুত্র জন্ম নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়। অবেশেষে সপ্তম সন্তানের জন্ম হলে সে একেবারে অনাদরে বড় হয়। তার সাতমাস বয়স হলে ব্রাহ্মণ তার অন্নপ্রাশন করতে চায়। ব্রাহ্মণ সমস্ত ঠাকুরের পূজা করেছে কিন্তু একাচোরা ঠাকুরের ব্রত করেনি। ফলে অন্নপ্রাশনের দিনে কুপিত হয়ে একাচোরা ঠাকুর তাঁর পুত্রের প্রাণ কচুপাতায় পুরে কদমগাছে লুকিয়ে পড়েন। বনদুর্গার নির্দেশে অবশেষে ব্রাহ্মণ তাঁকে সন্তুষ্ট করলে পুনরায় ব্রাহ্মণের সন্তানটি প্রাণ ফিরে পায়।

এখানে আত্মাকে ইচ্ছেমত দেহ থেকে নিয়ে কোনো বস্তুর মধ্যে লুকিয়ে রাখার কথা বলা হয়েছে। আর আত্মার অনুপস্থিতিতে দেহ যেমন প্রাণহীন হয়ে পড়ে, তাকে বিশেষ ক্ষমতাবলে দেহে স্থিত করায় দেহ আবার প্রাণ ফিরে পায়।

২। মৃতের পুনর্জীবনপ্রাপ্তি বহু লোককথার অন্যতম বৈশিষ্ট্য দেহ বিবিক্ত আত্মা কোনো ঐন্দ্রজালিক বস্তুর সংস্পর্শে পুনরায় দেহে প্রবেশ করে এবং সেক্ষেত্রে মৃতব্যক্তি পুনরায় জীবিত হয়ে ওঠে। যেমন— 'কাজলরেখা' গল্পে সন্ন্যাসী প্রদত্ত ঐন্দ্রজালিক শক্তিসম্পন্ন পাতার স্পর্শে রাজপুত্র বেঁচে উঠেছে।

'শঙ্খনাথ' ব্রতকথায় দেখা যায় সন্ন্যাসী একশ' সাতটি নরবলি দিয়েছে। এবারে শঙ্খনাথকে বলি দিলেই তার অভীষ্ট সিদ্ধ হবে। কিন্তু তার পূর্বেই শঙ্খনাথ সন্ন্যাসীকে

বলি দিয়ে তার রক্ত ও মায়ের ফুল কাটা মুণ্ডগুলিতে ছিটিয়ে দিলে তাদের পুনর্জীবন লাভ হয়।

'ষাটাই' ব্রতকথায় দেখা যায় ব্রাহ্মণকন্যা ষাটাই মা ষষ্ঠীর ব্রত করতে ভুলে গিয়েছিল, পরিণামে তার ষাট ছেলে, মেয়ে, বউ, জামাই সবাই ঢলে পড়ল অর্থাৎ মারা গেল। অতঃপর ব্রাহ্মণ বহু সাধ্য সাধনায় মা ষষ্ঠীকে তুষ্ট করলে, তিনি অমৃতকুণ্ডের জল মৃতদেহগুলিতে তিনবার ছিটিয়ে দেবার নির্দেশ দিলেন। ব্রাহ্মণ ঐ জল ছিটিয়ে দিতেই পুনরায় সকলে জীবন ফিরে পায়।

সোনার কাঠি রূপার কাঠির বিষয়টি রূপকথার বহুগল্পেই লক্ষ্য করা যায়। সোনার কাঠির স্পর্শে মৃত রাজকন্যা প্রাণ ফিরে পায় বা জেগে ওঠে. রূপার কাঠির স্পর্শে রাজকন্যা প্রাণত্যাগ করে বা ঘুমিয়ে থাকে। অর্থাৎ এখানে কাঠির ঐন্দ্রজালিক শক্তি আত্মার উপর কর্তৃত্ব করে। যেমন 'পদ্মরাগ' গল্পে ছোটরাজপুত্র অকস্মাৎ নাড়াচাড়া করতে গিয়ে সোনার কাঠিটি দ্বিখণ্ডিত রাজকন্যার দেহে স্পর্শ করালে, রাজকন্যা প্রাণ ফিরে পায়।

৩। আবার এও দেখা যায় যে বিশেষ কারণে যমদূতেরা আত্মাকে গ্রহণ করতে অসমর্থ হয়, ফলে ভাগ্যে মৃত্যু লেখা থাকলেও ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে না। যেমন— 'মালঞ্চমালা' গল্পে বারোবছরের মালঞ্চমালাকে রাজা ডাইনী ভেবে শাস্তি দিলেও বারো দিনেব মৃত রাজপুত্র-স্বামীকে (অর্থাৎ রাজপুত্রের আত্মাকে) মালঞ্চমালার গভীর পতিপ্রেম-নিষ্ঠার জন্যই যমদূত, কালদূত ও শালদূত, ছিনিয়ে নিতে পারে না এবং রাজপুত্র পুনরায় জীবন ফিরে পায়।

সর্বপ্রাণবাদের ধারণা অনুযায়ী আত্মা অমর, তা যেমন পুনরুজ্জীবিত হয় (পুনরুজ্জীবন) তেমনি বিভিন্ন বস্তু, প্রাণী বা বৃক্ষের মধ্যে অন্তঃস্থিত হতে পারে এবং বৃক্ষ বা প্রাণীরূপে জন্মও নিতে পারে। বিষয়টি রূপকথার বিভিন্ন গল্পে লক্ষ্য করা যায়। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার সংগৃহীত 'সাত ভাই চম্পা' গল্পে দেখা যায়, একে একে ছোটরাণী সাতটি ছেলে ও একটি মেয়ের জন্ম দিল। বড় রাণী হিংসার বশবর্তী হয়ে ছেলে সাতটি ও কন্যাটিকে পাঁশ গাদায় পুঁতে ফেলল। সাত ভাই সাতটি চম্পা ও বোনটি পারুল গাছে পরিণত হল। অর্থাৎ মৃতদেহ থেকে গাছের জন্ম হয়েছে এবং মৃতের আত্মা গাছে সংক্রমিত হয়েছে —এই বিষয়টিই এখানে প্রাধান্য পেল।

'বেণুবতী'[১০] গল্পের প্রাসঙ্গিক অংশ লক্ষনীয়: 'বড় তিন বউ একত্র হইয়া বেণুবতীকে প্রহার করিতে করিতে মারিয়া ফেলিল এবং খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া কুটিয়া মাংসগুলি একটা নির্জন স্থানে ফেলিয়া দিল। ফেলিয়া দেওয়ার কিছুকাল পরে সে স্থানে একটি ঝুমকো লতার গাছ হইল। গাছটি সবুজ পাতায় রাশি রাশি ফুলে অপূর্ব শোভা ধারণ করিল।' এখানেও 'সাতভাই চম্পা'র মত মৃতদেহ থেকে ঝুমকো লতার গাছ উদ্ভূত হয়েছে। এইভাবে মৃতদেহ থেকে বৃক্ষাদির জন্ম বহু রপকথায় সহজলভ্য।

নৃতাত্ত্বিক শরৎ চন্দ্র মিত্র এ প্রসঙ্গে বলেছেন যে, মৃত ব্যক্তির আত্মা যে বৃক্ষ

কিংবা ফুলে রূপান্তরিত হতে পারে, যা নাকি লোক কাব্য কাহিনী কিংবা ব্যালাডে লক্ষিত হয়, তা আসলে আদিম বিশ্বাসেরই ক্রমাগ্রসর ধারা, কিংবা তার ভগ্নাংশ, কিছুটা হয়ত পরিমার্জিত সেই আদিম দর্শনের রূপান্তর, যা শুধু মানুষের মধ্যেই বা জীবজন্তুর মধ্যেই নয়, উদ্ভিদ জগতের মধ্যেও প্রকাশিত এমনকি উদ্ভিদেরও আত্মা আছে ব'লে মনে করা হয়।[১১] বস্তুত মানব সভ্যতার স্বাধীন বিস্তৃতির (Polygenesis) সাধারণ লক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত এই এনিমিজম্ নামক বিষয়টি মানুষের সহজাত বোধ থেকে স্বতোৎসারিত, কাজেই মানুষ, প্রাণী বা উদ্ভিদ— যে কোনো দেহাবরণ থেকে অবিনশ্বর মুক্ত আত্মা অন্য দেহাবরণে যেমন নবরূপ লাভ করতে পারে, তেমন অন্য জীব বা বৃক্ষেও রূপান্তরিত হতে পারে।

রূপকথার রাক্ষস চরিত্র ও জীবাত্মাবাদ

আমাদের রূপকথাগুলিতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে রাক্ষস চরিত্র। অনেকেই বলেন, রাজপুত্রকে যদি রূপকথার নায়ক পদে অধিষ্ঠিত দেখি, তবে রাক্ষস হল খলনায়ক। এখন নৃতত্ত্বের আলোকে আমরা বিচার করে দেখতে পারি রাক্ষস চরিত্র উদ্ভবের কারণ কী, রাক্ষসদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মূলেই বা কোন স্মৃতি অথবা অভিজ্ঞতা কার্যকরী হয়েছে।

প্রখ্যাত লোকসংস্কৃতিবিদ ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য রাক্ষসদের বৈশিষ্ট্যগুলিকে এইভাবে বর্ণনা করেছেন :

"আত্মা যে দেহ ছাড়িয়া যথেচ্ছ ভ্রমণ করিতে পারে আদিম জাতির ধর্মবিশ্বাসে এখনও ইহার স্থান দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন লোক-সমাজের মধ্যে এখনও এমন বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে, নিদ্রিত মানুষের আত্মা দেহত্যাগ করিয়া ইচ্ছামত ভ্রমণ করিতে পারে। ইহাও আদিম বিশ্বাসের একটি মার্জিত রূপ মাত্র। এই আদিম বিশ্বাস হইতেই মানুষ কিংবা দৈত্য-দানবের আত্মা স্ফটিক স্তম্ভে ভ্রমরের মধ্যে কিংবা বৃক্ষস্থ কোন ফলের মধ্যে লুক্কায়িত থাকিতে পারে বলিয়া কল্পনা করা হয়"।[১২]

বস্তুতপক্ষে আত্মার সর্বত্র বিচরণগামিতার বিশ্বাস আদিম জাতির মানুষের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। রাক্ষসের আত্মা কল্পনাতে সেই প্রাচীন বিশ্বাসেরই প্রতিফলন।

রূপকথায় দেখা যায় রাক্ষসরা ইচ্ছামত রূপ পরিগ্রহ করতে সক্ষম, তারা নর ও নারী দুই হতে পারে, আর তাছাড়া তারা নরমাংসাহারী। প্রখ্যাত নৃতাত্ত্বিক ডারউইনের Theory of Evolution বা বিবর্তনবাদ প্রচারিত হলে ইউরোপের নৃতত্ত্ববিদ্গণ পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের আদিম অর্ধসভ্য এবং সভ্য মানুষের বিভিন্ন ধরনের আচার-ব্যবহার, প্রথা, বিশ্বাস. রীতিনীতি থেকে মানব. জাতির প্রাচীন ইতিহাসের উপাদান আবিষ্কারে সচেষ্ট হলেন। E.B. Tylor, George Frazer, Andrew Lang-এর মত নৃতত্ত্ববিদ্গণ নানা তথ্যাদির উদঘাটন করতে থাকলেন। পৃথিবীব্যাপী সর্বত্র একই প্রকার বিশ্বাস সংস্কার কিংবা একই রকমের প্রাচীন প্রথার

আবিষ্কারে নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে পৃথিবীব্যাপী বিভিন্ন দেশের রূপকথায় যে রাক্ষস কিংবা অসংখ্য ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়ার পরিচয় পাওয়া যায় তা কেবল তৎকালীন ভারতেই নয়, সমস্ত পৃথিবীতেই পরিব্যাপ্ত ছিল।

Andrew Lang-এর মতে রূপকথায় যেমন প্রাচীন সমাজ প্রতিফলিত, তেমনি রাক্ষস চরিত্রও প্রাচীন সমাজ-জীবনকেই মনে করিয়ে দেয় : 'They are the relics of the ancient custom of survival from an archaic mental condition... The more barbaric the people, the more lack of distinction mark their usages, ritual, myth and tales. The more civilised the people, the less of these elements appear in their ritual, usages and myth.'[১৩]

অর্থাৎ লোককথা কিংবা রূপকথাগুলি প্রকৃতিতে খুবই প্রাচীন, সভ্যতার অগ্রগতি গল্পগুলির অবয়বে কিছুটা মার্জিত আবরণ এনে দিয়েছে মাত্র, আর কালের ব্যবধানে মানুষ আজ বহু প্রাচীন বিশ্বাস, সংস্কার কিংবা আচরণ বিস্মৃত হয়েছে,— হয়ে চলেছে। মোটের উপর লোককথা,— বিশেষ করে রূপকথাগুলি আজ 'Savage Fancy'-র নিদর্শন।

নৃতত্ত্ববিদরা দেখিয়েছেন রাক্ষসরা আসলে প্রাচীন কালের নরমাংস আহারকারী cannibalদেরই প্রতিভূ, তাদেরই প্রতিফলন ঘটেছে রাক্ষস চরিত্রে। Van Gannep, P. O. Bodding-এর মত নৃতাত্ত্বিকেরা স্পষ্টতঃই জানিয়েছেন যে রাক্ষসরা Primitive বা আদিম নরমাংসাহারী Cannibal ব্যতীত আর কিছু নয় : "The raksas really represent some race or other, with which the people has been in some enimical contact, people with strange and not understood habits, looked upon as savages in comparison with the narrators race and consequently held in fear."

ড. আশরাফ সিদ্দিকীও রাক্ষসদের স্বরূপ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে জানিয়েছেন 'সেই আদিম যুগের অর্ধসভ্য মানুষ (Aryans) যখন দলবদ্ধভাবে বাস করতো, তখন তারা নরমাংস আহারকারী অরণ্যাচারী অসভ্য (Non-Aryans) মানুষদের বুঝতে পারতো না। তাদের সঙ্গে যুদ্ধে বা সংঘর্ষে অনেক সময়ই তারা বিপর্যস্ত হতো, তাদের দ্বারা ভক্ষিতও হত। অর্থাৎ এ রাক্ষসগণই ছিল Cannibal বা নরমাংস আহারকারী।'[১৪]

আজ আমরা জানি যে পৃথিবীর বিভিন্ন আদিম জাতির মানুষই নরমাংস আহারে অভ্যস্ত, এটি একটি আদিম প্রথা। বিখ্যাত নৃবিজ্ঞানী Mac Cullochও জানিয়েছেন যে পৃথিবীর বহু আদিম জাতি, তাদের মৃত আত্মীয় স্বজনের মাংস আহারে অভ্যস্ত ছিলো। কিন্তু অনার্যরাই নয়, ভারতবর্ষে নর্ডিক আর্যরাও— যারা বর্ণবিভাগের সময় নিজেদের ব্রাহ্মণ বলে ঘোষণা করেছিলেন, তারাও নরমাংস আহারে অভ্যস্ত ছিলেন বলে কোনো কোনো নৃতাত্ত্বিক মনে করেন। তাঁদের মত : "নরমাংস ভক্ষণের প্রতি ব্রাহ্মণদের যে বিশেষ লোলুপতা ছিল, তার প্রমাণ আমরা পাই মহাভারতের বনপর্বে

বর্ণিত শিবি রাজার উপাখ্যানে। একদিন এক ব্রাহ্মণ শিবি রাজার কাছে এসে বলেন— 'আমি অন্নপ্রার্থী, তোমার পুত্র বৃহদগর্ভকে বধ ক'রে, তার মাংস পাক করে আমার প্রতীক্ষায় থাক।' শিবি তাঁর পুত্রের পক্ক-মাংস একটি পাত্রে রেখে ব্রাহ্মণের প্রতীক্ষায় রইলেন। এ থেকে বুঝা যায় যে জাতিশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণও অন্নপ্রার্থী হয়ে নরমাংস ভক্ষণে আগ্রহী হত।" সেই সঙ্গে তিনি বলেছেন যে শীতের দেশে আর্যদের আদিম বাসস্থান থাকায় তারা ছিল মাংসাশী। দেবতার নামে তারা জীব উৎসর্গ আরম্ভ করেছিল নরমেধ যজ্ঞ দিয়ে। 'তারপর ক্রমিক বিবর্তনের ধারাবাহিকতার ভিতর দিয়ে, তারা আরম্ভ করেছিল অশ্বমেধ, গোমেধ, মেষমেধ ও ছাগমেধ যজ্ঞ। এই ছাগমেধ যজ্ঞের পরই তাঁরা ভূমিকর্ষণ দ্বারা শস্য উৎপাদন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করেছিলেন।'[১৫]

সে যাই হোক, প্রাগুক্ত কারণ ছাড়াও নরমাংস আহারের প্রতি মানুষের আগ্রহ ছিল অন্য কারণে। তা হল নিঃসন্দেহে ঐন্দ্রজালিক কারণ। ফ্রেজার, লোয়েব, কোচ্ প্রমুখ বহু নৃবিজ্ঞানীর মতে বহুক্ষেত্রে অনেক আদিম জাতিতে অকর্মণ্য বৃদ্ধকে হত্যা করে যেমন আহার করা হত, তেমন এরূপ বিশ্বাসও প্রচলিত ছিল যে বৃদ্ধ অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানে সমৃদ্ধ, তাছাড়া তিনি যাদুশক্তির অধিকারী (Sorcerer), তাই বৃদ্ধের মাংস আহারের মধ্যে দিয়ে তাঁর অর্জিত গুণগুলিরও অধিকারী হওয়া সম্ভব হবে। অনেক সময়ে মৃতদেহের বিশেষ অংশ যেমন মগজ, কলজে ইত্যাদি ভক্ষণ করারও রীতি ছিল। কেননা এইসব ভক্ষণের মাধ্যমে অন্যের মগজ কিংবা কলজের অধিকারী হওয়া সম্ভব, এই বিশ্বাস এই সব আদিম মানুষের ছিল। আবার কোনো কোনো জাতি শত্রুদের হত্যা করেও ভক্ষণ করত। এক্ষেত্রে যে বিশ্বাস কার্যকরী হত তা হ'ল শত্রুর মৃতদেহ ভক্ষণের মাধ্যমে শত্রুর মত অথবা তার তুলনায় অধিকতর বলশালী হওয়া সম্ভব। তবে মূলত পুরুষ নরের মাংসই আহার্য হিসেবে ব্যবহৃত হত। আবার অনেক ক্ষেত্রে নারীরা পুরুষের বিশেষ অংশ ভক্ষণ করত বলে নৃতাত্ত্বিকদের ধারণা এবং তা সৃজন-শক্তি সম্পৃক্ত প্রথাবিশেষ বলেই তাঁদের মত।[১৬]

আহারের বৈচিত্র্য আনতেও যে নরমাংস আহারের রেওয়াজ থাকা সম্ভব, তাও নৃবিজ্ঞানীরা অস্বীকার করেন না। বস্তুত "আমাদের বিশেষ উৎসবে যেমন বিশেষভাবে খানা পরিবেশনের রীতি আছে, এদের মধ্যেও তেমনি নরমাংস ভোজ-উৎসবে বিশেষ জাঁক জমকের নিয়ম ছিল। শত্রুর মাংস আহার করার মধ্যে তাদের বিশ্বাস ছিল যে, এতে তারা শত্রুর থেকে অনেক শক্তিশালী হবে এবং তাদের সব যাদুর (magical power) অধিকারী হবে। যেহেতু মানুষই হল শ্রেষ্ঠ জীব, সেইহেতু বহু প্রাচীন জাতি মানুষকে দেবতার পায়ে বলি দিয়ে তার মাংস ভক্ষণ করতো। মানুষের কলিজা বা রক্ত ভক্ষণ করলে অসীম শক্তির অধিকারী হওয়া যায়, এমন বিশ্বাস তদানীন্তন ভারত থেকে শুরু করে আফ্রিকা পর্যন্ত অনেক প্রাচীন জাতির মধ্যেই বিদ্যমান ছিল।

'The eating of human flesh is a part of the imitation of witches, who after eating are thrown into frenzy and are incapable of normal human emotions... . Sorcerers ate the flesh of the

corpses or mixed the flesh of the corpses with their food, the consequences were that they became violent and, when angered, committed murder' (SDFML)[১৭]

কাজেই Andrew Lang যখন বলেন রাক্ষসদের প্রথাটি প্রাচীন সামাজিক প্রথার প্রতিবিম্বন (relics of ancient custom), তখন তাকে না মেনে উপায় থাকে না।

রাক্ষসদের উদ্ভব এবং নরমাংস আহারের পর রাক্ষসেব ইচ্ছামত রূপ পরিগ্রহের বিষয়টির প্রসঙ্গে আসা যেতে পারে। আমরা জানি আদিম মানুষের ধর্ম মূলত সর্বপ্রাণবাদ সূত্রেই বিকশিত। এই সর্বপ্রাণবাদ-এর ক্রমাগ্রসর ধারা হল ঐন্দ্রজালিকতা বা যাদু। তাই অনুমিত হয়, animistic এবং magical বা সর্বপ্রাণবাদী ও অলৌকিকে বিশ্বাসী আদিম সভ্যতা থেকেই রাক্ষসদের ইচ্ছামত রূপ পরিগ্রহের ব্যাপারটি উদ্ভূত হয়েছে।[১৮]

আদিম মানুষদের বিশ্বাস ছিল আত্মীয় বা অন্য কেউ মৃত্যুমুখে পতিত হবার পর যদি তার আত্মা ফিরে আসে, তবে তা জীবিত ব্যক্তিদের সমূহ ক্ষতি সাধন করবে। মৃত ব্যক্তির আত্মার কারণে মৃত্যুও অসম্ভব নয়। তাই আদিম মানুষের মধ্যে Ancestor worship বা মৃত আত্মীয় আরাধনার প্রথা চলে এসেছে প্রাচীনকাল থেকে। উদ্দেশ্য একটিই, যাতে মৃত ব্যক্তির আত্মা ফিরে না আসে। কোন কোন রূপকথায় দেখা যায়, রাজপুত্রকে রাক্ষস তাড়া করে আসছে— রাজপুত্র একটির পর একটি 'যাদুমন্ত্র' দিয়ে পাহাড়, পর্বত, নদ-নদী, অরণ্য, সমুদ্র ইত্যাদি সৃষ্টি করে বাক্ষসদের হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছে। রূপকথার এই রাজপুত্রগণকে যদি ধরে নেওয়া যায় যে তারা মানুষের দলপতি, তাহলে আর কোন বিরোধ থাকে না। 'ওঝা' বা ঐন্দ্রজালিক শক্তির যিনি অধিকারী (Sorcerer), তিনিই সাধারণত আদিম সমাজের দলপতি নির্বাচিত হতেন। কাজেই কোনো কোনো নৃবিজ্ঞানী যে রাক্ষসের উদ্ভবের মূলে আদিম মানুষের মৃত্যুভয়কে নির্দেশ করেছেন বা মৃত্যুও রাক্ষস ব্যতীত অন্য কিছু নয় —এমন ধারণা পোষণ করেছেন তাও বিশেষভাবে যুক্তিগ্রাহ্য।[১৯]

সুতরাং দেখা গেল রাক্ষস চরিত্র সৃষ্টির অন্তরালে আদিম মানুষের যে ধারণা ও প্রবণতাগুলি কাজ করেছিল, নিঃসন্দেহে তার সিংহভাগ জুড়ে আছে মানুষের আত্মার অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাস ও ভয়। অর্থাৎ নৃতত্ত্বের কথায় তা অনিবার্যতই জীবাত্মাবাদ এবং এই কারণে আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, রাক্ষস চরিত্র উদ্ভবের ইতিহাসে জীবাত্মাবাদই অন্যতম সোপান।

কথাবলা প্রাণী (Talking bird, fish, owl etc.)

লোকসাহিত্যে— বিশেষত লোককথায় আমরা কথা বলা প্রাণীর সাক্ষাৎ পাই প্রায়শই। শুক পাখি, মাছ, পেঁচা ইত্যাদি মানবেতর প্রাণী এবং রূপকথার বিশিষ্ট কাল্পনিক পাখি বেঙ্গমা বেঙ্গমী মানুষের সঙ্গে মানুষের ভাষাতেই কথা বলে, মানুষের মনের কথা না জানানো সত্ত্বেও বুঝে নেয়। বহুক্ষেত্রেই তারা অসহায় রাজপুত্রকে আলোর পথ দেখায়,

সঙ্কটময় মুহূর্তে ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে মানুষ কথাবলা প্রাণীর মুখ থেকে ভবিষ্যৎ জানতে পারে।

প্রশ্ন হল লোককথার প্রাণীরা কথা বলে কেন? এর উত্তর সন্ধান করতে গিয়ে বলা যায়, প্রথমত, আদিম লোক গোষ্ঠীর প্রকৃতি নির্ভরতা এর অন্যতম কারণ। যখন মানুষ পুরোপুরি প্রকৃতি নির্ভর ছিল, যখন তারা জানতো না কোন্ কারণে সূর্যোদয়-সূর্যাস্ত হয়, গাছ-পালা, প্রাণী জন্ম নেয়, কোন্ কারণে বৃষ্টি হয়, বজ্রপাত হয় —অর্থাৎ এককথায় গোষ্ঠী মানুষের ভৌগোলিক বিস্তৃতি যখন খুবই কম ছিল, যখন তারা প্রকৃতির কোলে পশু-পাখিদের সঙ্গে প্রতিপালিত, এমন প্রকৃতির সন্তানদের কাছে মূলত নিরীহ পশু-পাখিরা যে নিকটজন হয়ে উঠবে তা অনুমান করা অযৌক্তিক নয়। আর এই কারণে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ঐ পশু পাখিরা তাদের কাছে কেবল পশু পাখি থাকত না, হয়ে উঠত মানবীয় চরিত্র, কখনো তারা বন্ধু, কখনো ত্রাতা, কখনো বা ভবিষ্যৎ বক্তা।

দ্বিতীয়ত, আদিম লোকগোষ্ঠী দেখেছে মানুষের যেমন প্রাণ আছে, প্রাণীদেরও তা আছে। মানুষের মতই তাদের জন্ম-মৃত্যু ও বংশবৃদ্ধি, মানুষের মতই তাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা। তাই পশুদের প্রয়োজনে মানবীয়ত্ব দানে তারা কুণ্ঠিত হয়নি। তা না হলে টোটেম হিসেবে পশুপাখি মানুষের কাছে গৃহীত ও পূজিত হতে পারত না। তাই যদি আমরা বলি, তাদের ধারণা ছিল, যে আত্মা মানব শরীরে বিদ্যমান, পশু-পাখির মধ্যেও সেই আত্মা বিদ্যমান (যা কিনা বিশেষ এক অদৃশ্য শক্তি, বা জীবের জীবনীশক্তি) তবে নিঃসন্দেহে তা অনৃতভাষণ হবে না। এমনকি পৃথিবী সৃষ্টি সংক্রান্ত বিভিন্ন দেশের মিথে বিষয়টি স্পষ্ট। সেখানেও মানুষের সঙ্গে কচ্ছপ এবং বিভিন্ন জীবজন্তু সমান ভূমিকা নিয়েছে। কাজেই উপর্যুক্ত কারণে পশু-পাখিও যে মানুষের ভাষায় কথা বলবে তা অস্বাভাবিক নয়।

'ঘুমন্ত পুরী' গল্পে নিঃসন্তান রাজা ও রাণীকে নদী থেকে এক সোনালী মাছ মাথা তুলে বলেছিল যে তারা যেন দুঃখ না করে, তাদের এক পরমা সুন্দরী কন্যা জন্মাবে। 'নরঘাতক সন্ন্যাসী' নামক রূপকথায় কনিষ্ঠ রাজকুমারকে জ্যেষ্ঠ রাজকুমারের মত আকৃতিগত সাদৃশ্যের কারণে ভ্রমবশত কুকুর শাবক ও পক্ষীশাবক মানুষের ভাষায় বলেছিল, 'আপনি আমার বড় ভাইকে সঙ্গে লইয়াছেন এখন আমাকেও লউন, আমরা একত্রে আপনার সেবা করিব।' অসময়ী নারায়ণীর ব্রতের গল্পে 'বাঘের দয়া' নামক ব্রতকথায় এক বাঘ ব্রাহ্মণকে পথিমধ্যে ভক্ষণ করতে চাইলে ব্রাহ্মণ বলে যে তার ছেলে হয়েছে, সে পুরোহিত বাড়ি যাচ্ছে। কাজেই তাকে সে যেন না খায়। বাঘ তখন বলে, সে বারো বৎসর যাবৎ লোহার খাঁচায় আবদ্ধ, বাঘিনীকে এনে দিলে সে তাকে ছেড়ে দেবে। 'হীরামন' নামক রূপকথায় হীরামন নামক পখিটি যে মানুষের ভাষায় কথা বলত তাই নয়, তার পাণ্ডিত্য ও বুদ্ধিও কম ছিল না। তার বুদ্ধিতেই রাজা সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে অসাধারণ সুন্দরীকে লাভ করেছিল।

বস্তুত এমন আরো বহু উদাহরণ লোককথায় বিদ্যমান। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার সংকলিত 'ঠাকুমার ঝুলি'র 'শীত বসন্ত' রূপকথায় শুক ও সারী, বসন্ত রাজপুত্রকে রূপবতী রাজকুমারীর ঈপ্সিত গজমোতির সন্ধান দিয়েছে এবং রাজপুত্র শুক-সারীকে মেসো ও মাসী ব'লে সম্বোধন করেছে। 'কিরণমালা'-য় অরুণ বরুণ ও অন্যান্য রাজপুত্রকে মায়াপাহাড়ের মায়া পাথর থেকে মানুষ-এ রূপান্তরিত করল হীরার গাছের সোনার পাখির নির্দেশমত। পাখি মানুষের ভাষায় তাকে কী কী করতে হবে সেই নির্দেশ দিয়েছে। 'নীলকমল আর লালকমল' রূপকথাটিতে অশ্বত্থ গাছে কথোপকথনরত বেঙ্গমা-বেঙ্গমীর কথা শুনে ফেলে ঐ গাছের তলায় বিশ্রামরত লালকমল ও নীলকমল বেঙ্গমা-বেঙ্গমীর বাচ্চাদের রক্ত দিয়ে চোখ ফুটিয়েছে এবং তার ফলে বেঙ্গমীর বাচ্চারা রাজপুত্রদের মানুষের ভাষাতেই জিজ্ঞাসা করেছে তারা রাজপুত্রদের জন্য কী করতে পারে ইত্যাদি। তেমন 'দেড় আঙ্গুলে' গল্পে ব্যাঙ রাজপুত্রদের আঙ্গুলের সঙ্গে মানুষের মতই কথা বলেছে এবং দেড় আঙ্গুলের সহায়তায় কুনোরাণীকে লাউয়ের খোলস মুক্ত করেছে।

ময়মনসিংহ-গীতিকার 'কঙ্ক ও লীলা' গীতিকাটিতে কঙ্কের অন্বেষণে লীলা তার হীরামন তোতাকে খাঁচা থেকে উড়িয়ে দিয়ে বলেছে:

"ফিরায়ে কঙ্কেরে মোর আনহ ঝটিতি।।
উড়িয়া যাও হীরামন তোতা উঠরে আকাশে।
শীঘ্রগতি চল মোর বন্ধু সেই দেশে।।
দেখিলে শুনাইও আমার দুঃখের গান।
বলিয়া-কহিয়া আনিয়া তারে বাঁচাও লীলার প্রাণ।।"

'কাজলরেখা' গীতিকায় সদাগরের ধর্মমতী শুক তো গীতিকাটির একটি অপরিহার্য চরিত্র হয়ে উঠেছে! জুয়াতে সর্বস্বান্ত সদাগর এই শুকপাখির নির্দেশিত পথে পুনরায় ধন-ঐশ্বর্য ফিরে পেয়েছে; এই সর্বজ্ঞ পাখি তার ভবিষ্যতের দুঃখ-কষ্টের কথা যেমন বলেছে, তা থেকে উত্তরণের পথটিও নির্দেশ করেছে। পাখিটির নির্দেশেই কাজলরেখাকে সদাগর পুরীর মধ্যে না রেখে বনে ত্যাগ ক'রে আসতে বাধ্য হয়েছে। অতঃপর মৃত রাজপুত্রের সঙ্গে কাজলরেখার বিবাহ, কঙ্কনদাসী কর্তৃক প্রতারিত হওয়া— এমন বহু দুঃখ-কষ্টের পর এই ধর্মমতী শুকপাখি শেষপর্যন্ত সর্বসমক্ষে সত্যকে প্রকাশ ক'রে কাজলরেখার দুঃসহ জীবনের পরিবর্তন এনেছে। সুতরাং এইসব দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যায় প্রকৃতিনির্ভর মানুষের সঙ্গে বনের পশু-পাখির সহাবস্থানজনিত কারণেই নয়, অন্য আর একটি বিষয়ও পশুদের মানবত্ব দানে বিশিষ্ট কারণ হিসেবে কাজ করেছে এবং অবিসংবাদিতভাবেই তা পূর্বালোচিত জীবাত্মাবাদ বা এ্যানিমিজ্‌ম। মানুষ তার কল্পনা ও সহজ বুদ্ধি দিয়ে নিঃসন্দেহে অনুভব করেছিল, যে অশরীরী আত্মা মানুষের যাবতীয় জৈব শক্তির উৎস,— তা পশুরও জৈব শক্তির কারণ। অর্থাৎ সবার ক্ষেত্রেই প্রাণশক্তি আত্মার উপস্থিতির কারণেই সংঘটিত। ফলে আদিম মানুষের সহজাত কল্পনায় তাই পশুও মানুষ হয়ে ওঠে,

মানুষের মত, কখনো বা মানুষের চেয়েও বেশি ক্ষমতার অধিকারী হয়ে অসাধারণ মানুযের মত আচরণ ও কার্য সম্পাদন করে।

বৃক্ষপূজা ও কথাবলা গাছ : (Tree worship & talking tree)

লোককথায় যেমন কথা বলা প্রাণীর সাক্ষাৎ মেলে ঠিক তেমন কথা বলা গাছ অথবা মানুষের কথা বুঝে যথাযথ প্রতিক্রিয়া করে, এমন গাছেরও সন্ধান মেলে সারা পৃথিবীর লোককথায়। একথা নিঃসন্দেহে স্বীকার্য যে আদিমলোকগোষ্ঠী পুরোপুরি প্রকৃতিনির্ভর ছিল, ফলে প্রকৃতি তোষণা তাদের কাছে খুব স্বাভাবিক ছিল— যার অনিবার্য ফলশ্রুতি 'বৃক্ষপূজা'। আদিম জনগোষ্ঠী বৃক্ষের বৃদ্ধি ও বৈচিত্র্য পর্যবেক্ষণ করে বুঝেছিল যে পশুর মত বৃক্ষ জীববৃত্তির দিক থেকে সাদৃশ্যময় না হলেও, বৃক্ষ একেবারে জড়পদার্থ নয়, অন্তত মাটি পাথরের মত নয়। আমাদের এ অনুমান যদি অতিরঞ্জিত বলে মনে হয় তবে নিঃসন্দেহে একথা বলা যায় যে, তারা অন্তত এটুকু বুঝেছিল যে জড়পদার্থ ও বৃক্ষ বা উদ্ভিদ একেবারে চরিত্রগত দিক থেকে একপ্রকার নয়। দ্বিতীয়ত, আপন অস্তিত্ব রক্ষার্থে আদিম জনগোষ্ঠী প্রকৃতি তোষণা করেছে এবং তার মধ্যে বৃক্ষতোষণা একটি বৃহৎ অংশ জুড়ে বিরাজ করেছিল (এখনো করে) তা সর্বজন বিদিত। বিশেষত কৃষিজীবনের যুগে বৃক্ষের উপর সার্বিক নির্ভরশীলতার জন্য মানুষ বুঝেছিল, স্বীয় অস্তিত্বের সঙ্গে বৃক্ষের সম্পর্কটি অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। তৃতীয়ত, জড়বস্তুতে প্রাণের আরোপ বা জড়ের মধ্যে আত্মার কল্পনা আদিম মানুষের সাধারণ প্রবণতা ছিল যা 'সর্বপ্রাণবাদ' (animatism) বলে নৃবিজ্ঞানীর ভাষায় চিহ্নিত হয়েছে এবং এই বিশ্বাসের বশবর্তী হওয়ায় তারা জড়বস্তুকেও কখনে কখনো প্রাণবান ব'লে মনে করেছে। আব সেক্ষেত্রে জড়বস্তু অপেক্ষা স্বতন্ত্র যে বৃক্ষ, তাকে প্রাণসম্পন্ন বলে মনে করা যে আরো স্বাভাবিক, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কাজেই প্রাগুক্ত কারণে আদিম লোকগোষ্ঠীর কাছে বৃক্ষ, চেতনাসম্পন্ন হয়ে উঠল; মানুষের পূজ্য হল; প্রয়োজনে মানুষের ভাষায় বিভিন্ন লোককথায় কথা বলে উঠল এবং মানুষের সঙ্গে ভাববিনিময় করতে সক্ষম হল। ফলে মানুষের কল্পনার জগতে বৃক্ষ হয়ে উঠল বাকশক্তিসম্পন্ন বৃক্ষ। আমরা লোককথার জগৎ থেকে এমন কথাবলা গাছের বহু দৃষ্টান্ত পেতে পারি, যার দু'একটি নিম্নরূপ--

'সাত ভাই চম্পা' গল্পে রাজার পূজার জন্য রাজার মালি চম্পা ও পারুল ফুল তুলতে গেলে তারা উপরে উঠে যায় এবং মানুযের ভাষায় রাজা, বড়রাণী, মেজরাণী এবং একে একে ছজন রাণীকেই আসার জন্য নির্দেশ দেয়। 'ষাটাই' ব্রতকথায় ব্রাহ্মণকে পথে এক আমগাছ জিজ্ঞাসা করে যে তাব এত পাকা আম কেউ খায় না কেন এবং পরে উত্তর পেয়ে সে ব্রাহ্মণকে আম খেতে অনুরোধ করে। 'ছোটবউ' নামক রূপকথার গল্পটিতে বড়বউ তুলা, তুলসী ও কলাগাছের সেবা করায় তারা তাকে আশীর্বাদ করল এবং অসাধারণ দৈহিক রূপলাভ করে সে যখন বাড়ি ফিরছে

তখন তুলসীগাছ তাকে বলল যে স্বামী তাকে ভালোবাসবে, কলাগাছ কলাপাতা দিয়ে বলল যখনই সে কলাপাতা নাড়াবে তৎক্ষণাৎ কলা এবং অন্য ফল পাবে, তুলা গাছ নিজের একটি ডাল দিয়ে বলল যে ডালটি নাড়ালেই সে নানা প্রকার মূল্যবান পোশাক পাবে।

লক্ষণীয় এখানে গাছেরা কথা বলছে এবং বিভিন্নভাবে কখনো বা উপকারও করছে। যেমন তুলা বা কলাগাছ প্রত্যক্ষভাবে বড়বউয়ের যে উপকার সাধন করল, তাতে স্পষ্টই বৃক্ষের উপর মানুষের নির্ভরশীলতার বিষয়টি দ্যোতিত হয়।

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের 'ঠাকুরমার ঝুলি'র 'শীত বসন্ত' নামক রূপকথায় গজমোতি আনতে যাওয়ার প্রাক্‌কালে বসন্ত ত্রিশূল হাতে শিমুল গাছের কাছে গিয়ে বলল যে বৃক্ষ যদি সত্যকারের বৃক্ষ হয় তো তার কাপড়-চোপড় আর রাজমুকুট সে যেন বসন্তকে দেয়। বৃক্ষ তাই দিল। তেমন 'সোনার কাঠি রূপার কাঠি' রূপকথাটিতে রাক্ষসীব হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য পলায়নরত নিরুপায় রাজপুত্র আমগাছকে বলল, 'হে আমগাছ, যদি তুমি সত্যকারের বৃক্ষ হও, রাক্ষসীর হাত থেকে আমাকে রক্ষা কর।' অমনি আমগাছ দু'ফাঁক হয়ে গেল এবং রাজপুত্র তার মধ্যে লুকিয়ে পড়ে প্রাণ বাঁচাল। এমনি আরো উদাহরণ লোককথায় দুর্লভ নয়।

আত্মা : পূর্বপুরুষ পূজা ও জন্মান্তর

আমরা পূর্বে আত্মাবাদ সংক্রান্ত আলোচনায় দেখেছি যে সপ্রাণবাদ (animatism)এর ধারণা অনুযায়ী আত্মা পৃথিবীর সমস্ত বস্তুর মধ্যে বিরাজমান, সর্বপ্রাণবাদের (animism) ধারণা অনুযায়ী আত্মা সমস্ত প্রাণীর মধ্যে বর্তমান এবং অতীন্দ্রিয় শক্তি হিসেবে আত্মা স্বতন্ত্রভাবেও বিরাজমান থাকে।[২০]

টাইলরের মতে আত্মা মরণশীল নয় বলেই আদিম মানুষের বিশ্বাস ছিল। তাদের ধারণা ছিল জীব বা মানুষের মৃত্যুর পর সেই আত্মা পৃথিবী ছেড়ে যেতে চায় না। তারা মানুষের মঙ্গল ও অমঙ্গল দুই-ই সাধন করতে পারে, প্রয়োজনে আত্মা রূপধারণ কবতে পারে বা নিজেকে রূপান্তরিত করতে পারে অন্য রূপে, এমনকি জীব-জন্তুর উপর সে ভর করতেও সক্ষম।[২১]

টাইলর বিস্তারিতভাবে আত্মা ও অপদেবতা সংক্রান্ত যে আলোচনা করেছেন, আমরা তার প্রয়োজনীয় মূল কথাগুলি বললাম। বস্তুত পৃথিবীর যে কোনো লোকধর্ম তো বটেই, উচ্চতর ধর্মসাধনপন্থীরাও অপদেবতা ও তার কর্মক্ষমতার বিষয়টিকে বিশ্বাস করে। তবে অপদেবতা বা ভূত-প্রেতের (Ghosts) প্রতি ভয়ই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে লোকসাধারণ অনুভব করে কারণ এদের অনিষ্ট করার অভিপ্রায়ই যেন বেশি। রূপকথার রাক্ষস চরিত্র সৃষ্টির কারণ হিসেবে এই আত্মার— (বিশেষত যা অপদেবতা হিসেবেই কল্পিত) যে ভূমিকা আছে তা আমরা দেখেছি। স্যার জেমস্ ফ্রেজারও তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থটিতে দেখিয়েছেন বিভিন্ন উপজাতি সমাজ ঐহিক মঙ্গলের জন্য প্রকৃতি

তোষণার সঙ্গে সঙ্গে পূর্বপুরুষদের আত্মাকে সন্তুষ্ট করার জন্য বিভিন্ন অনুষ্ঠান করে।

কাজেই পূর্বপুরুষ পূজা মানুষের কোন্ প্রবণতা থেকে উদ্ভূত তা বলার অপেক্ষা রাখে না। পূর্বপুরুষ পূজার মধ্যে একদিকে যেমন পূর্বপুরুষের শক্তি, ক্ষমতা ও প্রজ্ঞা যাচ্ঞা করা হয়, তেমনি পূর্বপুরুষের আত্মার শান্তি কামনার সঙ্গে তাঁকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টাও করা হয় বা নিজ প্রয়োজনের অনুকূলে সেই আত্মা ও তার শক্তিকে বহমান করার চেষ্টা করা হয়। হিন্দু সমাজে পিণ্ডদান, পিতৃতর্পণ বা বিবাহ অনুষ্ঠানে নান্দীমুখের মত অনুষ্ঠান করার মধ্যে, ঐ একই প্রবণতা কাজ করে। যাইহোক উপর্যুক্ত বিশ্বাস বাংলা লোকসাহিত্যের ভাণ্ডারেও প্রতিফলিত হয়েছে। যেমন 'নান্দীমুখ'-এর অনুষ্ঠানে গীত হয় এমন একটি আনুষ্ঠানিক গান—

'তোরা উলু দে, লো সখিগণ, নান্দীমুখে বইসাছে রাজন। (ধুয়া)।
প্রাতঃস্নান কইর‍্যা রাজা করিলেন আগমন
হেনকালে আইলেন বশিষ্ঠ তপোধন।
যেই ঘরে শুভকার্য বইসা করিবেন রাজন
বিচিত্র আলিপন দিলা যত সখিগণ।
শুভকার্যে মহারাজ বসিলেন সেইক্ষণ
ঘৃত দিয়া পঞ্চবাতি জ্বাইলা দিল সখিগণ।
আচমন কইরা আগে পড়িল স্বস্তিবাচন।
তীর্থ আবাহন করি করিলা অর্ঘ্য স্থাপন।
সঙ্কল্প পড়িয়া পঞ্চদেবতা দিকপালগণ
একে একে ভক্তিভরে পূজিলা রাজা তখন।
ষোড়শ মাতৃকা পূজা করি আগে সমাপন
বসুর ধারা দিতে উঠে হইয়া হরষিত মন।
মাতৃপক্ষ পিতৃপক্ষ কইরা রাজা নিরূপণ
একে একে চৌদ্দ পুর্ষের নাম করে উচ্চারণ।'[২২]

আত্মার পুনর্জন্মলাভ বা জন্মান্তরবাদ সংক্রান্ত বিশ্বাসটি বাংলার লোকসমাজে যথেষ্টই দৃঢ়মূল হয়ে গেছে। নিম্নলিখিত ধাঁধাটিতে তার প্রতিফলন লক্ষণীয়—

প্রশ্ন : 'কয় হাতের কেশ তোমার কয় হাতের নাড়ী
কোন্ জননী ছিলেন শিওরী।
কোন্ নদী ভজে হলি পার
কয়রতি ক মাসা জননী তোমার।'

উত্তর : 'চোদ্দ হাতের কেশ আমার বত্রিশ হাতের নাড়ী
উদরে জননী ছিলেম উত্তর শিওরী।
ভবসিন্ধু নদী ভজে হইলাম পার
ছয় রতি নব মাসা জননী আমার।'[২৩]

(বিবাহাচার মূলক ধাঁধা)

আত্মা : প্রেত ও দেবতা

শুধু পূর্বপুরুষ নয়, দেহবিবিক্ত অশরীরী মুক্ত প্রাণীর আত্মা ভূত প্রেত হিসেবে লোক-সমাজে পরিচিত।

"হিন্দু পারলৌকিক বিশ্বাস অনুযায়ী পরলোকের দুইটি বিভাগ— প্রেতলোক এবং পিতৃলোক। মৃত্যুর পরই আত্মা প্রেতলোকে গিয়া প্রবেশ করে এবং সেখানে বায়ু-ভূত নিরাশ্রয় হইয়া অশান্তভাবে ঘুরিয়া বেড়ায়। সেই সময় যদি যথাবিধি তাহার প্রেতকৃত্য করা না হয়, তাহা হইলেই নানাভাবে সেই আত্মা মানব সমাজের অনিষ্ট করিয়া থাকে, অনেক সময় অকারণে মানুষের অহিতসাধনও করিয়া থাকে।"[২৪] ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের এই মন্তব্যে লোকসমাজের ভূত সংক্রান্ত সাধারণ বিশ্বাসই প্রতিফলিত। তিনি বিভিন্ন অঞ্চলে ক্ষেত্র সমীক্ষা করে আর যে তথ্য পেয়েছেন তা হল, প্রথমত, লোকসাধারণের বিশ্বাস যে অতৃপ্ত মানবাত্মা তার ঐহিক ভোগ চরিতার্থ করার জন্য মানুষের অনিষ্ট সাধন করে; দ্বিতীয়ত, ঐ উদ্দেশ্যে আত্মা মানুষের উপর 'ভর' করে বা জীবিত মানুষের রূপ পরিগ্রহ করে। তৃতীয়ত, কখনো কখনো প্রেতাত্মা অশরীরী রূপেই বর্তমান থাকে। চতুর্থত, অনেক আদিবাসী গোষ্ঠীর ধারণা যাবতীয় রোগের উৎস হল প্রেতাত্মার আক্রমণ বা ভর ইত্যাদি।[২৫]

প্রেতাত্মারও বিভিন্ন প্রকার বা জাতিভেদ : যেমন ব্রাহ্মণের প্রেতাত্মা ব্রহ্মদৈত্য। তেমন লিঙ্গভেদও বর্তমান যেমন, স্ত্রীলিঙ্গবাচক প্রেতাত্মা হল পেত্নী, শাঁকচুন্নী ইত্যাদি। আসলে হিন্দু সমাজের বর্ণভেদ ও তার রক্ষণশীল মানসিকতাই প্রেতাত্মার ভেদাভেদ সৃষ্টির কারণ তা বলাই বাহুল্য।

বাংলা লোকসাহিত্যের সংকলন বা কোষ গ্রন্থে বহু লৌকিক ভূতকথা সংকলিত হয়েছে। ড. ভট্টাচার্য কৃত 'বাংলার লোকসাহিত্য' গ্রন্থের তৃতীয অধ্যায়ে 'ভূত-প্রেতের কথা' অংশে যে ভূতের গল্পগুলি সংকলিত হয়েছে নিঃসন্দেহে বাংলা লোকসাহিত্যের উল্লেখযোগ্য সম্পদ। এরমধ্যে 'ভূতুরে বউ', 'ভূতের মন্ত্রণা', 'ছদ্মরূপিনী', 'বিদ্যাবতী' ইত্যাদি কথাগুলিতে প্রেতচরিত্রের প্রাগুক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

আবার যেহেতু ভূত-প্রেত বিষয়টি সাধারণের কাছে ভীতিপ্রদ, তাই অনেক ক্ষেত্রেই ভূতপ্রেতকে কেন্দ্র করে কৌতুক রসই মুখ্য হয়ে উঠেছে। আলোচ্য গ্রন্থের অন্তর্গত 'বামুনভূত', 'ব্রহ্মদৈত্য', 'দস্যুভূত' —ইত্যাদি এই জাতীয় কাহিনীগুলি এর সার্থক দৃষ্টান্ত।

শুধু কাহিনীতেই নয়, ভূত প্রসঙ্গ বিচিত্রভাবে বাংলা প্রবাদেও স্থানলাভ করেছে। আমরা তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত রেখে ভূত প্রসঙ্গের ইতিরেখা টানলাম—

ক। গায়ের গন্ধে ভূত পালায়

খ। ঘাড়ে ভূত চাপা

গ। মামলায় চড়লে ভূতে পায়,
জমানো কড়ি পাঁচভূতে খায়

ঘ। যে মরে সেই ভূত।

ঙ। সুখে থাকতে ভূতে কিলোয় —ইত্যাদি।

ভূতপ্রেতের উদ্ভব যেমন মানুষের ভয়-ভীতি থেকে, দেবতার উৎস বহুলাংশে কৃতজ্ঞতাবোধ ও যাদু থেকে। এর সঙ্গে টোটেম সংক্রান্ত ধারণা তো আছেই। এসম্পর্কে জনৈক পণ্ডিতের সুচিন্তিত মন্তব্য উদ্ধার করার লোভ সম্বরণ করা গেল না: ''দেবদেবীর উদ্ভব একক কোন উৎস থেকে হয়নি। প্রধানত এদের উদ্ভবের পশ্চাতে রয়েছে মানব মনের আবেগের দুইটি দিক। একটির উদ্ভব মানুষের ভয়-ভীতি থেকে, অপরটি কৃতজ্ঞতাবোধ থেকে। ভয়-ভীতি থেকে যাদেব উদ্ভব, তারা হলো মৃত মানুষের সৎকারহীন আত্মা, অতৃপ্ত ও অপঘাতে মৃত্যুপ্রাপ্ত নর-নারীর আত্মা যারা পরিণামে প্রতিহিংসা পরায়ণ ভূতপ্রেত হিসাবে জীবিত মানুষের ক্ষতি সাধনে তৎপর থাকে, রাজা, যোদ্ধা, পুরোহিত এবং গোষ্ঠীপতি, যারা দেব-সন্তান হিসেবে পরিণামে দেবতায় রূপান্তরিত হয়েছে এবং হিংস্র ও খল বন্য শ্বাপদ। মানুষের কৃতজ্ঞতাবোধ থেকে যারা দেবত্ব পেয়েছে তাদের মধ্যে টোটেম অন্যতম। এই সকল টোটেমে প্রাথমিক পর্যায়ে আপন দেহের মাংস দিয়ে গোত্রের সবাইকে বাঁচিয়ে রেখেছে। শ্রেণী সমাজ গড়ে ওঠায় এরাই দেবতায় রূপলাভ করে।''[২৬]

সে যাই হোক, দেবতার অস্তিত্ব কল্পনার অন্তরালে নিঃসন্দেহে এক সর্বশক্তিমান অদৃশ্য শক্তির কল্পনাই করা হয়। সে জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে যেমন বিরাজমান, তেমন বিভিন্ন বস্তু, পশু, অর্ধ পশু, মানব, অর্ধমানব— ইত্যাদি কাল্পনিক মূর্তিতেও অস্তিত্ববান। কাজেই এ বিষয়ে কোনো দ্বিমতের অবকাশ নেই যে, দেবতার কল্পনাও ঐ সর্বাত্মবাদ তত্ত্বের অন্তর্গত। আমরা যথাস্থানে বিস্তারিতভাবে দেবতা সংক্রান্ত আলোচনায় অগ্রসর হব এবং বাংলা লোকসাহিত্যের জগৎটিও যে কীভাবে দেবচরিত্র ও তৎসংক্রান্ত বিষয়ে প্রভাবিত তা দেখব।

আর. আর. ম্যারেট যে প্রাথমিক সর্বপ্রাণবাদ, জীবাত্মাবাদ বা সপ্রাণবাদের (animatism) কথা বলেছেন তা আসলে মানা ভাবনারই এক বিকশিত পর্যায়। আমরা আগেই বলেছি এই ধারণা অনুযায়ী অচেতন পদার্থ বা বস্তুর মধ্যে পৃথক এক আত্মার অস্তিত্ব কল্পনা করা হয়। তাই পাথর, মেঘ, বজ্র, মাটি— সবকিছুর মধ্যেই আত্মা বিদ্যমান, তা এই মতবাদ বলে। ফলে অচেতন বস্তুস্থিত আত্মাকে মানুষ প্রয়োজনের অনুকূলে ব্যবহাব করার চেষ্টা করে এবং এ থেকে গড়ে ওঠে বস্তুপূজা। ঐ সব বস্তু সামগ্রী নৃতত্ত্বের ভাষায় 'ফেটিশ' (fetish) অভিধা লাভ করে। বাংলাদেশে হিন্দুদের পূজ্য শালগ্রাম শিলা, বটবৃক্ষের নিচে শিব হিসেবে পূজিত গোলাকৃতি পাথর (অনুরূপ কূর্মাকৃতি ধর্মঠাকুর) বিভিন্ন ব্রতকথায় আকৃতিহীন মাটির ঢিপি, ঘট— ইত্যাদি ফেটিশ বলে গণ্য হতে পারে। আবার ঐন্দ্রজালিক শক্তির অধিকারী বস্তু যা কিনা শুভদায়ী ও অশুভরোধী বস্তু হিসেবে ব্যবহৃত হয়[২৭] কারণ এই সব বস্তুর অন্তঃস্থিত আত্মারই সেই ক্ষমতা থাকে। জলপড়া, আংটি বা বিশেষ বিশেষ পাথর মাদুলি-তাবিজ ইত্যাদিও ফেটিশ বলে বর্ণিত হতে পারে। সে যাই হোক, জড়বস্তুর

মধ্যে আত্মার অস্তিত্ব কল্পনা করার জন্য বহু ক্ষেত্রে প্রাণহীন বস্তুও মানবত্ব পায় আর প্রায়শই তাকে কেন্দ্র ক'রে গড়ে ওঠে বিভিন্ন কাল্ট। যেমন নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে নদী-উপাসনা বা রিভার কাল্ট, ধান্যকে কেন্দ্র করে প্যাডি কাল্ট প্রভৃতি। প্রাণহীন বস্তুর এই মানবত্ব প্রাপ্তির ব্যাপারটিও লোকসাহিত্যের ভাণ্ডারে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। আমরা পূর্বেই দেখেছি রূপকথা বা ব্রতকথায় রাজপুত্র বৃক্ষকে বলছে বৃক্ষ যদি সত্যকার বৃক্ষ হয় তবে সে যেন দু'ফাঁক হয়ে যায় ইত্যাদি। 'ষাটাই' ব্রতকথাটিতে মা ষষ্ঠীর সাক্ষাৎপ্রার্থী ব্রাহ্মণের কাছে আমগাছ যেমন জানতে চেয়েছিল তার ফল লোকে খায় না কেন, তেমন নদীও জানতে চেয়েছিল তার জল লোকে খায় না কেন এবং উত্তর পাওয়ার পর নদী বলেছিল যে তিনি (ব্রাহ্মণ) যেন তার জল পান ক'রে নদীকে মুক্তি দেন। বিভিন্ন পুরাণ, রূপকথা, ব্রতকথা ইত্যাদিতে প্রায়শই নদীকে কথা বলতে দেখা যায় অথবা নদী, রাজপুত্র বা মানুষের প্রয়োজনে দু'ফাঁক হয়ে রাস্তা করে দেয়। নদীমাতৃক অঞ্চলে বা নদী সম্পৃক্ত জীবন যাত্রায় নদীর উপর মানুষের নির্ভরশীলতার কারণে মানুষ নদীকে স্বচ্ছন্দে শুধু প্রাণময় করেই তোলেনি, মানুষের সঙ্গে তাকে মানুষের ভাষায় কথা বলার অলীক কল্পনাকে সহজেই স্বীকার করে নিয়েছে। লক্ষণীয় এসব ক্ষেত্রে জড় বস্তুর মধ্যে আত্মার কল্পনাই নয়, আরো অগ্রসর হয়ে কখনো মানবীয়ত্বও দান করা হয়েছে। এমন আরো একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে আমরা এই প্রসঙ্গ শেষ করব। সেটি হল কৃষিক্ষেত্রকে মাতা কল্পনা করা। পৃথিবীর বিভিন্ন জাতিই কৃষিক্ষেত্রকে মাতা কল্পনা করে। বাংলাদেশে পালনীয় 'অম্বুবাচী' ঐ একই কারণে সম্পন্ন হয়। কল্পনা করা হয় যে নববর্ষায় পৃথিবী ঋতুমতী হয়, তাই তিন দিন থেকে সাতদিন হলকর্ষণ নিষিদ্ধ অর্থাৎ বিশ্বাস এই যে এই সময়ে ধরিত্রী মাতার অঙ্গে কোনোরূপ আঘাত লাগাতে নেই।[২৮]

আত্মা সংক্রান্ত ধারণার বিচিত্রতা ও পর্যায়ক্রম

মানুষ প্রাণীর এক / একাধিক আত্মার কল্পনা ঃ
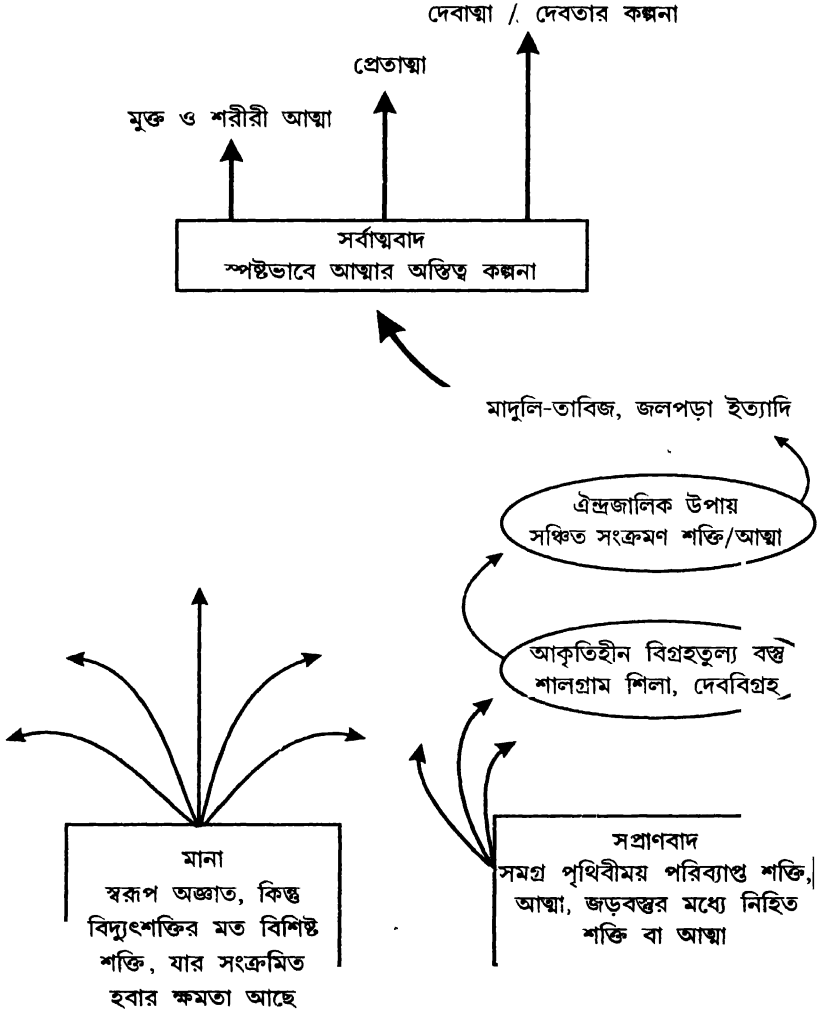
দ্বিতীয় অধ্যায়

যাদু ও নিষেধ বিধান

ইংরেজি Magic শব্দটি ফার্সি 'Magi' শব্দ থেকে এসেছে। প্রাচীন পারস্যের জরাথুস্ত্র ধর্মের পুরোহিতদের 'মাজি' বলা হত। তারা বিশেষ গোপন ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে এবং নানারকম ভেলকি দেখিয়ে মানুষকে বোঝাবার চেষ্টা করত যে প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধে তারা অনেক কিছুই করতে পারে। তাদের এই অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ড ক্রমে ক্রমে 'magic' ব'লে পরিচিত হয়।[১]

এই ম্যাজিক শব্দটি সাধারণভাবে আমাদের কাছে বিশেষ এক প্রকার আশ্চর্যজনক হাতসাফাই-এর খেলাকে বোঝায়। বাংলায় Magic-এর প্রতিশব্দ হল 'যাদু' বা 'যাদুবিদ্যা'। যাদুবিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তি হলেন যাদুকর (Magician)। যাদুকর যাদু প্রদর্শন করতে গিয়ে শুধু হাত সাফাই-এর কৌশল বা বিজ্ঞান নির্ভর কৌশলই ব্যবহার করেন না, কখনো কখনো সম্মোহনবিদ্যা (Hipnotism)-কেও কাজে লাগান। বহু শতাব্দী ধরে সারা পৃথিবীতে 'ভারতীয় দড়ির খেলা' কিংবদন্তী হয়ে আছে। সম্ভবত এও এক সম্মোহনবিদ্যারই ফলশ্রুতি। লক্ষ্য করার বিষয় যে যাদুকর খেলা দেখানোর সময় দুর্বোধ্য মন্ত্র আওড়ান বা ঝাড়ফুঁক করেন। এই ঝাড়ফুঁক বা মন্ত্র উচ্চারণের বিষয়টি এখন হয়ত নিছক লোকদেখানো ব্যাপার, অথবা দর্শককে অন্যমনস্ক ক'রে সময় নেওয়া, কিন্তু 'মাজি'দের ক্রিয়াকাণ্ডে তা প্রধান এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল,— যেমন আমাদের ওঝা বা গুণিনদের ক্রিয়াকলাপ, বা যেমন ছিল (?) বিভিন্ন ডাকিনীবিদ্যা। সুতরাং বক্তব্য হল, আজকের 'যাদু' বা ম্যাজিক নিছক দর্শক মনোরঞ্জনের বিষয় হলেও একসময় তা কোনো ফাঁকির খেলা বা বিনোদনের বিষয় ছিল না। এবং মানুষের বিশ্বাস-ই ছিল যাদুর ভিত্তি ও মানুষ তা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করত। এমনকি অগ্রসর সমাজেও এখনো পর্যন্ত বিভিন্ন সংস্কার মানুষের মনে স্থায়ী প্রভাব রেখে চলেছে। এগুলি যাদুবিদ্যারই অনিবার্য ফলশ্রুতি।

নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষের এই বিশ্বাস ও বিশেষ আচরণের বিষয়টি-ই যাদুবিদ্যা বা ম্যাজিক অভিধায় চিহ্নিত। অর্থাৎ নৃতাত্ত্বিক পরিভাষায় যা ম্যাজিক তা আজকের ম্যাজিক-খেলা নয়। এটা একটা তত্ত্ব। বিখ্যাত বৃটিশ দার্শনিক ও সমাজ বিজ্ঞানী Sir James George Frazer (1854-1941) এই 'যাদুবিদ্যা' সংক্রান্ত তত্ত্বের প্রবক্তা। ফ্রেজারের মতে যাদুবিদ্যা হল 'প্রাকৃতিক বিধান' (Natural law)এর নামান্তর মাত্র। তাঁর মতে, মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছিল, পৃথিবীর নানা বিচিত্র নৈসর্গিক ঘটনাবলীর অন্তরালে রয়েছে বিবিধ অতিপ্রাকৃত শক্তির প্রভাব। তা অতিপ্রাকৃত এই কারণেই, যে মানুষ তখনো পর্যন্ত ওই সব নৈসর্গিক

ঘটনাবলীর বৈজ্ঞানিক কার্য-কারণ সম্পর্ক আবিষ্কার করে উঠতে পারেনি। আদিম মানুষ বিশ্বাস করত, ঐ সব অজ্ঞাত অতিপ্রাকৃত শক্তির কারণেই মানুষের জীবনে ও পৃথিবীতে নানা বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। এই বিপর্যয় থেকে মুক্তি লাভের আকাঙক্ষায় ও অজ্ঞাত অতিপ্রাকৃত শক্তিকে সন্তুষ্ট রাখার প্রয়াসে মানুষের যে বিচিত্র আচরণ, ক্রিয়াকলাপ ও বিশ্বাস— তাই-ই হল ম্যাজিক বা যাদুবিদ্যা।[২] ফ্রেজার পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ঘুরে, বিচিত্র ঘটনা ও দৃষ্টান্ত চয়ন ক'রে এ সম্পর্কে যে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এক কথায় তা অনতিক্রমনীয় ও দুর্লভ। এবং মূলত ফ্রেজারকে বহুলাংশে ভিত্তি ক'রেই অন্যান্য মতগুলি গড়ে উঠেছে।

ফোকলোর অভিধানে যাদু সম্পর্কে বলা হয়েছে: "...The art of compulsion of the supernatural, also the art of controlling nature by supernatural means"....[৩]

সিগমুণ্ড ফ্রয়েড বলেছেন: "Magic has to serve the most varied purposes– it must, subject natural phenomena to the will of man, it must protect the individual from his enemies and from dangers and it must give him power to injure his enemies".[৪]

আবার ম্যাজিকের অন্যদিকটিও লক্ষ্য করার মত: 'Though magic is a reality, it is a fantastic reality. Effects and outer reality are blended, and confusingly blended. One distorts the other; man has not yet learned to distinguish them as science and art. Yet the interpenetration which begets their distortion also ensures at this stage their mutual correction. Magic does not replace economic production; it is a special off shoot of it, and therefore is a distorted reflection of it But it is a conscious cultural reflection, portable, easily inherited and easily modified. These conveniences out weigh the distortions. Because magic, by reason of its association with economic production, contains in its mythology and ritual the correct operations for sowing and reaping or hunting, crystallises the family and tribal social relations, is compendious calender and tribal guide, and can be handed on and shared socially, it is an invaluable ally to economic production. It is a special social consciousness of economic production of the functioning of the tribe in relation to nature.'[৫]

সুতরাং মানুষের কল্পনা ও বাস্তব জীবন যাদুর মধ্যে একীভূত— দু'টিকে পৃথক করা সম্ভব নয়। বাস্তব জীবন যেমন যাদুর উপর আরোপিত, যাদুও মানুষের বাস্তব জীবনের সমস্ত কিছুর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কোনটা সত্য, কোনটা কল্পনা কিংবা

কোনটা বিজ্ঞান কোনটা শিল্প লোকগোষ্ঠীর পক্ষে তাকে পৃথকভাবে পর্যবেক্ষণ করা অসম্ভব। দ্বিতীয়ত যাদু প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদনের উৎস নয় বটে কিন্তু মানুষের অর্থনৈতিক উৎপাদন ক্রিয়ার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শিকার বা ফসল উৎপাদন করতে গিয়ে বহুলাংশে যাদুর উদ্ভব আবার উৎপাদনকে ত্বরান্বিত করার জন্য সচেতনভাবে মানুষ বিভিন্ন তুকতাক ও যাদুক্রিয়াচার করে; আর এইভাবেই পুরুষানুক্রমে তা চলতে থাকে এবং সেই সঙ্গে তা পরিশীলিত ও পরিবর্তিতও হতে থাকে। এইভাবে মানুষের চলিষ্ণু সাংস্কৃতিক জীবনের ইতিহাস রচিত হয়। যেমন বীজবোনা, ফসলকাটা বা শিকার করার সময় উপজাতি বা লোকগোষ্ঠী বিভিন্ন যাদু-ভিত্তিক নিয়মকানুন বা আচার-অনুষ্ঠান পালন করে এবং পুরুষানুক্রমেই করে। আর তাই সেই আচার-অনুষ্ঠান বা যাদু-ক্রিয়াগুলি নির্দিষ্ট হ'তে থাকে— নির্দিষ্ট কতকগুলি আকার লাভ করে। এইভাবে যাদু মানুষের অর্থনৈতিক উৎপাদনের তো বটেই সমাজ-সাংস্কৃতিক ইতিহাসেরও অন্যতম উপাদান হয়ে উঠেছে।

ফ্রেজার যাদুবিদ্যাকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। তা হল:

(ক) তত্ত্বগত যাদুবিদ্যা (Theoretical magic)— অর্থাৎ যা পৃথিবীর সামগ্রিক ঘটনাবলীর কার্য-কারণ সম্পর্কিত (cause and effect relation) বিষয়ে বিভিন্ন জ্ঞানের বিকাশ ঘটায়।

(খ) ব্যবহারিক যাদুবিদ্যা (Practical Magic)। এখানে তত্ত্বগত যাদু-বিদ্যায় আহরিত জ্ঞান মানুষ নিজ-আকাঙক্ষা চরিতার্থ করতে বিভিন্ন ক্রিয়া-কর্মের মাধ্যমে বাস্তবে প্রয়োগ করে। ফ্রেজার এই ব্যবহারিক যাদুবিদ্যাকেও কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে মূল্যবান বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে আদিম মানুষের যাদুবিদ্যা দুটি নীতি-নিয়মের ওপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথমত, 'সদৃশ বিষয় সদৃশ ফলাফল সৃষ্টিকারী' (like produces like) এবং দ্বিতীয়ত, 'একবারের সংযোগ চিরসংযোগের নির্দেশকারী' (Once in contact always in contact)। এই দু'টি নীতি অনুযায়ী তিনি দু'টি নিয়ম বা বিধি নির্দেশ করেছেন:

(ক) সাদৃশ্য বিধান (law of similarity) এবং

(খ) সংযোগ বা সংক্রমণ বিধান (law of contact or contagion)[৬]

— এই দু প্রকার যাদু সহানুভূতিমূলক বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এদের একত্রে সহানুভূতি ভিত্তিক যাদু (Sympathetic magic) বলা হয়। আমরা যথাস্থানে তা আলোচনা করব।

আবার সহানুভূতিমূলক যাদু ফ্রেজারের মতে ব্যবহারিক যাদু বিদ্যার দু'টি প্রকার ভেদের একটি। একে অস্ত্যর্থক যাদুও বলা হয়। যার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন তুকতাক, ঝাড়ফুঁক এবং আনুষঙ্গিক ক্রিয়াচার। অন্য প্রকার ভেদটি নঞর্থক— যা মূলত বিভিন্ন 'নিষেধ বিধান' (taboo)। সহানুভূতিমূলক যাদুও দু'টি শ্রেণীবিভাগে বিভক্ত। শুভ্রযাদু (white magic) এবং কৃষ্ণযাদু (black magic)। বলাবাহুল্য কৃষ্ণযাদু সমাজে সমর্থিত হয় না, যেহেতু মন্দ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার প্রয়োজনেই এর ব্যবহার।

ডাকিনীবিদ্যা বস্তুত এই কৃষ্ণযাদুর উপরেই প্রতিষ্ঠিত। ফ্রেজার যাদু-তত্ত্বকে যেভাবে ভাগ করেছেন, ছকের সাহায্যে তা এভাবে বিন্যস্ত করা যায় :
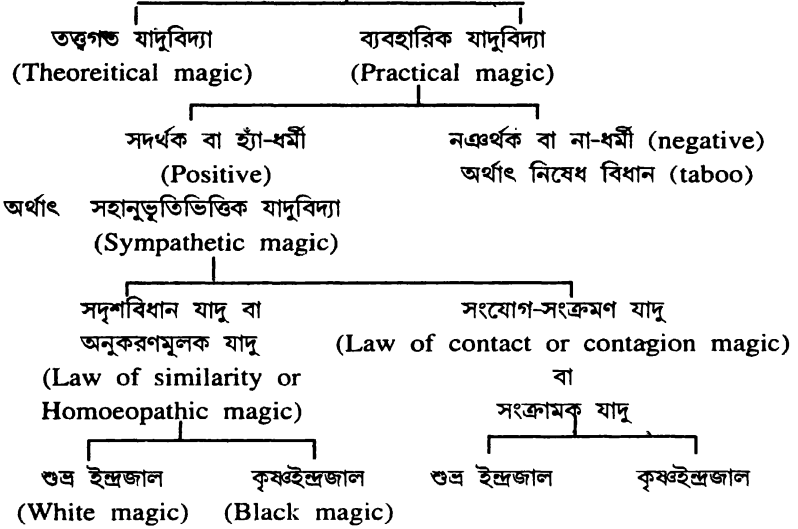
আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, সদর্থক বা সহানুভূতি ভিত্তিক যাদুর দ্বিবিধ রূপ হল সদৃশবিধান বা অনুকৃতিমূলক যাদু এবং দ্বিতীয়ত, সংযোগ বা সংক্রমণ যাদু। উভয়ই শুভ্র ও কৃষ্ণ ইন্দ্রজাল হিসেবে দু'টি ভাগে বিভক্ত। শুভ্র ইন্দ্রজাল বলতে বোঝায় যা শুভকারী এবং কৃষ্ণ ইন্দ্রজাল হল এর বিপরীত অর্থাৎ অশুভকারী। আবার ব্যবহার ও ভাবগত দিক থেকে এই শুভ্র ও কৃষ্ণ ইন্দ্রজালকে ম্যালিনৌস্কি তাঁর গ্রন্থে (ম্যাজিক, সাইন্স অ্যাণ্ড রিলিজন) দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। তা হল, প্রবর্তক (inspiretive) এবং নিবর্তক (priventire) ইন্দ্রজাল। ফ্রেজারের ভাষায় সহানুভূতিমূলক যাদু :

"Both branches of magic, the homoeopathic and the contagious, may conveniently be comprehended under the general name of Sympathetic Magic, since both assume that things act on each other at a distance through a secret sympathy, the impulse being transmitted from one to the other by means of what we may conceive as a kind or invisible ether, not unlike that which is

postulated by modern science for a precisely similar purpose, namely to explain how things can physically affect each other through a space which appears to be empty".[৭]

কাজেই ঐ দু' প্রকার যাদু অর্থাৎ অনুকৃতিমূলক ও সংযোগমূলক যাদুর বিশিষ্টতা কোথায় সে প্রশ্ন জাগে। সংক্ষেপে, কাঙ্ক্ষিত কোনো বস্তু বা বিষয় লাভ করার জন্য কোনো ঐকান্তিক বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে যদি সেই বস্তু বা বিষয়কে লাভ করার বাস্তবসম্মত অভিনয় করা যায়, তবেই তা অনুকৃতিমূলক যাদু হয়ে ওঠে। যেমন বিবাহ অনুষ্ঠানে নববধূর কোলে শিশুকে বসানো হল, যাতে তারও শিশুপুত্র লাভ হয়। অবশ্যই পরে এর সঙ্গে বিভিন্ন অনুষ্ঠান, অভিচারিক ক্রিয়া ইত্যাদি সংযুক্ত হয়।

সংযোগ বা সংক্রমণমূলক যাদু অনুকরণমূলক যাদু পদ্ধতি থেকে কিছুটা পৃথক। এক্ষেত্রে বিশ্বাস করা হয় যে, কোনো বস্তু বা প্রাণীর কোনো অংশ বা মানুষের পরিধেয় অংশ অথবা নখ চুল ইত্যাদির মূল থেকে বিছিন্ন হলেও তার মধ্যে মূলের সঙ্গে এক অচ্ছেদ্য সংযোগ থাকে, এমনকি ঐ খণ্ডাংশ যদি অন্য কোনো বস্তুর সংস্পর্শে আসে, তবে খণ্ডাংশের গুণ বা শক্তি (অতিলৌকিক) দ্বিতীয় বস্তুটিতেও সঞ্চারিত হয়।[৮] আদিম মানুষের কেন, লোক সমাজেও এই বিশ্বাস, ঐ খণ্ডাংশের ক্ষতিসাধন করলে মূলেরও তা হবে অথবা খণ্ডাংশের অতিলৌকিক গুণ ধারণকারীর মধ্যে সঞ্চারিত হবে। যেমন মেয়েরা মাথার চুল যেখানে সেখানে ফেলে না এবং ফেললেও থুথু দিয়ে ফেলে। বিশ্বাস, এর ফলে ঐ চুল দিয়ে কোনো তুক করা সম্ভব হবে না। কিংবা পুজোর পর প্রতিমা নিরঞ্জনের সময়, প্রতিমার খাঁড়া, মালা ইত্যাদি বা পুজোর ফুল সিঁদুর ইত্যাদি মানুষ সঙ্গে রাখে বা ঘরে রেখে দেয়। বিশ্বাস এই যে, এর ফলে কোনো অশুভ শক্তির কোপ থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।

শুভ্র ইন্দ্রজাল বলতে বোঝায় যখন যাদু বিশ্বাস বা যাদু শক্তি কোনো সৎ উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হয়, আর অসৎ উদ্দেশ্যে বা কারো ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে যাদু শক্তিকে ব্যবহার করা হলে তা হয় ব্ল্যাক আর্ট বা কৃষ্ণ ইন্দ্রজাল। বৃষ্টি নামানো বা ভালো ফসল লাভের উদ্দেশ্যে যে সব যাদু ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয় তা শুভ্র ইন্দ্রজাল এবং ডাইনীদের বিভিন্নপ্রকার যাদু, মারণ উচাটন ইত্যাদি নিঃসন্দেহে কৃষ্ণযাদু।

সুতরাং অনুকরণ মূলক বা সংযোগমূলক যাদু দ্বিবিধ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতে পারে যাদের শুভ্র এবং কৃষ্ণ ইন্দ্রজাল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এগুলিও আবার প্রায়োগিক দিক থেকে দু'ভাবে ব্যবহৃত হতে পারে যেমন আহ্বানমূলক বা প্রবর্তক এবং প্রতিরোধমূলক বা নিবর্তক— পূর্বেই তা উল্লিখিত হয়েছে।

যেমন ধরা যাক্ বৃষ্টি আবাহনমূলক কোনো যাদু একই সঙ্গে যেমন অনুকরণমূলক ও শুভ্র যাদু, তেমন প্রবর্তকমূলক যাদুও বটে। পক্ষান্তরে বাচ্চার শয্যার তলায় লোহা রাখা হয় যাতে কোনো অশুভ শক্তি শিশুকে আক্রমণ না করতে পারে। এটি সংযোগমূলক, শুভ্র ও নিবর্তক যাদুর দৃষ্টান্ত। নিম্নের দৃষ্টান্তগুলির সাহায্যে বিষয়টি স্পষ্ট হবে :

নববধূর কোলে
বাচ্চা বসানো হয়
যাতে সে
সন্তানবতী হয়
প্রবর্তক বা
আহ্বানমূলক
ধরা যাক কাউকে
আহত করার জন্য
তার নকল
প্রতিমূর্তিকে আহত
করা হয়
শুভ্র ইন্দ্রজাল
অনুকৃতিমূলক যাদু
১
কৃষ্ণ ইন্দ্রজাল
গ্রামে কলেরা যাতে
না হয় তাই কল্পিত
কলেরা রোগ
উৎপাদনকারী অশুভ
শক্তিকে গ্রামের
বাইরে ছুঁড়ে ফেলার
নকল অভিনয়
নিবর্তক
বা
প্রতিরোধমূলক
ধরা যাক গ্রামে কলেরা
রোগ উৎপাদনকারী
অশুভ শক্তিকে গুণিন
যাতে দূর করতে না
পারে তাই পূর্বেই
ডাইনী কর্তৃক
অনুকৃতিমূলক যাদু
আশ্রয়ী অভিচারিক
কার্যকলাপ

বিড়ালের গর্ভফুল শুকিয়ে তাবিজে ভরে প্রসূতিকে পরিয়ে দিলে সহজে প্রসব হয়

প্রবর্তক বা আহ্বানমূলক

কারোর পরিধেয় বস্ত্রাংশের সাহায্যে তুক করে তাঁর ক্ষতি করা হয়

শুভ্র ইন্দ্রজাল

সংযোগমূলক যাদু
২

কৃষ্ণ ইন্দ্রজাল

বিবাহের সময়ে কনেকে বহন করে আনা হয় যাতে মাটির সঙ্গে কনের স্পর্শ না ঘটে, কারণ বিশ্বাস এই যে মাটির মধ্যস্থিত দুষ্ট আত্মা কনের উপর ভর করতে পারে

নিবর্তক বা প্রতিরোধমূলক

ধরা যাক, অপদেবতা কর্তৃক আক্রান্ত রোগীর দেহ থেকে দুষ্ট আত্মা যাতে সহজে না যেতে পারে তাই ডাইনী কর্তৃক রোগীর বস্ত্রাংশের সাহায্যে অভিচারিক ক্রিয়া সাধন

যাদুকে আংশিক বা পূর্ণভাবে আশ্রয় করে যা যা গড়ে উঠেছে

যাদু : বাংলা লোক সাহিত্যের অন্যতম উৎস

যাদুবিদ্যাকে আশ্রয় করে একদিকে যেমন বিভিন্ন লৌকিক সংস্কার, প্রথা, বিশ্বাস, ক্রীড়া, নৃত্য, ডাকিনীবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা ইত্যাদি গড়ে উঠেছে, তেমনি লোক-সাহিত্যের ধারাটি অর্থাৎ লৌকিক ব্রত, নাট্য, ছড়া-ধাঁধা (মন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত) সঙ্গীত ইত্যাদির সৃষ্টি হয়েছে। তবে একথা অনিবার্যতই সত্য যে উপর্যুক্ত বিষয়গুলির একমাত্র উৎস নিঃসন্দেহে যাদুবিদ্যা নয়, কেননা তাহলে সমস্ত ছড়া, সঙ্গীত ইত্যাদি সবকিছুকেই যাদুবিদ্যানির্ভর বলতে হত। আসলে আমাদের বক্তব্য হল, লোকসংস্কৃতির প্রাগুক্ত বিষয়গুলির অনেকটাই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে যাদুবিদ্যার দ্বারাই প্রভাবিত ও সৃষ্ট। এর মধ্যে মন্ত্র (যা কিনা মূলত ছড়া অথবা অর্থহীন ধ্বনি সমবায়ে গঠিত), লৌকিক ব্রত, ডাকিনীবিদ্যা, বিবিধ লৌকিক প্রথা, ইত্যাদি এখনো সম্পূর্ণই যাদুবিদ্যা-জাত ও যাদুনির্ভর। আর অন্যান্য বিষয়গুলির ক্ষেত্রে বলা যায় ঐগুলির উৎস অনিবার্যতই যাদুবিদ্যা, কিন্তু পরবর্তীকালে তার কিছু অংশ যাদুবিদ্যা নিরপেক্ষ হয়ে উঠেছে। যেমন, লোক-নৃত্যের কথাই ধরা যাক। এ বিষয়ে মতদ্বৈত নেই যে আদিম মানুষ তার শিকারকে ঘিরে উল্লাসে নৃত্য করত। ক্রমে ভালো শিকার পাওয়ার আশায় কাল্পনিক শিকারকে ঘিরে তাদের যে নৃত্যানুষ্ঠান, সেখানে উল্লাস নিঃসন্দেহে মূল প্রবণতা নয়, মূল প্রবণতা হল অনুকৃতিমূলক যাদুবিশ্বাসের সাহায্যে ভালো শিকার লাভ— র‍্যালফ্ এল বিয়ালস এবং হ্যারি হয়জারের 'অ্যান ইনট্রোডাকসন্ টু অ্যানথ্রোপোলজি' গ্রন্থে এবিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে। এখানে দেখা যাচ্ছে সর্বপ্রাণবাদে বিশ্বাসী মানুষ শিকারের আত্মাকে বা পশুর আত্মাকে যাদুর সাহায্যে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করছে, যে কারণে ফ্রয়েড যাদুবিদ্যাকে সর্বপ্রাণবাদের কলাকৌশল বলে মন্তব্য করেছেন।[১] আবার এই যে শিকারকে ঘিরে নৃত্য তার মধ্যেই ক্রমে লোকনাট্যের বীজটি উপ্ত হয়েছে। সেই সঙ্গে সভ্যতার যত অগ্রগতি হয়েছে, মানুষ পৃথকভাবে অর্থাৎ যাদু প্রয়োজনের তাগিদের বাইরেও নিছক অনুষ্ঠান বা চিত্ত বিনোদনের জন্য লোকনৃত্য লোকনাট্য ইত্যাদি সৃষ্টি করে চলেছে। বা লোক সমাজের স্বতঃস্ফূর্ত উৎসারণ হিসেবে এগুলি বিকশিত হয়ে চলেছে। আমরা এবারে এমন কিছু লোকসাহিত্যের দৃষ্টান্ত বিশ্লেষণ করতে পারি, যাতে উপর্যুক্ত মতের সত্যাসত্য নির্ধারণ করা যায় :

মন্ত্র

প্রাকৃত অপ্রাকৃত বিষয় বা ঘটনাকে অলৌকিক উপায়ে নিয়ন্ত্রণ করার অপর নাম যে যাদুবিদ্যা তা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। কিন্তু এই অলৌকিক নিয়ন্ত্রণ প্রত্যক্ষভাবে কিছু কৌশল ও ক্রিয়ার উপরে নির্ভরশীল।

রেমণ্ড দেখিয়েছেন যে আদিম মানুষের যাদু বিশ্বাস মূলত তিনভাবে প্রযুক্ত হত। বিভিন্ন বস্তুসামগ্রী, বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান এবং প্রার্থনা বা শব্দ আবৃত্তি ইত্যাদি

উপাদানের মধ্য দিয়ে তারা তাদের যাদুবিশ্বাস ও যাদু শক্তিকে প্রয়োগ করত।[১০]

এই প্রার্থনা ও অর্থহীন ধ্বনিসমষ্টি ক্রমে 'মন্ত্র' হিসেবে পরিচিত হয়। অর্থপূর্ণ ভাষার ক্ষেত্রেই নয়, সমস্ত ক্ষেত্রেই মন্ত্র উচ্চারণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।'.... ক্ষেত্র অনুযায়ী কিংবা ক্রিয়া (rite) অনুযায়ী মন্ত্রের ভাষা ভিন্নতর রূপ নেয়। মন্ত্রের ভাষায় থাকে অনুপ্রাস, ধ্বনিবৃত্তি (onomatopoeia) এবং উপমা। মন্ত্রে কখনো কখনো একটি সম্পূর্ণ পৌরাণিক কাহিনী বা কোনো বিশেষ কাহিনীর উল্লেখ দেখা যায়।[১১]

লক্ষণীয় বিষয়, মন্ত্রের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই দেবদেবীর উল্লেখ থাকে। এর কারণ দুটি। প্রথমত, দেবদেবীর নামোচ্চারণে মন্ত্রের কার্যকরী শক্তি বৃদ্ধি পায় বলে লোকমানসের বিশ্বাস এবং দ্বিতীয়ত, মন্ত্রের সঙ্গে আদিতে প্রার্থনা সমার্থক ছিল বা তার যোগ ছিল।[১২]

Tylorও বলেছেন 'prayer was at first a personal affair between the supplicant and the deity or power, and it asked for some definite thing. Later prayer developed into the request for ethical guidance known in the modern religion.'[১৩]

মন্ত্রের গঠনগত বা আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্য বিচার করলে দেখা যায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মন্ত্রগুলি ছড়ার আকারে সৃষ্ট যদিচ গদ্যেও মন্ত্র রচিত হতে পারে। আবার প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে ধাঁধাও মন্ত্র হিসেবে কখনো কখনো ব্যবহৃত হয়। সে যাই হোক, ছড়া ও মন্ত্রের ছড়ার মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। কারণ ছড়ার মধ্যে যে অনায়াস অসংলগ্নতা, তার সঙ্গে মন্ত্রের মধ্যকার অসংলগ্নতার পার্থক্য অনেক। মন্ত্রের মধ্যে অসংলগ্ন বাক্যাংশ খুব কমই পাওয়া যায়। মন্ত্র বিশেষ অর্থবহ, কিন্তু ছড়া এর প্রায় বিপরীতধর্মী। ছড়ার মধ্যে নির্মল আনন্দই প্রধান, কিন্তু মন্ত্রের সঙ্গে আনন্দের সম্পর্ক তেমন নেই।[১৪] আর একটি পার্থক্য হল ঃ মন্ত্রের সঙ্গে অনুষ্ঠান বা ক্রিয়া এবং বিভিন্ন বস্তু সামগ্রী অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কিন্তু ছড়ার ক্ষেত্রে তা দুর্লক্ষ্য। আবার কখনো কখনো মন্ত্র যে নিছক ছড়া হিসেবে ব্যবহৃত হয় তাও লক্ষ্য করার মত। বড়ি দেবার সময় বৃষ্টি যাতে না হয়, অথবা যাতে রোদ্দুর ওঠে, সেইজন্য ঠাকুমা-দিদিমা যে মন্ত্র উচ্চারণ করেন তা নিছক ছড়া— মন্ত্রের মর্যাদা বা গাম্ভীর্য তার মধ্যে থাকে না। আবার ওঝা ভূত তাড়ানোর সময় অথবা সর্পদষ্ট রোগীর চিকিৎসায় যে মন্ত্র ব্যবহার করে তা ছড়ার মত নয়। কারণ বৃষ্টি যাতে না হয় সেই মন্ত্রের সঙ্গে যাদু ক্রিয়া বা বিবিধ বস্তু ব্যবহারের বিষয়টি অনুপস্থিত— যদি থাকত, তবে তাও গুরুত্ব পেত। তাই অনুষ্ঠান ক্রিয়াচার ইত্যাদি হারিয়ে বেশ কিছু মন্ত্র নিছক ছড়ার পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর বাংলার লোকসাহিত্য গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে সংগৃহীত ছড়াগুলিকে যেভাবে বিন্যস্ত করেছেন, তার মধ্যে একটি পর্যায় 'ঐন্দ্রজালিক ছড়া'। রৌদ্র, বৃষ্টি আবাহনমূলক এই ছড়াগুলি আদিতে যে মন্ত্র ছিল এবং ক্রিয়ানুষ্ঠান এর সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আর মন্ত্র মর্যাদা-ভ্রষ্ট হওয়ায় এগুলি ছেলেদের মুখে মুখে ঘুরছে— বিভিন্ন পাঠান্তরগুলি তা প্রমাণ করে। তথাপি

পরিশেষে আমরা বলতে পারি, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিভিন্ন মন্ত্র ক্রিয়াচারের সঙ্গে যুক্ত না হলে তার যাদু কৌশল সার্থক হয়ে ওঠে না বটে, তথাপি স্বতন্ত্র ভাবে কখনো কখনো মন্ত্র লোকসমাজে ব্যবহৃত হয় এবং আবৃত্তির মধ্যে দিয়ে যেন অলৌকিক শক্তির উৎসারণ ঘটায়। ডঃ ওয়াকিল আহমদ এ প্রসঙ্গে বলেছেন :

"মন্ত্র হচ্ছে যাদুর বাঙ্‌ময় রূপ— মন্ত্রের মধ্যেই যাদু শক্তি আছে, মন্ত্র আবৃত্তির সাথে সাথে তার শক্তির প্রকাশ ঘটে। মাদুলি, তাবিজ, কবজ, তাগা প্রভৃতি যাদুর বস্তু উপকরণ। এগুলির মধ্যে আছে যাদুর ঔষধিগুণ। কতক বস্তুর সঙ্গে মন্ত্রের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য— বস্তুকে মন্ত্রপূত করলে তবে যাদুগুণ প্রাপ্ত হয়। যাদুকৃত বস্তুতে মন্ত্রকে আবদ্ধ ও স্থায়িত্ব দান করা হয়। ক্রিয়ানুষ্ঠানের দ্বারা যাদুর কর্মফল প্রয়োগ ক্ষেত্রে সঞ্চারিত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে মন্ত্র ও ক্রিয়া একসঙ্গে সম্পাদিত হয়, কোন কোন ক্ষেত্রে মন্ত্র ছাড়াই কেবল লৌকিক আচার দ্বারা যাদু ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। মন্ত্র, বস্তু ও ক্রিয়া কোথাও পরস্পরের সহিত সম্পৃক্ত থেকে, কোথাও স্বতন্ত্রভাবে যাদুশক্তির প্রকাশ ঘটায়।[১৫]

লোক-জীবন যাত্রায় প্রতি পদে পদে মন্ত্রের উপস্থিতি লক্ষ্য করার মত। মৌচাক কাটা, মাছ ধরা, বা শরীরে শক্তি লাভের জন্য, মাছের কাঁটা গলায় লাগলে তা নামানোর জন্য, চোরাই জিনিস ফেরৎ লাভের জন্য, নবজাত শিশুকে দুধ খাওয়ানোর জন্য— এমন বিচিত্র কিন্তু সাধারণ বিষয়কে সুষ্ঠুভাবে সাধন করার জন্য যেমন মন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তেমন ভূত তাড়ানো, বশীকরণ করা, বিপদহরণ করা, শত্রু নাশ করা, ডাইনীর দৃষ্টি ঝাড়া, সাপের বিষ নামানো, বা স্বাভাবিক প্রসব ইত্যাদির জন্যেও— মন্ত্রের ভূমিকা কম নয়। অবশ্য এ সব ক্ষেত্রে গুণিন বা ওঝাই ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়াকর্মের সাহায্যে মন্ত্র ব্যবহার করে।

এবার আমরা ছড়ার বৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন কিছু মন্ত্র দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থাপিত করছি :

সুন্দরবন অঞ্চলের মুসলমান ফকিরেরা বাঘের মুখ বন্ধ করার জন্য বাঘবন্দীর মন্ত্র আজও আউড়ে থাকে—

'আদি বন্ধন, অনাদি বন্ধন।
গাজী কালুর চোলার বন্ধন।।
আমার গায়ে বাঘের গা।
মা ফতেমার মাথা খা।।"

সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে চিকিৎসার জন্য স্বাস্থ্যকেন্দ্র আদর্শ হলেও মানুষ এখনো ওঝাব সাহায্য নেয়। ওঝা সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে বিষ মুক্ত করতে মন্ত্রোচ্চারণ করে—

'হস্ত মারম গলা মারম আর মারম দুখ।
পেট পীঠ চরণ মারম আর মারম বুক।।
পেট পীঠ চরম মারি মনসার বরে।
লক্ষ লক্ষ বাণ অমুকের কি করিতে পারে।।
কাঙুরের কামিক্ষে দেবী দিয়া গেল বর।

বালির বিন্দ্ রাজা বলে অমুক হৈল অমর।।[১৬]

সন্ধ্যায় প্রথম তারা দেখা নাকি অমঙ্গলজনক, তাই যদি কেউ প্রথম তারা দেখে ফেলে, অশুভের আক্রমণ থেকে বাঁচতে আবৃত্তি করে—

'এক তারা দুই তারা,
তিন তারা দুই বন্ধন,
তারারা সাত ভাই,
বাইন্দ্যা আস্‌লাম বড় ভাই,
তারার মা বড়া ভাগে
তারা খায় খুদ,
গাছের ডগায় মোরগ ডাকে কুককুরো কুক।'[১৭]

স্ত্রী বশীকরণ মন্ত্র—

'বাইট্যা ধরি বাইট্যা পড়ি
এই বাইট্যা কেন কান্দে
এই বাইট্যা দিয়া গিথ্যাইন
চুলের খোপা বান্দে।।
অমুকের ভুলে না গিথ্যাইন
বাইট্যায় দিলাম টান
ফিরাইয়্যা আন গিথ্যাইনের
মন পরাণ ।।[১৮]

হারানো বস্তু ফিরে পাবার জন্য নিম্নলিখিত ছড়াটি (মন্ত্র) আবৃত্তি করা হয়—

'আখ বাড়ির ধারে
ট্যাংরা মাছ নড়ে
শালুক পাতা সলতে।
পিদিম কেন জ্বলছে।
নাকছাবিটা হারিয়ে গেল
সদাই মনে পড়ছে।' (হুগলী)

চট্টগ্রামে বৃষ্টি নামানোর জন্য গ্রামের মেয়েরা কুলো ও ঘট মাথায় নিয়ে গৃহস্থর বাড়ি বাড়ি নিম্নলিখিত গানটি করে। গৃহস্থ বধূরা কুলোর উপর জল ঢালে, ঐ জলধারা দুয়ার সিক্ত করে এবং এইভাবে নাকি বৃষ্টি নামে। এটি অনুকৃতিমূলক, শুভ্র ও প্রবর্তক ইন্দ্রজালের দৃষ্টান্ত। আর গানটি অনিবার্যতই মন্ত্র। স্তোত্রপাঠ অথবা মন্ত্র আবৃত্তি কখনো কখনো বিশিষ্ট সুরে হয়— বেশিরভাগই ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম— ইত্যাদি শুদ্ধ স্বরে পর্যায়ক্রমে আবৃত্তি হয় এবং আবার এক পংক্তি হঠাৎ ষড়জে নেমে আসে এবং আগের মতই এক এক পংক্তি ক'রে সুর চড়ে :

'কালো মেঘ ধলা মেঘ তারা সোদর ভাঁই,

এক লোচা ঝড় আন ভিজি ভিজি যাই।
মেঘারাণী মেঘারাণী হাত দুউই দুউই পেলা পানি,
পা দুউই দুউই পেলা পানি,
হাঁসে দুঅলে খুজের পানি মেঘারাণীর মা
গরু এ দুঅলে খুজের পানি মেঘারাণীর মা।
কোচু তলে এক আঁড়ু পানি, মেঘারাণীর মা।
কলাতলে এক গলা পানি মেঘারাণীর মা।
কালা মেঘ ধলা মেঘ তারা সোদর ভাই,
এক লোচা ঝড় আঁন ভিজি ভিজি যাই।' (চট্টগ্রাম)

'লোচা'র অর্থ পশলা (বৃষ্টি)[১৯]

তাহলে দেখা যাচ্ছে মন্ত্রগুলি প্রকৃতিতে ছড়া, ছড়ার মতই ছন্দবদ্ধ রূপে তার প্রকাশ। তবে একথা ঠিকই যে কাব্যিক মূল্য এইসব মন্ত্রে প্রায় অনুপস্থিত বলা চলে। অনেক সময়েই অনেক অবান্তর বা অর্থহীন শব্দ এবং অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের সমারোহ ঘটে মন্ত্রে। বস্তুতপক্ষে এই বিষয়টি ছড়ারই বৈশিষ্ট্য বহন করে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আর এই কারণে মন্ত্র লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া সংহত সমাজের সংহত মানুষের দ্বারা মৌখিকভাবে এগুলি রচিত এবং সংহত সমাজ কর্তৃক ব্যবহৃত। লোকসাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্যানুযায়ী এগুলির রচয়িতার কোন সন্ধান মেলে না। প্রকৃতিতেও এগুলি লৌকিক বাংলাতে রচিত।

পৌরাণিক ও লৌকিক মন্ত্রের পার্থক্য বিস্তর। পৌরাণিক মন্ত্র মুনি-ঋষিদের দ্বারা সৃষ্ট, বেশিরভাগ সংস্কৃত ভাষায় রচিত ও লিপিবদ্ধ, আগ্রহী মানুষ ইচ্ছে করলেই তা আয়ত্তে আনতে পারেন। কিন্তু লৌকিক মন্ত্র মানুষের মুখে মুখে প্রচারিত। আর ওঝা বা গুণিনের কাছে যে সব মন্ত্র থাকে তা গুরু ধরে আয়ত্ত করতে হয়। মৈমনসিংহের একটি পালায় কিভাবে গুরুগৃহে মন্ত্র শিক্ষা করতে হয় তার বিবরণ লক্ষ্য করার মত ঃ

'ভাটী দেশে নানান গাঁয় হিরালিরার ঘর।
কেহ কেহ শিখতে যায় কেউবা জবর।।
নমঃশূদ্র যুগী নাথ গুরু মন্ত্র লৈয়া।
হিরালিরার পেশা করে সাধনা করিয়া।।
পাড়ায় পাড়ায় হিরালিরা গুণমন্ত্র জানে।
ওস্তাদের বাড়ীত গিয়া শিখ্যা দ্যাখ্যা আনে।।
মাথাত মানসিক চুল নিয়ম সেবা খায়।
দাড়ি চুল নৌখ রাখ্যা গুরুর বাড়ীত যায়।। ...'[২০]

পৌরাণিক মন্ত্রের চল পরিশীলিত সমাজে, লৌকিক মন্ত্রের চল লোকসমাজে এবং তা সংস্কৃত ভাষায় রচিত নয়— আঞ্চলিক ভাষায় রচিত। বাংলা মন্ত্রগুলি বাংলার বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় রচিত। পৌরাণিক মন্ত্রে জ্ঞানের যে গভীরতা ও প্রজ্ঞার সন্ধান মেলে,

লৌকিক মন্ত্রে তা দুর্লক্ষ্য।

পরিশেষে আমরা একটি ব্রতের মন্ত্রের উল্লেখ করব কারণ ব্রত অনুষ্ঠান পুরোপুরি যাদুবিদ্যাভিত্তিক এবং এখানে মন্ত্র ও কথার গুরুত্ব যথেষ্টই। যেমন পুণ্যি পুকুর ব্রত। অবিবাহিত মেয়েরা ভালো বর লাভের আশায় বৈশাখ মাস ধরে পালন করত। উঠোনের এক কোণে ছোট একটি পুকুর তৈরী করে তাতে 'পুষ্প' ভাসিয়ে সমপর্যায়ের (সিমপ্যাথেটিক ম্যাজিক) প্রক্রিয়ায় প্রার্থনা জানান হয় আর মন্ত্রোচ্চারণ করা হয় ঃ

'পুণ্য পুকুর পুষ্পমালা
কে পূজেরে দুপুর বেলা
আমি সতী লীলাবতী
সাত ভাই এর বোন ভাগ্যবতী।।'... ইত্যাদি।

ধাঁধা প্রবাদ ও মন্ত্র

এ বিষয়ে সকলেই একমত যে ধাঁধা নিছক বালখিল্য ব্যাপার নয়, কিংবা অবসর সময় অপনোদনের নির্দোষ আনন্দও নয়। ধাঁধা বহু ক্ষেত্রেই বুদ্ধ্যঙ্ক (আই কিউ) পরিমাপের সোপান। কিন্তু এ ছাড়াও ধাঁধার কতকগুলি ব্যবহারিক দিক আছে, নৃতাত্ত্বিকেরা সেই দিকগুলিকে চিহ্নিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে আমরা জর্জ ফ্রেজারের নাম করব, তিনি তাঁর 'দি গোল্ডেন বাও' গ্রন্থে দেখিয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাচীন 'বা-থোঙ্গা' (Ba-Thonga) বা বান্টু জাতির মানুষেরা কীভাবে বৃষ্টি আবাহন করে। এই প্রথা বা উৎসবে নারীরা রাত্রে নগ্ন হয়ে ক্ষেতে নৃত্য করত, উদ্দেশ্য বৃষ্টির দেবতাকে সন্তুষ্ট করা। (উত্তরবঙ্গের রাজবংশি সম্প্রদায়ের হুদুমাদেও অনুরূপ অনুষ্ঠান) এই অনুষ্ঠান অশ্লীল নৃত্য-গীত মুখর। অকস্মাৎ এই স্থানে কোনো পুরুষ যদি উপস্থিত হয়, তখন নৃত্য-গীত রত রমণীরা তাঁকে ধাঁধা জিজ্ঞাসা করে। পুরুষ মানুষটি যদি অত্যন্ত অশ্লীল ও অশালীন ভাষায় তার উত্তর দিতে না পারে তবে তাকে যথেষ্ট বিপাকে পড়তে হয়, এমনকি প্রহারও সহ্য করতে হ'তে পারে। ভারতের বিভিন্ন উপজাতি যেমন নাগা, কুকি, গারো, কোচ এবং বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষকদের মধ্যেও ফসল যখন পাকে তখন পরস্পরের মধ্যে ধাঁধা জিজ্ঞাসা করার রীতি আছে। উত্তর সঠিক হলে তাদের বিশ্বাস এবারে আরো ভালো ফসল পাওয়া যাবে। ফ্রেজার জানিয়েছেন এখানে ধাঁধার ভূমিকা মন্ত্রের মত।[২১] আবার বৎসরের এক একটি সময় নির্দিষ্ট আছে, যখন ধাঁধা বলা চলে না (taboo)। রাশিয়ার বহু প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষ, কেউ মারা গেলে ধাঁধা বলে। এদের বিশ্বাস ধাঁধা বললে মৃত ব্যক্তির আত্মা আর প্রত্যাবর্তন করে না। আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি মহাদেশের বহু আদিম জাতির মানুষ বন্যা, দুর্ভিক্ষের মত কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটলে উন্মুক্ত প্রান্তরে উপস্থিত হয়ে পরস্পর পরস্পরকে হেঁয়ালী জিজ্ঞাসা করে। রংপুর কুচবিহার অঞ্চলের কোচ-রাজবংশী রমণীরা হুদুম বা হুদুমাদেও অনুষ্ঠানেও ধাঁধা জিজ্ঞাসা করে। বৎসরের শেষে সূর্যের তেজ হ্রাস পেলে বহু আদিম জাতির মধ্যে ধাঁধা জিজ্ঞাসা করার

রেওয়াজ আছে। কোথাও ধাঁধা ব'লে নতুন বৎসরকে বরণ করার রীতি বিদ্যমান রয়েছে। আদিম অধিবাসীরা বিবাহের উৎসবেও ধাঁধা বলে। এই বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে, ধাঁধার সফল উত্তর দানের মধ্যে বিপদ-আপদ দূরীকরণ সম্ভব, তা ছাড়া অনাগত ভবিষ্যতেও নানাবিধ সমস্যার সহজ সমাধান সম্ভব।[২২] রথযাত্রা এবং চড়ক পূজার সময়েও ধাঁধা বলার রীতি ছিল। চড়কের চক্রাকার ঘূর্ণনের মধ্যে নববর্ষের আবির্ভাব-ইঙ্গিতটি সুস্পষ্ট। কাজেই একটি বিষয় স্পষ্ট যে ধাঁধা মন্ত্রের মত অথবা মন্ত্ররূপেই মানুষের যাদু-প্রয়োগের একটি হাতিয়ার। প্রতিকূল পরিবেশে বা ঈপ্সিত বস্তু লাভে, — এককথায় মানুষের প্রকৃতির সঙ্গে অভিযোজনমূলক ক্রিয়ায়, যাদু-উপাদান হিসেবেও ধাঁধা ব্যবহৃত হত। এম. ব্লুমফিল্ড ধাঁধার উৎস সংক্রান্ত আলোচনায় তাই বলেছেন : 'From the olden times as an early exercise of the primitive mind in its adjustment to the world about it, comes the riddles'.[২৩]

আমাদের দেশে বাংলা ধাঁধাও নিঃসন্দেহে তার ব্যতিক্রম নয়। "আমাদের বর্তমান সমাজে যে সব ধাঁধা বা হেঁয়ালী প্রচলিত আছে তার বীজ মানুষের 'সর্বপ্রাণবাদ' পর্যায়, 'সমপ্রক্রিয়ার ম্যাজিক' পর্যায় এবং অন্যান্য বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান পর্যায়ে নিহিত ছিল।"[২৪]

ড. পল্লব সেনগুপ্ত মনে করেন, "উন্নততর অর্থনীতিসম্পন্ন সমাজে ধাঁধার ব্যবহারিক প্রয়োগ ঘুচে গেলেও, যেসব জাতি-অধিজাতিরা এখনও তাঁদের চিরাচরিত, ঐতিহ্যাশ্রিত ধ্যান-ধারণাকে অক্ষুণ্ণ রেখে দেওয়াটুকুকে মোটামুটিভাবে বাঞ্ছনীয় বলে মনে করেন, তাঁদের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে যেমন বিয়ের সময়ে, সন্তান জন্মের অব্যবহিত পরে, মৃতদেহ সৎকারের আগে— ধাঁধা বলার একটা রেওয়াজ চালু আছে। একদা এসব ক্ষেত্রে ধাঁধা যাদুশক্তিসম্পন্ন মন্ত্রের সমগোত্রীয় বলে গণ্য হতো, এখন অনেক ক্ষেত্রেই এটা অবশ্য পালনীয় রেওয়াজ বলে গণ্য হয়।"

এই সব ক্ষেত্রে ধাঁধার পিছনে যে একটা ধর্মীয় উপলক্ষ আছে তা বলাই বাহুল্য। ধাঁধার মাধ্যমে যে রহস্যের জাল সৃষ্টি হয়, তাকে অতিক্রম ক'রে কোনও অশুভ ও অপ্রাকৃত শক্তি নববিবাহিত বর-বধূ কিংবা সদ্যোজাত শিশুর ক্ষতি করতে পারবে না, অথবা মৃতের আত্মা ঐ ধাঁধার জাল কাটিয়ে বেরিয়ে এসে অন্যদেরকে গ্রস্ত করতে পারবে না —এই ছিল আদিম বিশ্বাস।[২৫]

সুতরাং ধাঁধার বিভিন্ন উৎস থাকলেও, যাদু নিঃসন্দেহে ধাঁধার অন্যতম উৎস এবং ধাঁধার বিচিত্র ব্যবহারিক দিক বিদ্যামান ঠিক কথা, কিন্তু যাদুবিদ্যাগত দিকটিই তার মধ্যে প্রাচীন ও গুরুত্বের দিক থেকে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

লোকসাহিত্যের একটি অন্যতম ও সমৃদ্ধ অংশ প্রবাদ, এ কথা অবিসংবাদিতভাবেই সত্য। কিন্তু বিতর্ক যা নিয়ে, তা হল প্রবাদের সংজ্ঞা। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য বিভিন্ন পণ্ডিতের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করে তার সমন্বয়ে যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা হল : "প্রবাদ গোষ্ঠী জীবনের অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ততম সরস অভিব্যক্তি।"[২৬] মানুষের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা প্রবাদে সঞ্চিত। তাই প্রবাদের অন্তরালে মানব জীবন ও তার ইতিহাস সংগুপ্ত।

তথাপি প্রবাদের সঙ্গেও যাদুর সংযোগ আছে। অধ্যাপক আবদুল হাফিজ স্পষ্টই স্বীকার করেছেন : "প্রবাদও ধর্ম ও যাদুর প্রভাবের হাত থেকে রেহাই পায়নি। কিন্তু ধাঁধার মত প্রবাদও ধীরে ধীরে ধর্মনিরপেক্ষতা অর্জন করেছে।"[২৭]

কিন্তু আমরা বলব ধাঁধার মত প্রবাদেরও কিছু অংশের উৎস এই যাদুবিশ্বাস। এমন কি ধাঁধার মত যাদু উপাদান হিসেবে প্রবাদের ব্যবহার স্বাভাবিক ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে প্রবাদ ও প্রবচনের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য থাকলেও সাধারণভাবে প্রবচনকে প্রবাদের আলোচনা থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না এবং প্রবাদ ও প্রবচনের ভূমিকা প্রায় এক। ফলে শুধুমাত্র 'প্রবাদ' উল্লেখে প্রবচনও স্মর্তব্য হয়ে থাকে। কাজেই আমাদের বক্তব্য হল, যাদু উপাদান হিসেবেও প্রবাদ প্রবচন একদা যে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল তার চিহ্ন দুর্লক্ষ্য নয়। যেমন সম্পূর্ণ মন্ত্র হিসেবে খনার একটি বচন লক্ষণীয় :

'রাবণে কাটিলে গলা
শীতে দিলে জাগ।
যে বরণের কলাটি
সে বরণে থাক।'[২৮]

কলা, পান ইত্যাদি গাছে বাণ মেরে মানুষের অনিষ্ট করা হয়, সে ক্ষেত্রে এমন মন্ত্র অপরিহার্য। এটি তেমন একটি কলা নষ্ট করার মন্ত্র, কৃষ্ণ যাদুর দৃষ্টান্ত।

ডাক ও খনার বচনগুলি মূলত জীবনের বিভিন্ন দিকের শুভাশুভ নির্ধারণ করে। 'ডাক' শব্দটির অর্থ যাদুসিদ্ধ পুরুষ। কাজেই ডাকের বচন যে যাদু নির্ভর তা বলার অপেক্ষা রাখে না। খনার বচনও অনুরূপ। অবশ্য খনার বচনগুলি প্রধানত কৃষিসংক্রান্ত বিষয় নির্ভর। তথাপি তা যাদুভিত্তিক। লৌকিক জ্যোতিষশাস্ত্র মুখ্যত যাদুনির্ভর, ডাকের বচন তো বটেই, বহু খনার বচনও এই লৌকিক জ্যোতিষশাস্ত্রনির্ভর। সুতরাং এগুলি যাদুনির্ভর। আমরা এর কয়েকটি দৃষ্টান্ত উপস্থিত করতে পারি :

১। যাত্রাকালের শুভাশুভ সংক্রান্ত—

ক। ছাগলের কান নাড়া, গরুর কাশ
বিড়ালের হাঁচি করে সর্বনাশ।

খ। ডাইনে ফণী, বামে শিয়ালী,
দহিলে দহিলে বলে গোয়ালী,
তবে জানিবে যাত্রা শুভালি।

গ। রবি, গুরু মঙ্গলের ঊষা,
আর সমস্ত ফাসাফুসা।

ঘ। শঙ্খচিলের ঘটিবাটি
গোদা চিলের মুখে লাথি।

২। বৃষ্টি ও কৃষিসংক্রান্ত—

ক। পূর্ণিমা-অমায় যে ধরে হাল,

তার দুঃখ হয় চিরকাল।
তার বলদের হয় বাত,
ঘরে তার না থাকে ভাত।
খনা বলে আমার বাণী
যে চষে তার হয় হানি।

খ। ভাদ্র মাসে রোয়ে কলা,
সবংশে মল রাবণ শালা।

গ। শনির সাত, মঙ্গলের তিন,
আর সব দিন দিন।

(শনিবারে বৃষ্টি শুরু হলে সাত দিন, মঙ্গলবারে শুরু হলে তিন দিন, অন্যান্য দিনে হলে একদিন বৃষ্টি স্থায়ী হয়)

ঘ। কার্তিকের পূর্ণিমা কর আশা,
খনা বলে শোন রে চাষা,
নির্মল মেঘে যদি বাত বয়,
রবি খন্দের ভার ধরণী না সয়।

(কার্তিকী পূর্ণিমায় বৃষ্টি না হলে প্রচুর পরিমাণে রবিশস্য ফলে)

৩। বর্ষাফল সংক্রান্ত—

ক। পাঁচ শনি পায় মীনে,
শকুনী মাংস না খায় ঘীনে।

(চৈত্র মাসে পাঁচ শনিবার পড়লে ভয়ঙ্কর গো মড়ক হয়)

খ। বুধ রাজা মন্ত্রী শুক্র,
শস্য হবে পুরা ক্ষেত্র।

(যে বৎসর বুধগ্রহ রাজা ও শুক্র মন্ত্রী হবে, সে বৎসরে প্রচুর শস্য ফলবে)

গ। শনি রাজা মঙ্গল পাত্র,
চষ, খোড়, কেবলমাত্র।

(যে বৎসর শনি রাজা ও মঙ্গল মন্ত্রী, সে বৎসরে শস্য হানি হয়)

ঘ। চৈতে কুয়া, ভাদরে বান,
সেই বৎসর নরমুণ্ড গড়াগড়ি যান। ইত্যাদি।[২৯]

আমরা জানি প্রবাদ-প্রবচনের মধ্যে শুধুমাত্র মানুষের অভিজ্ঞতাই সংগুপ্ত থাকে না, তা ভাব বিনিময়ের ক্ষেত্রে প্রকাশিতও হয়, অর্থাৎ প্রবাদের ব্যবহারিক দিকটিও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ও সরস-তীর্যক তাৎক্ষণিক ব্যবহার বা প্রয়োগের উপরেই তার সার্থকতা। তাই দেখা যায় যাদু সংক্রান্ত ধ্যান-ধারণাই যে বহু প্রবাদ-প্রবচনের উৎস তাই নয়, উপরন্তু তার প্রয়োগের মধ্যে ঐ তির্যক, ব্যঙ্গাত্মক সরস

ভাবটিও বড় হয়ে উঠেছে, যেমন—

ক। ডাইনের মাথায় সরষে পড়া।
খ। ঝাঁটা মেরে বিষ ছাড়ানো।
গ। ডাইনীর নজর পুঁইবাদাড়ে।
ঘ। আমি এমনি দম লাগাই, ভেলকিতে ভেড়া বানাই,
দিনের বেলা তারা দেখাই।
ঙ। গুণজ্ঞান তুকতাক ছয় মাস, কপালে যা বার মাস।
চ। হাঁড়ি-ঝি চণ্ডীর আজ্ঞা।

কিছু বিশিষ্টার্থক শব্দের দৃষ্টান্তও লক্ষণীয় :

ক। ভেলকিবাজি
খ। ভেড়া বানানো
গ। ভানুমতির খেলা
গ। বশীকরণ
ঙ। টোনা করা
চ। বাটি চালানো
ছ। গুণ করা
জ। পেঁচোয় পাওয়া
ঝ। বাজিকরের ঝুলি, ইত্যাদি।[৩০]

লোকনৃত্য

লোকনৃত্য সম্পর্কে হ্যাভলক এলিস যা বলেছেন তা প্রথমেই স্মর্তব্য ঃ "... a savage does not preach his religion, he dances it."[৩১]

লোকনৃত্য সম্পর্কে মার্কিন লোকনৃত্য বিশেষজ্ঞ জি. পি. কুরাথ যে মূল্যবান মন্তব্য পেশ করেছেন তাও লক্ষণীয় :

"Folk dance is communal reaction in movement patterns to life's crucial cycles. Its true magico-religious function concerns preservation of the individual and the race."[৩২]

—এখানে দু'টি জিনিস লক্ষণীয়। প্রথমত, গোষ্ঠীবদ্ধতা ও দ্বিতীয়ত, ধর্ম-যাদু বিশ্বাসের আশ্রয়ে টিঁকে থাকার চেষ্টা। বস্তুত গোষ্ঠী মানব ধর্ম-যাদুবিদ্যাগত কারণেই দলবদ্ধভাবে নৃত্য করত এ মত নিয়ে সমাজ সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানীদের মধ্যে তেমন মতভেদ নেই। দক্ষিণ ফ্রান্সে 'ত্রোয়া ফ্রেরে' (Trois Freres) গুহায় মুখোশ পরিহিত নৃত্যরত চিত্রটি, —যা কিনা পৃথিবীর প্রাচীনতম নাচের ছবি বলে চিহ্নিত— তা অনিবার্যতই যাদু নৃত্যের দৃষ্টান্ত ব'লে অ্যাবে ব্রুইল তাঁর 'ফোর হানড্রেড সেঞ্চুরীজ অব্ কেভ আর্ট' গ্রন্থে মনে করেছেন।[৩৩]

ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যও এই মত পোষণ করেন যে, "আদিম সমাজে ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া ব্যক্তি ও সমাজকে দৈব বিড়ম্বনা হইতে রক্ষা করিবার জন্য নৃত্যের উদ্ভব হইয়াছিল।"[৩৪]

কাজেই বোঝা যায় যে লোকনৃত্যের উৎসভূমিটি অবিসংবাদিতভাবেই মানুষের যাদুবিশ্বাস থেকে উদ্ভূত শিকার-স্তরে দলবদ্ধ মানুষ শিকারকে ঘিরে উল্লাস করত, অতঃপর তা নৃত্যরূপ পেল। শিকারে যাওয়ার আগে তারা কাল্পনিক শিকারকে ঘিরে ঐ স্বতঃউৎসারিত উল্লাসকে সচেতনভাবে ব্যবহার ক'রত— যাতে উল্লাস করার মত ভালো শিকার মেলে। এ প্রসঙ্গে তাই বলা হয়েছে ঃ "নাচের উদ্ভব হয়েছিল যাদুর সূত্রেই যেহেতু, তাই মুখোশ, ছদ্মবেশ, যাদুভঙ্গিমা ইত্যাদি ছিল তার প্রাথমিক উপকরণ। আবার যেহেতু পশু শিকারই ছিল সেই সময়ের মুখ্য জীবিকান্বেষণ, তাই শুধু পশুর ছদ্মবেশ ধরাই নয়, তাদের হাবভাব, চলাফেরা, লাফঝাঁপ, অঙ্গভঙ্গী প্রভৃতিও তখন ব্যাপকভাবে অনুসরণ করতে হতো মানুষকে। তাই নাচের মধ্যে পশুসুলভ চলন্ এখনও অনুসৃত হয়। পুরুলিয়ার ছৌ-এর একটি বিশিষ্ট চলন ভঙ্গিমার নামই 'পশুচাল'।[৩৫]

ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন দৈব দুর্বিপাক থেকে রক্ষার তাগিদে বিভিন্ন যাদু ক্রিয়ার অবশ্যম্ভাবী অঙ্গ হিসেবে নৃত্য বিকশিত হয়ে উঠতে লাগল। আরো পরে তা জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সম্পৃক্ত হয়ে গেল এবং এইভাবে নৃত্য সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে লাগল। মানুষের ইঙ্গিত ভাষণ (gesture language) যুদ্ধভঙ্গী ইত্যাদি নৃত্যের মুদ্রা হয়ে উঠল; আবার বিভিন্ন ধর্মীয়-যাদু বিশ্বাস মূলক ক্রিয়া, যৌন তৃপ্তি ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের প্রেরণা-উদ্দীপনা হিসেবেও নৃত্যের ভূমিকা প্রবল হয়ে উঠল। এইভাবে ধীরে ধীরে নৃত্য কোথাও কোথাও ধর্মনিরপেক্ষ, কখনো সামাজিক উৎসবের প্রমোদ নৃত্য হিসেবে স্বাতন্ত্র্য অর্জন করল।

বাংলা লোকনৃত্যকে আমরা কয়েকটি ভাগে বিন্যস্ত করতে পারি ঃ

ক। বৎসরের বিশেষ বিশেষ তিথিতে অনুষ্ঠিত ধর্মীয় নৃত্য, যেমন— কীর্তন, মদনকাম ইত্যাদি।

খ। সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠানের প্রমোদ নৃত্য, যেমন— ঘাটু, খেমটা, লেটো, ঝুমুর, ঘোড়ানাচ, বাঘনাচ।

গ। তিনটি পর্বে বিভক্ত আচার নৃত্য—

১) গাজন— হরগৌরী, দশাবতার, গম্ভীরা ইত্যাদি

২) ব্রত— সূর্য, মাঘমণ্ডল, ভাদু, করম, জাওয়া। উত্তরবঙ্গের মেছেনী ইত্যাদিও উল্লেখযোগ্য।

৩) বিবিধ— রাবণকাটা, ওঝা, গোপিনী, আরতি, জারি ইত্যাদি।

ঘ। যুদ্ধ নৃত্য— রায়বেঁশে নাচ, ঢালি, কাটি, রণপা, পাইক, লাঠি ইত্যাদি।

ঙ। লোকনাট্যের নৃত্য— কৃষ্ণলীলা, কুশান, নতুন যাত্রা, মনসা যাত্রা, আলকাপ, ভাসান যাত্রা, বিষহরা, রামায়ণ-মহাভারত ইত্যাদির নৃত্য।

চ। বিদ্রোহাত্মক লোকনৃত্য।[৩৬]

এছাড়া আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হল লোকসঙ্গীতের নৃত্য। যেমন, উত্তরবঙ্গের চোর-চুন্নী —যা পুরোপুরি ঐন্দ্রজালিক। কেননা কালীপুজোর দিন চুরি করতে পারলে সারাবছর চৌর্যবৃত্তি ভালো চলে —এই ঐন্দ্রজালিক বিশ্বাসটুকুই চোর-চুন্নী গানের জন্ম দিয়েছে।[৩৭]

লোকনাট্য

এ কথা অবশ্যই শিরোধার্য যে শুধুমাত্র কোনো একটি উৎস থেকে লোকনাট্য সৃষ্টি হয়নি। কাজেই ম্যাজিকই যে লোকনাট্যের একমাত্র উৎসভূমি, তা বলা সমীচীন নয়। তথাপি যদি বলা হয়, যেহেতু ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়াকর্ম ছিল অত্যন্ত প্রাচীন এবং ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়াকর্মের মধ্যে একদা অন্তত লোকনাট্যের বীজ উপ্ত হয়েছিল, তবে আর বিতর্ক থাকে না। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক :

আব্দুল হাফিজ সাহেব জানিয়েছেন : রংপুর জেলার নিলফামারী মহকুমায় বন্ধ্যা গাছ থেকে ফলমূল পাবার আশায় একজন ব্যক্তি গাছটিকে কাটতে যায় এবং কয়েকজন তাকে বাধা দেয় ও কাটতে বারণ করে।[৩৮] অনুরূপ যাদু ক্রিয়া ইরাণেও আছে বলে তিনি জানিয়েছেন।

বসুধারা ব্রতে, একটি ঘটকে ছিদ্রযুক্ত করে মেয়েরা সেই ঘটে জল ভ'রে তুলসী ইত্যাদি গাছে ছিটোয় যাতে বৃষ্টি আসে। তার সঙ্গে অবশ্য ছড়া (মন্ত্র) ব'লে গান গায়। মেছেনী ব্রতে বিচিত্র রঙের ছাতায় চাল ছড়ানো বৃষ্টিরই অনুকৃতি।[৩৯]

কিংবা আদিম গোষ্ঠীমানব শিকার পর্যায়ে শিকার পাবার জন্য পশুর মুখোশ ব্যবহার করত, পশুর গলা নকল করত এবং নকল শিকারকে কেন্দ্র ক'রে শিকার পাবার অনুকৃতিমূলক যাদুর আশ্রয় গ্রহণ করত।

এমন বিভিন্ন ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়াকর্ম, বিশেষত অনুকৃতিমূলক যাদু আশ্রয়ী ক্রিয়াকলাপে নিঃসন্দেহে অভিনয় ও নাটকের ইঙ্গিতটুকু সৃষ্টি হয়ে থাকে তা লক্ষ্য করা গেল। এমন বহু উদাহরণ আছে। কাজেই দৃষ্টান্ত না বাড়িয়ে আমরা আমাদের অভীষ্ট বক্তব্যে পৌঁছব এই বলে যে, যাদুক্রিয়া লোকনাট্যের একমাত্র উৎস ও উপাদান না হলেও এটিই প্রাচীন এবং এই কারণেই অন্যতম উপাদান। যাদুবিশ্বাস ও তৎপ্রসূত ক্রিয়া-কলাপ ও ঐন্দ্রজালিক নৃত্য-গীত বহু লোকনাট্যের সৃষ্টি করেছে তাই নয়, এখনো সৃষ্টি ক'রে চলেছে। যেমন উত্তরবঙ্গে 'মেছেনী' ব্রত বা মাঘমণ্ডলের ব্রত,[৪০] —এখনো যার লোকনাট্যের লক্ষ্যে পথ চলা শেষ হয়নি। ছৌ, গম্ভীরা, বোলান, আলকাপ— ইত্যাদি বহু লোকনাট্য ঐ ঐন্দ্রজালিক বিশ্বাস ও ক্রিয়াচার থেকে সৃষ্ট। সুতরাং যাদু লোকনাট্যের এক অন্যতম উৎস সে বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই।

মুখোশ

পৃথিবীর সমস্ত দেশেই মুখোশের ব্যবহার। বহু প্রাচীনকাল থেকেই তা ব্যবহৃত হয়ে

আসছে। প্রায় পঁচিশ হাজার বছর পূর্বের 'আপার প্যালিওলিথিক' যুগের হরিণ ইত্যাদির বিচিত্র মুখোশ পরিহিত নৃত্যরত মানুষের প্রাচীনতম চিত্রটি যা ফ্রান্সের ত্রোয়া ফ্রেরে (Trois Freres) গুহায় পাওয়া গেছে, সেটিই প্রমাণ করে মুখোশ কী প্রাচীন! এত প্রাচীন বলেই, যাদুক্রিয়ারত যাদুকরের নৃত্যরত মূর্তিটিতে ব্যবহৃত মুখোশ প্রমাণ করে, মুখোশের উদ্ভাবন ও ব্যবহার প্রথমে যাদুর সঙ্গেই জড়িয়ে ছিল নিঃসন্দেহে।

মুখোশের বহুমুখী ব্যবহার— বিশেষত নান্দনিক ব্যবহার থাকলেও যাদুবিদ্যাগত দিকটির সঙ্গেই এর ঘনিষ্ঠ ও প্রাচীন সম্বন্ধ তা পণ্ডিতেরা স্বীকার করেন। তাঁরা বলেন যে ভয়ঙ্কর দর্শন মুখোশ ব্যবহারের ফলে দুষ্ট আত্মারা দূরে সরে থাকে, কিংবা শিকার বা শস্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ মুখোশ ব্যবহারে, হিতকারী আত্মা বা শক্তির সাহায্য পাওয়া যায় বলে আদিম মানুষের বিশ্বাস ছিল।[৪১] প্রসঙ্গত দেহচিত্রণ, উল্কি ধারণ ইত্যাদি ক্ষেত্রেও ঐ একই প্রবণতা কাজ করত।[৪২] এখনো বাঙালী সমাজে বাচ্চাকে গৃহের বাইরে নিয়ে যাওয়ার আগে তার পায়ের তলায় বা কপালের ডানপাশে যে কাজলের ফোঁটা দেওয়া হয়, তা আসলে দুষ্ট আত্মার নজর থেকে শিশুকে রক্ষা করার তাগিদে তার শরীরে খুঁত সৃষ্টির প্রচেষ্টা মাত্র! আমাদের বিশ্বাস, নিখুঁত শরীরেই দুষ্ট আত্মা ভর করে। এমন নিবর্তক যাদুর আরো উদাহরণ আছে। মেয়ে বা বাচ্চাদের টিপ পরা, বিবাহ, অন্নপ্রাশন, ভাইফোঁটা ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে নারী পুরুষের চন্দন দিয়ে মুখমণ্ডল চিত্রিত করা,— ইত্যাদি আজ নান্দনিক ও প্রথাগত কারণে
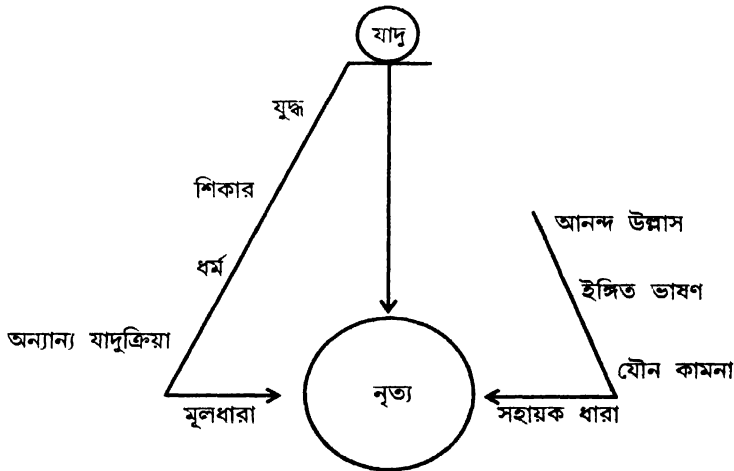
একই অনুভূমিক তলে নৃত্যের উৎস ও বিকাশ

হলেও এর অন্তরালে একদিন নিবর্তকমূলক যাদু বিশ্বাসই যে মূল কারণ ছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অশুভ শক্তির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আজও ক্ষেতে কাকতাড়ুয়া দেখা যায়। কাকতাড়ুয়া উপদ্রবকারী পাখ-পাখালি বিতাড়নের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি হয়নি। সারা পৃথিবীতেই বীভৎস আকৃতিব কাকতাড়ুয়া অশুভ শক্তি প্রতিরোধক নিবর্তক যাদুর দৃষ্টান্ত হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। অবশ্য টোটেম সংক্রান্ত ধ্যান-ধারণাও মুখোশ ব্যবহার ও সৃষ্টির অন্যতম প্রাচীন কারণ অবশ্যই, তবু একটু অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, টোটেমের বিশ্বাস ও মুখোশ ব্যবহারের মধ্যেও যাদুবিশ্বাস কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করেছে (টোটেম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। কাজেই মুখোশ সৃষ্টি ও ব্যবহারের মধ্যে আদিম মানুষের ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়াচার ও ধ্যান-ধারণাই মুখ্য ছিল।

বাংলা লোকসাহিত্যের বিভিন্ন গানে, নাচে ও নাটকে বা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মুখোশের ব্যবহার বহুদিন যাবৎ চলে আসছে। উত্তরবঙ্গের অন্যতম লোকনৃত্য 'মুখাখেল' তো মুখোশেরই নামে। এখনো পর্যন্ত গম্ভীরা, ছৌনাচ, রাবণকাটা কালীকাচ ইত্যাদি লোকনাট্য বা নৃত্যে মূলত যাদুবিশ্বাসের দ্বারা চালিত হয়েই মুখোশ ব্যবহৃত হয়। মুখোশ ধারণ করার পর দৈহিক ও মানসিক শুদ্ধাচারের দিকটিতে মুখোশধারী বিশেষ যত্নবান হয় নতুবা অমঙ্গল সূচক কিছু ঘটতে পারে বলে তাদের বিশ্বাস। গম্ভীরায় প্রধানত দেবতার মুখোশ ব্যবহৃত হয়। যেমন— কালী, চামুণ্ডা, নরসিংহ ইত্যাদি (অবশ্য ডাইনী-প্রেতিনীর মুখোশও ব্যবহৃত হয়)। ছৌ নাচে যেসব মুখোশ ব্যবহৃত হয় তা সাধারণত— রামায়ণের বিভিন্ন চরিত্রের। ধর্মীয় বা যাদুভিত্তিক মুখোশ,— নৃত্য বা নাট্যের মুখোশ তৈরীর সময়েও বিশেষ শুদ্ধাচারের দিকে লক্ষ্য রাখা হয়। উত্তরবঙ্গের গম্ভীরায় বাঘ-ভল্লুকের মুখোশও ব্যবহৃত হয় এবং এইসব মুখোশধারীর বিশ্বাস দৈহিক অশুদ্ধতার ফলে ঐ মুখোশ জাগ্রত হয়ে প্রভূত ক্ষতিসাধন করতে পারে। শ্রদ্ধেয় হরিদাস পালিতের বর্ণনাতেও পাওয়া যায়, গম্ভীরার ক্ষেত্রে এমন ঘটে, মুখোশ জাগ্রত হয়ে প্রাণসংহার করে।[৪৩]

নগরায়ণের ফলে ক্রমেই মুখোশ নৃত্য ও মুখোশ নাট্য-ব ঐন্দ্রজালিক ও ধর্মীয় রিজিডিটির বিনষ্টি ঘটছে। আবার 'মুখাখেল'-এর মত বিচিত্র ধর্ম ও যাদু নিরপেক্ষ লৌকিক নৃত্যনাট্যেরও সৃষ্টি হচ্ছে। মুখোশের সঙ্গে কোনো না কোনো ক্ষেত্রে আজও ঐ যাদু-সংক্রান্ত বিষয়টি ওতপ্রোত আছে বটে, তবে ক্রমেই তা বিবিক্ত হয়ে চলেছে।

লোকসঙ্গীত

লোকনাট্য কিংবা লোকনৃত্যের মত প্রত্যক্ষভাবে যাদুবিশ্বাস থেকে লোকসঙ্গীত সৃষ্টি হয়েছে— এমন কথা বলার পক্ষে যথেষ্ট কারণ এবং যুক্তি সুলভ নয়। লোকসঙ্গীত— যেখানে সুর এবং কথার গুরুত্ব সমান, এমনকি 'কথা'র দাবিটা

বরং বেশি বললে ভুল হয় না, (যে কারণে তাকে লোকসাহিত্যের অন্তর্গত করা হয়েছে) —এমন সঙ্গীতধারা নিঃসন্দেহে সভ্য যুগেই সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই লোকসঙ্গীত আদিম ও বর্বর যুগ পর্যন্ত পৌছতে পারে না। মানুষের বিচিত্র হৃদয়-আর্তি, হয় কিছু অনুষ্ঠান প্রথাকে ঘিরে নতুবা পুরোপুরি অনুষ্ঠান নিরপেক্ষভাবে লোকসঙ্গীতের মাধ্যমে প্রকাশ লাভ করেছে। বাংলা লোকসঙ্গীতের বিচিত্র এবং বিপুল ভাণ্ডারটির সম্পূর্ণ সুষ্ঠু এবং বৈজ্ঞানিক বিভক্তিকরণ, বিন্যাস ও বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ তাই আজও অসম্পূর্ণ ও দুরূহ হয়ে আছে। আবদুল হাফিজ বিভিন্ন পণ্ডিতের মতামত বিশ্লেষণ করে বাংলা লোক-সঙ্গীতের যে বর্গীকরণ ও শ্রেণীবিভাগ করেছেন তা অসম্পূর্ণ হলেও মূল সাধারণ বিভাগ দু'টিকে যথাযথ বলে সকলেই বিবেচনা করবেন। তিনি লোকসঙ্গীতকে যে দু'টি ভাগে বিভক্ত করেছেন তা হল:

(ক) লোকসংস্কারগত লোকসঙ্গীত এবং

(খ) লোকসংস্কার নিরপেক্ষ লোকসঙ্গীত[৪৪]

প্রথম বিভাগটি অর্থাৎ লোকসংস্কারগত লোকসঙ্গীতকে বিশেষিতকরণ ক'রে আরো দু'টি ভাগ করেছেন, তা হল:

(১) ধর্মীয় এবং

(২) যাদুবিদ্যাগত।

উল্লেখ্য যে এই ভাগগুলি তিনি লোকসঙ্গীতের ভাববৈশিষ্ট্য আঞ্চলিকতা বা সুরধর্মের বিশিষ্টতা অনুযায়ী করেননি, করেছেন লোকসঙ্গীতের উৎসগত দিক থেকে। সুতরাং আমাদের আলোচ্য বিষয় ও দৃষ্টিকোণ যেহেতু অভিন্ন, তাই আমরা তাঁর এই বর্গীকরণ শিরোধার্য করছি।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে কোনো যাদুবিদ্যাগত কারণ বা প্রয়োজন থেকে লোকসঙ্গীত প্রত্যক্ষভাবে সৃষ্টি হয়নি, অর্থাৎ লোকসঙ্গীতের যাদুবিদ্যাগত ভূমিকাটি মন্ত্রের মত, —কতিপয় নৃত্য বা নাট্যের মত অপরিহার্য ও প্রত্যক্ষ নয়। বস্তুত ধর্মীয় বা যাদুক্রিয়া সম্পৃক্ত বিভিন্ন প্রথা ও অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র ক'রে বিভিন্ন লোকসঙ্গীত গড়ে উঠেছে। দ্বিতীয়ত, কখনো কখনো মন্ত্র লোকসঙ্গীতে রূপান্তরিত হয়েছে এবং তৃতীয়ত, প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই জাতীয় লোকসঙ্গীতগুলির ধর্ম বা যাদু অনুষ্ঠান নিরপেক্ষ হওয়ার প্রবণতা মৌলিক বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে। যেমন ঝুমুর গান। উৎসগত দিক থেকে বিচার করলে তা অবিসংবাদিতভাবেই ধর্মীয় যাদুবিদ্যাগত, কিন্তু বর্তমানে সম্পূর্ণতঃই ধর্ম যাদু নিরপেক্ষ। আবার রামলীলার গান বা গাজনের গান প্রত্যক্ষভাবে ধর্ম-যাদুর কোনো উদ্দেশ্য চরিতার্থ করে না, সাধারণ মানুষের সুখ দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা অথবা ঐ অনুষ্ঠান সম্পৃক্ত কোনো পৌরাণিক বা লৌকিক কাহিনী ব্যক্ত করে; কিন্তু ঐ বিশিষ্ট অনুষ্ঠান অর্থাৎ এক্ষেত্রে রামলীলা বা গাজনের অনুষ্ঠান ছাড়া এগুলি গীত হয় না। তাই এগুলি আনুষ্ঠানিক পর্যায়ের গান ব'লে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য বা কোনো কোনো পণ্ডিত

মন্তব্য করেছেন। বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে গীত হওয়ায় তা 'ক্যালেন্ড্রিক' (Calendric) ও বটে। যাইহোক, বিষয়টি উদাহরণ সহযোগে পর্যালোচনা করা যাক। নিম্নের কয়েকটি গান লক্ষণীয়:

১। গাজনের গান

আর এ ভবে যার বিয়া দুই
তার কপালে সুখ নাই।
দেখ শিবের ঘরে গঙ্গা দুর্গা দুই রমণী
তারা বিবাদ করেন দিবারাতি।
একজনের থালে দুই জন বইসে
প্যাট না ভরলে কান্দন আইসে।
আর অভিমানে রাগে কথা কয় না
গাল ফুলাইয়া রয়।

লক্ষণীয় এই গানটি নেহাৎ পারিবারিক ও গার্হস্থ্য সমস্যাকেই তুলে ধরেছে। অথচ গাজনের উৎস মুখ্যত যাদু-বিশ্বাস।

২। বাস্তুপূজার গান

স্বর্গের হাড়িয়া. হাড়িয়া, হাড়িয়া রে।
মঞ্চে লামিয়া খোলা চাঁচ্যা দে।
বাস্তুদেবী খাইবেন পূজা খোলা চাঁচ্যাদে।
স্বর্গের হাড়িয়া, হাড়িয়া হাড়িয়া রে।
মঞ্চে নামিয়া ছড়াঝাট দে।
বাস্তুদেবী খাইবেন পূজা ছড়াঝাট দে।
স্বর্গের হাড়িয়া, হাড়িয়া, হাড়িয়া রে।
মঞ্চে লামিয়া ফুল তুল্যা দে।
বাস্তুদেবী খাইবেন পূজা ফুল তুল্যা দে।[৪৫]

পৌষ মাসে অনুষ্ঠিত এই বাস্তু পূজার গানের বিশেষত্ব হল বাস্তুদেব-দেবীর তোষণ করা। এই গানটি দেখে বোঝা যায় অনেকটা মন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত ছড়াই যেন গানে রূপান্তরিত। তবু বাংলা মন্ত্রের বৈশিষ্ট্যটিও তেমন জোরদার নয় এবং ছেলে ভুলানো ছড়া বলেই বেশি প্রত্যয় জন্মে। অথচ বাস্তু পূজা বিষয়টি সম্পূর্ণ যাদুভিত্তিক।

৩। হুদুমা দেওয়ার গান

হিলহিলাইছে কমরটা মোর
শিরশিরায়ছে গাও,
কোঠে কোনা গেইলে মুঁই
হুদমার দেখা পাঁও রে,
হুদমার দেখা পাঁও।[৪৬]

উত্তরবঙ্গের রংপুর জলপাইগুড়ির অঞ্চল বিশেষে বৃষ্টি আনয়নের জন্য হুদুমাদেওর অনুষ্ঠান হয়। সম্পূর্ণ যাদুবিশ্বাসমূলক এই অনুষ্ঠানে রাত্রে গ্রামের রমণীরা নগ্ন হয়ে দেহকে উপচার করে হুদুমা বা মেঘদেবতার তোষণ করে। এবং তখন যৌন উদ্দীপনামূলক বিভিন্ন গান গায় যা অশ্লীল বলেই খ্যাত। আলোচ্য গানটিতে বিষয়টি স্পষ্ট। কিন্তু মূল অনুষ্ঠান থেকে গানটিকে পৃথক করে দেখলে এর মধ্যে যাদু বৈশিষ্ট্য কিছুই খুঁজে পাওয়া যাবে না।

কাজেই আমাদের সিদ্ধান্ত, মন্ত্র ইত্যাদির মত এই জাতীয় লোকসঙ্গীত যাদু অনুষ্ঠানের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত নয়, নেহাৎ একটা অভ্যাস বা আনুষ্ঠানিক প্রয়োজনেই তা যেন গীত হয়। তবে দু'একটি ব্যতিক্রম যে খুঁজলে পাওয়া যাবে না তা নয়; যেমন একটি বনদুর্গার ব্রতের গানের দৃষ্টান্ত, যেখানে গানের মাধ্যমেই ব্রতিনী গাছের আত্মাকে জাগরূক করার চেষ্টা করে:

'লাম লাম, বনদুর্গা, ষাইট শেওড়ার নীচে,
কিমতে লামিবাম আমি শাড়ী নাই আমার সঙ্গে।
সইয়ারে পাঠাইয়া দিছি নশিরাবাজের শ'রে,
শাড়ী যে আনিছেন সইয়ার সিঙ্গিরায় বইলে।
লাম লাম, বনদুর্গা, ষাইট শেওড়ার নীচে।
কিমতে লামিবাম আমি শঙ্খ সিন্দূর নাই আমার সঙ্গে।
সইয়ারে পাঠাইয়া দিছি শম্ভু গঞ্জের হাটে,
শঙ্খ সিন্দূর যে আনিয়াছে সইয়ায় কাগজে বইলে।
লাম লাম, বনদুর্গা ষাইট শেওড়ার নীচে।[৪৭]

—এখানে গানটি প্রত্যক্ষতঃই ঐন্দ্রজালিক।

এবারে আমরা আবদুল হাফিজ কৃত শ্রেণীবিন্যাসের সহায়তায় কতিপয় বাংলা লোকসঙ্গীতের উল্লেখ করব যেগুলি যাদুগত বা ধর্ম-যাদুগত:

(ক) সম্পূর্ণ যাদুভিত্তিক বাংলা লোকসঙ্গীত:

১। বনদুর্গার গান
২। ভাইফোঁটার গান
৩। কার্তিক ব্রতের গান
৪। বাস্তু পুজোর গান
৫। পৌষপার্বণের গান
৬। মাঘমণ্ডলের গান
৭। উত্তম ঠাকুরের গান
৮। নীল পুজোর গান
৯। ভাজো গান
১০। সহেলোর গান
১১। লৌলা গান

১২। কুলের মাগনের গান
১৩। ত্রিনাথের গান
১৪। গাজীর গান
১৫। বসন রায়ের গান
১৬। ঘেঁটু পুজোর গান
১৭। শীতলা পুজোর গান
১৮। শীতলা নৃত্যের গান
১৯। গাজনের গান
২০। বেহুলার গান
২১। হুদুমা দেওয়ের গান
২২। বদনা বিয়ের গান
২৩। ব্যাঙের বিয়ের গান
২৪। মাদারের গান
২৫। মাণিক পীরের গান
২৬। সত্যপীরের গান
২৭। সোনা রায়ের গান
২৮। মেঘের গান
২৯। গোরক্ষনাথের গান
৩০। পটুয়াদের গান
৩১। ভাদু গান
৩২। টুসু গান
৩৩। জাওয়া গান
৩৪। বাঁধনা পরবের গান
৩৫। তুলসী ও দড়ি গাছার গান
৩৬। কাটি নাচের গান
৩৭। চড়কের গান
৩৮। জিতা পুজোর গান
৩৯। গরু নাচের গান
৪০। গোয়ালীর গান (যুগপৎ যাদুভিত্তিক ও ধর্মনিরপেক্ষ)
৪১। ঝাঁপান গান

(খ) যাদুভিত্তিক কিন্তু ধর্মীয় বাংলা লোকসঙ্গীত :

১। বৃত্তিভিত্তিক গান (সাপুড়ে বেদে ইত্যাদির গান)
২। বাউল গান
৩। হ্যাঁচোড়ার গান
গম্ভীরা গান

৫। হোলীর গান
৬। বিভিন্ন প্রকার জারী গান
৭। বোলান গান
৮। রামলীলার গান
৯। কালী পুজোর গান
১০। জন্মাষ্টমীর গান
১১। মনসা পুজোর গান, ইত্যাদি।[৪৮]

মানুষের ধর্মোপাসনার সঙ্গে যাদুবিশ্বাস ও তৎপ্রসূত ক্রিয়াচার অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। উপর্যুক্ত গানগুলির মূল উৎস হ'ল ধর্ম অর্থাৎ যাদুবিশ্বাস। বহু গান একদা 'মন্ত্র' হিসেবে ব্যবহৃত হ'ত, পরে তা লৌকিক সঙ্গীত হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত হয়; এমন কি অনেক গান ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে ক্রমে গার্হস্থ্য ও সমাজ-চিত্রকেই অবলম্বন করে। কিন্তু মানুষের যাদুবিশ্বাসই যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এর উৎস তা অনস্বীকার্য।

লোকক্রীড়া

উপযোগিতার দিক থেকে খেলাধুলো কয়েকটি উদ্দেশ্য সাধন করে, সেগুলি হল অবসর বিনোদন, চিত্ত বিনোদন, শরীর চর্চা এবং বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধন। কিন্তু লোকক্রীড়ার উৎস বা সৃষ্টির কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে এক একজন পণ্ডিত এক একটি বিষয়কে গুরুত্ব দিয়েছেন। ঐ বিতর্কের মধ্যে না গিয়ে আমরা সমন্বয়মূলক মনোভাব নিয়ে লোকখেলাব উৎসগুলি নির্দেশ করছি:

ক) প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজন করতে গিয়ে মানুষ খেলাধুলোর রীতি-নীতি বা বিভিন্ন খেলা আবিষ্কার করেছে।[৪৯]

খ) অনুকরণবৃত্তি। মানুষের স্বাভাবিক ও সহজাত প্রবণতা অনুকরণ। জীবনের অনুকরণ তাই অনেক সময়েই লৌকিক খেলা হয়ে উপস্থিত হয়েছে। তাই কেউ কেউ বলেছেন যে নৃত্য বা নাটকের আদিরূপ এই খেলার মধ্যেই প্রথম বিকাশ লাভ করেছিল।[৫০]

গ) স্বেচ্ছা কল্পনা। মানুষ, বিশেষত শিশু তার বাস্তব জীবনের আকাঙ্ক্ষাকে বাধাহীন স্বপ্ন কল্পনাব মধ্য দিয়ে লাভ করতে চায় এবং সেক্ষেত্রে আত্মতৃপ্তি চরিতার্থ করতে গিয়ে খেলার সৃষ্টি করে। যেমন একটি শিশু শ্লেটে একটি বড় বৃত্তাকার দাগ ও একটি ছোট বৃত্তাকার দাগ টেনে যথাক্রমে হাতী ও ঘোড়া আঁকে এবং কাটাকুটি দাগ টেনে হাতী ঘোড়ার যুদ্ধে তার প্রিয় হাতীকে জয়ী করে আনন্দ লাভ করতে পারে। আরো একটি অভিজ্ঞতা-নির্ভর দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষে বন্দী ছোট ছেলেরা ফুটবল খেলার বিকল্প হিসেবে খাতায় ফুটবল খেলে। কাগজে দু'পাশে গোল পোস্ট এঁকে দু'জন বা তিনজন কলমকে পিছনদিকে চাপ দিয়ে একটি আকস্মিক রেখা টানে। ঐ সংক্ষিপ্ত রেখাটি অতঃপর যেখানে শেষ হল, পরবর্তী খেলোয়াড় ঐ শেষ

বিন্দু থেকে আকস্মিকভাবে একই কৌশলে আবার রেখা টানে। এইভাবে সবাই প্রতিপক্ষের গোলপোস্টের ভিতর রেখাটিকে চালিত করতে চেষ্টা করে। কাজেই শিশুর স্বেচ্ছা কল্পনা এমনকি প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের স্বেচ্ছা কল্পনা এইভাবে যুগ যুগ ধরে বহু লৌকিক ক্রীড়া সৃষ্টি ক'রে চলেছে।

ঘ) ধর্মীয় ও যাদু বিশ্বাসগত কারণ। ''বাংলার কতক আনুষ্ঠানিক ও ছড়ার খেলায় লোক বিশ্বাস ও মন্ত্র শক্তির প্রভাবের সূত্র পাওয়া যায়। যেমন বৃষ্টি আবাহনমূলক ছড়ার খেলা। বৃষ্টির ছড়ায় আকাশের মেঘকে আবাহন করা হয়। এতে যাদুবিশ্বাসের প্রভাব আছে।[৫১] বস্তুত বেশ কিছু লোকক্রীড়ার উৎস হিসেবে অথবা বিভিন্ন লৌকিক ক্রীড়ার মধ্যে প্রতিফলিত হয়ে যাদুবিশ্বাস বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। কাজেই লোকক্রীড়া সংক্রান্ত আলোচনা আমরা এই অংশ বা বিভাগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখব এবং কতিপয় লোকক্রীড়া দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থিত করব।

হাডুডু, কানামাছি, কুমির-কুমির, গোল্লাছুট, সোলঝাপটা, বউছি, রুমালচুরি ইত্যাদি খেলাগুলিতে স্পর্শ-যাদুর বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। এইসব খেলাগুলিতে যদি কেউ প্রতিপক্ষকে স্পর্শ করতে পারে তবে সে বা তারা 'মোর' অর্থাৎ মরা (ইনভ্যালিড) বলে তৎক্ষণাৎ গণ্য হয়। হাডুডু খেলায়, যে কেউ প্রতিপক্ষের কোটে দম বন্ধ করে প্রতিপক্ষের কাউকে ছুঁয়ে আসতে পারলেই স্পৃষ্ট খেলোয়াড় মৃত বা 'মোর' হয়। দম বন্ধ আছে জানানোর জন্য অর্থহীন শব্দ, যেমন কপাটি কপাটি, হা টিক টিক ইত্যাদি একনাগাড়ে, এক দমে বলতে থাকে। আবার কোথাও কোথাও ছড়াও বলা হয় একদমে। দম ছেড়ে অথবা মুখে আওয়াজ বন্ধ করলে প্রতিপক্ষের কেউ আক্রমণকারীকে স্পর্শ করলে আক্রমণকারীই মোর হয়। আসলে এখানে আক্রমণকারী খেলোয়াড়ের অর্থহীন শব্দোচ্চারণ বা ছড়াকাটা, মন্ত্রের ভূমিকা নেয যা কিনা প্রতিরোধমূলক যাদু। একদমে বিশেষ কিছু শব্দোচ্চাবণ বা একনাগাড়ে শব্দোচ্চারণের বিষয়টি ওঝা বা গুণিনের বিরতিহীন মন্ত্রোচ্চারণের অনুকৃতি। পরে 'দম' বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে। যেহেতু স্পর্শ যাদুই এই খেলাগুলির সামগ্রিক নিয়ন্ত্রক তাই তার অনিবার্য প্রতিক্রিয়ায় স্পর্শ প্রতিরোধজনিত 'ফাঁক' এবং সেই সূত্রে 'মন্ত্র' ও 'দম' অনুষঙ্গগুলি এসেছে।

কানামাছি, কুমির-কুমির— ইত্যাদি খেলাগুলিতেও স্পর্শের ভূমিকা প্রধান, তাই প্রতিরোধজনিত 'ফাঁক' এখানেও উপস্থিত। সেই স্পর্শ প্রতিরোধী বস্তুটি (অনেকটা ফেটিশ হিসেবে গণ্য হতে পারে) সাধারণভাবে মানুষ, গাছ, পাথর— ইত্যাদি হয়ে থাকে, যাকে খেলার ভাষায় 'বুড়ি' বলে আখ্যায়িত করা হয়। 'বুড়ি' ছোঁয়া থাকলে প্রতিপক্ষের ছোঁয়া আর কার্যকরী হয় না।

'কানামাছি' খেলাটির উৎস প্রসঙ্গে জনৈক গবেষক বলেন : ''কানামাছি' খেলার মধ্যে যে মানুষের আদিম কতকগুলি সংস্কাব বিচিত্রভাবে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে, সেকথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। শারীরিক প্রতিবন্ধী সম্পর্কে মানুষের অবচেতন মনে

এক ধরনের ভয় এবং অস্বস্তি থাকেই, এমন কথা মনোবিজ্ঞানীরা বলেন। আদিম মানুষের চেতনায় অন্ধ, খঞ্জ প্রভৃতি পঙ্গু লোকেরা তাঁদের দৈহিক প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও যে মোটামুটিভাবে জীবনযাত্রা চালিয়ে যেতে পারেন, এই ব্যাপারটা এক রকমের 'অলৌকিক' ক্ষমতা বলেই প্রতীত হতো (যার অনুষঙ্গে উত্তরকালে গড়ে উঠেছে 'কানা খোঁড়া একগুণ বাড়া' জাতীয় প্রবাদ বচন)। অন্ধ যদি কাউকে স্পর্শ করে ফেলে, তাহলে সেও দৃষ্টিশক্তি হারাবে এমনই একটি স্পর্শমূলক জাদু সংস্কার প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষের মনে দানা বেধেঁছিল। সেই ভীতির বশেই, অন্ধকে না ছোঁবার যে একটি প্রয়াস তাঁদের মনে ক্রিয়াশীল ছিল, তারই অনুকরণে তাঁদের শিশুরাও কখন এই খেলার আদিতম রূপটি তৈরী করেছিল। অরণ্যে মধু সংগ্রহ করতে গিয়ে মৌমাছির তাড়া খাওয়ার অভিজ্ঞতাও এর পিছনে মিলে মিশে আছে নিঃসন্দেহে। সংস্কার এবং জীবিকান্বেষণ, এই দুই উপলক্ষ একত্রে এই খেলার মূল পরিকাঠামোটিকে গড়ে তুলেছে।"[৫২]

এই যে সংক্রমক যাদু বিশ্বাসজনিত ধারণা অর্থাৎ অন্ধ ছুঁলে অন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা, কিংবা যেমন অন্যদৃষ্টান্ত, মৃতদেহ স্পর্শ করলে স্নান ক'রে আগুন ছোঁয়া ইত্যাদি প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা না নিলে অকল্যাণ হয়, মৃতের অতৃপ্ত আত্মা স্পর্শকারীর শরীরে ভর করে (বা তার চরম অকল্যাণ— জীবন নাশ করে) এই জাতীয় বিশ্বাস থেকেও কয়েকটি লোকক্রীড়া জন্মলাভ করেছে। যেমন— চোর-চোর, সোলঝাপটা, ছি-ছত্তর, গাছছুয়া-গাছছুয়া, কুমির-কুমির প্রভৃতি খেলায় যদি চোর, কুমির বা বাঘ ইত্যাদি প্রতিপক্ষের কাউকে স্পর্শ করে, তৎক্ষণাৎ সেও চোর কুমির বা বাঘে রূপান্তরিত হয়। আবার এর ফলে যে চোর বা কুমির ছিল সে মুক্তি পায়। আত্মার সংক্রমণ, রূপান্তর— ইত্যাদি আত্মাবাদ সংক্রান্ত যাদুবিশ্বাস যে "magical transformation" এইসব ক্ষেত্রে স্পষ্টই লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সুতরাং সংক্রমণ (Contagious Magic) যাদুবিশ্বাসই এই জাতীয় খেলার উৎস অথবা নিয়ন্ত্রক সে বিষয়ে বিতর্কের কোন অবকাশ থাকে না।

দোলপূর্ণিমার আগের দিন 'নেড়া-পোড়া' বা 'বুড়ির ঘর পোড়ানো' বাংলাদেশের একটি প্রচলিত আনুষ্ঠানিক খেলা। কোথাও কোথাও এর নাম 'চাঁচর'। এটি সম্পূর্ণই যাদু সংস্কারমূলক অনুষ্ঠান। শুকনো পাতা, খড়, পাটকাঠি, নারকেল পাতা ইত্যাদি মাঝখানে পোঁতা একটি বাঁশের সঙ্গে বেঁধে মাথায় কখনো কখনো একটি হাঁড়িতে চোখমুখ এঁকে বসিয়ে দেওয়া হয়। অতঃপর সন্ধ্যায় অগ্নিসংযোগ করা হয়। অশুভ শক্তি, আত্মা বা অশরীরী ভূত তাড়ানোর উদ্দেশ্যেই এই ক্রীড়ানুষ্ঠানের সৃষ্টি। এই খেলাটিই বাংলাদেশের ময়মনসিংহ-বরিশাল-ফরিদপুর অঞ্চলে 'ভুলা-পোড়ানো' (ভুলা = ভূত) 'আলোডালো' বা 'ভূত'-খেদানো' নামে পরিচিত। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে ও নামে এই অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। ক্ষেত্র ও উর্বরাতন্ত্রের সঙ্গেও এর যোগ আছে। আবার ঘুড়ি ওড়ানোর মূলেও আছে আকাশচারী অশুভ আত্মা বা শক্তিকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা।[৫৩]

বিবাহ অনুষ্ঠানে কড়ি খেলা, গুটি খেলা, আঙটি খেলা, দধিকর্দম— ইত্যাদি প্রতিটি খেলাই উর্বরাতান্ত্রিক যাদু আচার সম্পৃক্ত, আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে এ বিষয়ে আলোচনা করব।

আরো কতিপয় লোকক্রীড়ার সন্ধান পাওয়া যায় যা সম্পূর্ণতঃই ঐন্দ্রজালিক এবং ঐ সংস্কার কাটিয়ে পুরোপুরি বিস্তৃত ক্রীড়ার জগতে প্রবেশ করতে পারেনি। যেমন, কাদামাটি খেলা, ঢোপের খেলা, পাতা খেলা ইত্যাদি।[৫৪] দৃষ্টান্ত হিসেবে কাদামাটি খেলাটিকেই ধরা যাক। আবদুস্ সাত্তারের বর্ণনা অনুযায়ী:

"গ্রীষ্মকালে অর্থাৎ ফাল্গুন-চৈত্র-বৈশাখ মাসে অনাবৃষ্টিতে সারা দেশ যখন জ্বলে পুড়ে ছারখার হওয়ার উপক্রম হয়— তখন গ্রামের ছেলে-মেয়েরা দলবেঁধে বাড়ী বাড়ী এই ছড়াটি আবৃত্তি করে আর গৃহস্থ তাদের গায়ে পানি ঢেলে দিলে তারা উঠোনের মধ্যে গড়াগড়ি যায়। এই গড়াগড়ি খাওয়াকে গ্রামের লোকেরা 'পেঁক-খেলা' বা 'কাদামাটি খেলা' বলে।"[৫৫]

বস্তুত বেশির ভাগ লোকক্রীড়ার সঙ্গে ছড়া সম্পৃক্ত। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য এই খেলার ছড়াগুলি সম্পর্কে বলেছেন ঃ

"এই শ্রেণীর ছড়ার মধ্যে সুস্পষ্ট যেমন কোন অর্থও প্রকাশ পায় না, তেমনই চিত্রগত সঙ্গতিও রক্ষা পায় না।..."

"ইহারা তাল-প্রধান রচনা এবং তালকেই একান্তভাবে নির্ভর করিয়া ইহারা বিভিন্ন সঙ্গত ও অসঙ্গত সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ চিত্রের সমাবেশে রচিত হইয়া থাকে। তাল মাত্র ইহাদের লক্ষ্য থাকে বলিয়া ইহাদের বহির্মুখী বস্তু অবলম্বন নিতান্ত শিথিল, ইচ্ছামত নূতন নূতন বিষয় ও চিত্র অতি সহজেই ইহারা আশ্রয় করিয়া থাকে, তাহার ফলে অতি সহজেই পরিবর্তিত হইয়া থাকে। ঘুমপাড়ানি কিংবা অন্যান্য ছেলে ভুলানো ছড়া যেমন ইহাদের সুনিবিড় ভাব এবং চিত্ররসের গুণে সারা বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চল ব্যাপিয়া অতি সহজেই প্রচার লাভ করিয়াছে, ইহারা সেভাবে বিস্তৃত ক্ষেত্রে প্রচার লাভ করিতে পারে নাই।"[৫৬]

খেলার ছড়ার বৈশিষ্ট্য হিসেবে ড. ভট্টাচার্যের এই মত সংশয়াতীতভাবেই স্বীকার্য। কিন্তু ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে, খেলার ছড়ার প্রাগুক্ত অপূর্ণতাই তার বৈভব। তাল প্রাধান্য, অর্থাৎ তুলনামূলকভাবে ছন্দ নিপুণতা এগুলির একটি সমৃদ্ধ দিক। তেমন সঙ্গত-অসঙ্গত, সম্পূর্ণ-অসম্পূর্ণ ঐ চিত্র যদি গভীর অনুসন্ধিৎসা নিয়ে বিশ্লেষণ করা যায় তবে খেলাগুলির অন্ধকার অতীত ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও উৎসের সন্ধান মেলে। আবার ইচ্ছেমত নতুন নতুন চিত্র ও শব্দ সংযোজিত হয় বলেই খেলাগুলির বিবর্তনরেখাটি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ড. অসীম দাস তাঁর গবেষণায় তা প্রমাণ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন বহু ক্ষেত্রেই অর্থহীন শব্দ অথবা চিত্র কীভাবে আদিম জীবন-লক্ষণ-সম্পৃক্ত হয়ে উঠেছে।[৫৭]

আবার তেমনই অর্থহীন শব্দ বা চিত্রের আরো একটি ভূমিকা আছে— মন্ত্রের আলোচনায় আমরা তা লক্ষ্য করেছি। বিশেষ বিশেষ শব্দ যাদুশক্তি সম্পন্ন। তার অর্থ

থাক বা না থাক। মন্ত্রের এই বৈশিষ্ট্য বহু খেলার ছড়ায় আছে —যা প্রমাণ করে, ছড়াগুলি আসলে মন্ত্র বা একদা মন্ত্র হিসেবেই ব্যবহৃত হত। ফলে এও প্রমাণিত হয় যে, ঐ সব খেলাগুলি অনিবার্যতঃই যাদু-আশ্রয়ী অথবা যাদুবিশ্বাস বা যাদু ক্রিয়াচার প্রসূত। যেমন পূর্বে বর্ণিত কাদামাটি খেলার সময় যে ছড়া আবৃত্তি হয় তা যে নিঃসন্দেহে বৃষ্টি আবাহন মন্ত্র, ওয়াকিল আহমদ সাহেবও তা স্বীকার করেছেন:

"তেঁতুল-বিচি পেখম ধর
গুড়ুম গুড়ুম বাদল ঝর।
ফাটা আসমান ছিলাইয়্যা দে
গুটি সূতা নাই।" —ঢাকা[৫৮]

'আমপাকা' বা 'রামের ঝুল' খেলাটিতে ব্যবহৃত ছড়া:

'চি চটকা আমের বোল,
গাছে উঠি মারি শোল।
শোলের কপালে ফোঁটা,
খেড়ু মারি গোটা গোটা।

—গোটা গোটা খেড়ু মারা, শোল ও শোল মারা, শোলের কপালে ফোঁটা—ইত্যাদির মধ্যে যাদু সংস্কার ও মন্ত্র বৈশিষ্ট্যটিই সহজলভ্য।[৫৯]

গাছছুয়া-গাছছুয়া খেলাটিতে প্রশ্নোত্তরমূলক নিম্নলিখিত ছড়াটি ব'লে গাছের নীচে অবস্থানকারী বাঘ ও গাছের উপরকার ছেলেদের মধ্যে খেলা শুরু হয়:

'গাছছুয়ারে গাছছুয়া, গাছে ক্যারে?
— বাঘের ভয়ে।
বাঘ কই?
— জমির পরে।
— জমিন কই?
— ঐ তো।
— তরা কয় ভাই?
— সাত ভাই।
— এক ভাই দিবে?
— ধরতে পারলে নিবে।[৬০]

ড. দাস দেখিয়েছেন যে, সাত যাদু সংখ্যাটির উল্লেখ প্রমাণ করে এটি প্রাগার্য অস্ট্রিকগণেরই সৃষ্টি।[৬১] তাদের কাছে সাত ছিল যাদু সংখ্যা, তাই রূপকথার সাত রাজার দেশ, সাত সমুদ্র, সাতভাই চম্পা, সপ্তপদী বা সাত পাক (বিবাহে)। ময়মনসিংহ গীতিকার 'কাজলরেখা'-য় নায়িকা সাত দিন সাত রাত ধ'রে মৃত রাজপুত্রের দেহ থেকে সূচ তোলে : "সাত দিন সাত রাত বাইছা তুল্‌লাম শাল।/এই দুঃখ কপালে ছিল হইব এমন হাল।" ('চন্দ্রাবতী' গীতিকায় জয়ানন্দ চন্দ্রাবতীকে

আড়াই অক্ষরের প্রেমলিপি দেয় ঃ "পরথমে লিখিল পত্র চন্দ্রার গোচরে।/পুষ্পপাতে লেখেপত্র আড়াই অক্ষরে।" উল্লেখ্য কিছু কিছু প্রাচীন বাংলা পুঁথি ও তন্ত্র-মন্ত্র সংক্রান্ত পুথিতে আড়াই অক্ষর মন্ত্রের কথা শোনা যায়। বলাবাহুল্য এটিও এমন একটি যাদু সংখ্যা।) যাই হোক, এই যাদু সংখ্যার প্রয়োগ তাই খেলাটির যাদু সম্পৃক্ত চরিত্রটিকেই ইঙ্গিত করে, কাল প্রবাহে আজ তার সেই বৈশিষ্ট্য লুপ্তপ্রায়। আর একটি দৃষ্টান্ত লক্ষণীয় :

"হাতে লাঠি কান্দে বাঁশ, আমি আইলাম কালিদাস।
বাঘ মারি বাঘাহি মারি, ভৈষ ভালুকের মুণ্ড ছিড়ি।
ঠাংডা জিলকি দুই হাতে ধরে।
আসমানে লাটি, জমিনে কাটি, পর্বতের মাথায় লাথি,
হাতীর কাঁধে রামদা ধরাই, আমি বাঞ্ছারামের নাতিরে—
আমি বাঞ্ছারামের নাতি।" —ময়মনসিংহ

—এটি হাড়ুডু খেলার ছড়া হিসেবে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য সংকলিত করেছেন। ড. আশরাফ সিদ্দিকী এই ছড়াটিকে পেশ ক'রে বলেছেন :

"মনে হয় উপরোক্ত ছড়াটি, যা এখন খেলার ছড়া হিসাবে প্রচলিত, বাঘখিলানি, সিরালি এবং সাপের মন্ত্রগুলির অংশ ছিল। বিভিন্ন অংশ মিলে গিয়ে এমন রূপ নিয়েছে যে মন্ত্রটিকে আজ চেনাই মুশকিল।"[৬২]

ড. সিদ্দিকী লুকোচুরি খেলা প্রসঙ্গে একটি মূল্যবান দিক নির্দেশ করেছেন। গ্রীয়ারসন সংগৃহীত মাণিকচন্দের গানে রাণী ময়নামতী ও গোদা যমের লুকোচুরি খেলা, বা হজরত বড়পীর ও মাদার পীবের লুকোচুরি খেলা এক ধরণের যাদু রূপান্তর (magical flight) বলে বর্ণনা করেছেন, এবং বর্তমান লুকোচুরি খেলাটিকে 'প্রাচীন কোনো রূপান্তর প্রক্রিয়ার সারভাইভাল' ব'লে মনে করেছেন, কেননা, সারা পৃথিবীতে তার অজস্র দৃষ্টান্ত আছে।[৬৩] হিন্দুদের বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনীতে যেমন ঐন্দ্রজালিক রূপান্তর (magical transformation) আছে তেমন যাদু রূপান্তরেরও বহু দৃষ্টান্ত আছে। যেমন, দেবী দুর্গার হাত থেকে বাঁচার জন্য অসুরের বিভিন্ন স্থান, বস্তু এবং পরিশেষে মহিষের ভিতর আত্মগোপনের বিষয়টি এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। বিভিন্ন লৌকিক ক্রীড়ায় প্রায়শই বিভিন্ন ছড়া,— ইংরেজীতে যাকে প্লে সং বলে, তা আবৃত্তি বা গীত হয়, যদিচ তা গান নয়— ছড়াই। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দু' একটি স্বরের (যেমন ষড়য, ঋষভ ইত্যাদি) তলে (plane) তা আবৃত্তি হয় টেনে টেনে (প্লুত স্বর)। এই খেলার ছড়াগুলি নিঃসন্দেহে বাংলা লোকছড়ার ভাণ্ডারটিকে সমৃদ্ধ করেছে। যাদু সম্পৃক্ত বা যাদু থেকে সৃষ্ট বহু লোকক্রীড়ার সঙ্গেও এমন কিছু ছড়া আছে। আমরা দু' একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত ক'রে এই আলোচনা শেষ করব :

ছি ছত্তর এর ছড়া—

'ছি ছাত্তা কচুর বই
চ্যাংড়া প্যাংড়ীর নানা হই।

টাকের উপর আয় না
পুঁটির মাছ খায় না।
টাকের উপর গোস্ত
ছোঁয়া দিলে দোস্ত।[৬৪]

লুকোচুরির ছড়া—
'নানি গাঙে কত পানি,
হাতী ঘোড়া তল যায়
বগের হাঁটু পানি,[৬৫]

হাডুডু খেলার ছড়া—
'উতুরী ধুতুরী কৈতরী ভাজা,
ভাংনা মাছে ধরছে খাজা।
ভাংনা মাছের ঘাড়ে তেল
রান্ধতে রান্ধতে পরাণ গেল।'[৬৬]

গীতিকা ও যাদু

বাংলা গীতিকায় লোকজীবনের বিভিন্ন বিশ্বাস-সংস্কার বহুলাংশেই প্রকাশ পেয়েছে, তাই গীতিকার প্রসঙ্গ উল্লেখ না করলেই নয়। যে যাদু বিশ্বাস ও যাদু-সংস্কার লোকজীবনের মজ্জাগত, গীতিকার বিভিন্ন পালায় তারই স্পষ্ট উপস্থিতি। এর মধ্যে দু' একটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ময়মনসিংহ গীতিকার 'মহুয়া' পালায় হুমরা-মাইন্‌কিয়া বেদে দলবল সহ যখন খেলা দেখাবার উদ্দেশ্যে বিদেশে যাত্রা করে' তখন তাদের সঙ্গে বাঁশ, তাঁবু, গাধা, ঘোড়া, শিকারীকুকুর ইত্যাদি বহুবিধ জিনিষ-পত্রের সঙ্গে লোককবি যাদুদণ্ড (যা কিনা রাও চণ্ডালের হাড়) এর উল্লেখ করতে ভোলেন নি; কেননা বেদেদের খেলা দেখানো ও শক্তি-সামর্থ্যের প্রতীক যে ঐ বস্তুটি তা বলাই বাহুল্য:

'ঘোড়া লইল গাধা লইল কত কইব আর।
সঙ্গেতে করিয়া লইল রাও চণ্ডালের হাড়।।'

সম্ভবত 'রাও' শব্দটি রাজ শব্দ থেকে এসেছে। সুতরাং শ্রেষ্ঠ বা ক্ষমতাবান অর্থে শব্দটির প্রয়োগ। পৃথিবীর বিভিন্ন আদিম নরগোষ্ঠীর মধ্যে এই বিশ্বাস প্রচলিত যে, শক্তিমান প্রতিপক্ষের অঙ্গ-ভক্ষণ করলে বা তার অঙ্গ, হাড় ইত্যাদি সঙ্গে রাখলে নিজের বা নিজের গোষ্ঠীর শক্তি বৃদ্ধি ঘটে— যা মূলত স্পর্শ-যাদুর নিদর্শন। নাগাদের মত কোনো কোনো আদিবাসী গোষ্ঠী এই উদ্দেশ্যেই মুণ্ড শিকার করত। শ্রদ্ধেয় লেখক সুবোধ ঘোষ রাঁচীর একটি মামলার কথা জানিয়েছেন। কয়েকজন ওরাঁও সমাধি থেকে এক ইউরোপীয়ের মৃতদেহ চুরি ক'রে নিয়ে যায়। তারা স্বীকার করে যে

সাহেবের হাড় দিয়ে ভালো যাদুর কাজ হবে কেননা তাদের চোখে সাহেবরা উচ্চস্তরের মানুষ।[৬৭] আমরা অন্যত্র আলোচনা করেছি যে যাদুদণ্ড হাড় দিয়েই নির্মিত— যা স্পর্শ করিয়ে তার মধ্যস্থিত শক্তিকে ব্যবহার করা হয়। হুমরা বেদের এই হাড়, যে সে চণ্ডালের নয়— রাও চণ্ডালের, এটিই কবি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন।

'মলুয়া', 'কমলা' ইত্যাদি পালায় বিবাহের সময় 'সোহাগ মাগা'র বর্ণনা আছে। 'কমলা' গীতিকায় দেখা যায়—

''তার পরে সোহাগের ডালা মাথায় করিয়া।
সোহাগ মাগে কমলার মা পাড়া জুড়িয়া।।

মলুয়া পালায়—

'তবেত মলুয়ার মাও খুড়ী-জেঠী লইয়া।
সোহাগ মাগিতে মাও বিয়ার মঙ্গল চাইয়া।।
খুড়ীর সোহাগ, জেঠীর সোহাগ মাসি পিসি।
খুড়ীর সোহাগ মাগে কন্যার মাও মঙ্গল উদ্দেশি।।
শ্বশুরবাড়ী গিয়া কন্যা থাকুক সোহাগে।
তেকারণে কন্যার মাও ভাল সোহাগ মাগে।।
মাথায় লক্ষ্মীর কুলা অঞ্চলে ঘুরিয়া।
সোহাগ মাগিল মায়ে বাড়ী বাড়ী গিয়া।।

—সোহাগ প্রার্থনা করার এই রীতিব মধ্যে মানুষের যাদু বিশ্বাসই প্রচ্ছন্ন। বিভিন্ন উর্বরতামূলক বস্তু সামগ্রীতে সুসজ্জিত লক্ষ্মীর কুলো মাথায নিয়ে অর্থাৎ স্পর্শ ক'রে মানুষেব বৈভব কামনার মধ্যে স্পর্শ যাদুর অস্তিত্ব আছে। এছাড়া বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিভিন্ন মানুষের কাছ থেকে আশীর্বাদ কামনা করা হয় যাতে ভবিষ্যৎ জীবনে কোনো কু-প্রভাব না পড়ে; —সকলের সমবেত মঙ্গল কামনা, বারংবার লক্ষ্মীর কুলোব স্পর্শ ও তার দ্বারা বরণ— ইত্যাদি সমস্ত কিছুই কন্যার ভবিষ্যৎ জীবনের মঙ্গল কামনা ও কুপ্রভাব দূব করার উপায়,— তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এর পর—

'উত্তম সাইলের চাউলে পিঠালী বাটিয়া।
বন্দনা করিল আগে তিন আবা দিয়া।।
চিমটিয়া তুলে সবে দুয়ারের মাটী।
সোহাগের দ্রব্য আনি দেয় কুটি কুটি।।
হলদি চাকি চাকি আর তৈল সিন্দূরে।
এরে দিয়া সোহাগ ডালা সাজায় সুবিস্তবে।।
পাছে পাছে গীত গায় পাড়ার যত নারী।
সোহাগ মাগিয়া মায় ফিরে নিল বাড়ী।।
চুরপানি দিল মায় টপায় ভরিয়া।
ধন মন ছয়াইল যতন করিয়া।।'

লক্ষণীয়, 'আবা' হ'ল ঠোঁটে বারংবার হাতের তালু দিয়ে আঘাত করে শব্দ করা। জোকার (জয়কার) দেওয়া বা আবা দেওয়ার অর্থ শঙ্খধ্বনির মত অমঙ্গল বিতাড়িত করা। এই শব্দে অশুভ শক্তি দূরে সরে যাবে —এই যাদু-বিশ্বাস বহু পুরনো, আজও তা পালন করা হয়। সুতরাং শুভ অনুষ্ঠানে এগুলির অনিবার্য উপস্থিতি। এছাড়া চিমটি দিয়ে দুয়ারের মাটি তোলা ও সোহাগের দ্রব্যগুলির স্পর্শ, ধন বা মুদ্রা, মন অর্থাৎ বিশেষ গাছের কাঠ— যা পবিত্র ও শুভফলদায়ক বলে বিবেচিত হয়,— ইত্যাদি স্পর্শকরানোর মধ্যে নিঃসন্দেহে স্পর্শ যাদুর ভূমিকা গভীরভাবেই বিদ্যমান। হলুদ, তেল, সিন্দূর, চোরাপানির ঘট সবকিছুই যাদু-বিশ্বাস সম্ভূত। এর সঙ্গে উর্বরতাভিত্তিক ভাবনাও আছে— আমরা অন্যত্র এই বিষয়ে আলোচনা করেছি।

শুধু শুভ্র ইন্দ্রজাল নয়, কৃষ্ণযাদু বা ব্ল্যাক আর্টের কারবারীদের কথাও কোনো কোনো গীতিকায় পাওয়া যায়। কৃষ্ণ ইন্দ্রজালের কারবারী ডাকিনীরা অসৎ উদ্দেশ্য সাধন করে। বিভিন্ন তন্ত্র মন্ত্র, জড়ি-বুটি, গূহ্য ক্রিয়াচার প্রভৃতির দ্বারা মানুষের অনিষ্ট সাধন করে ব'লে লোক গোষ্ঠীর বিশ্বাস। তাই ডাকিনী সকলের কাছে ভীতির কারণ। 'কাজলরেখা'তে লক্ষ্মীকোজাগরের রাত্রে মন্ত্রীর কথামত নকল রাণী ও দাসীরূপিনী কাজলরেখাকে আলপনা দিতে বলা হয়। কাজলরেখা আলপনায় বিভিন্ন দেব-দেবী ইত্যাদি আঁকলেও তার সঙ্গে "ডরাই ডাকুনী আঁকে কন্যা সিদ্ধ বিদ্যাধরী।।" 'কমলা' পালায় 'চিকন গয়লানী'-র যে ছবি আছে তাতে ডাকিনীর চরিত্রই স্পষ্ট:

> 'শব্দে শুনি গোয়ালিনী পান-পড়া জানে।
> ঘরতনে কুলের বধূ বাইরে টাইনা আনে।।
> তেলপড়া দেয় যদি চিকন গোয়ালিনী।
> সুয়ামী এড়িয়া যায় ঘরের কামিনী।।
> আর একটা ঔষধ শুনি আছে তার কাছে।
> গিরধনির কানে আর কাল-পনা মাছে।।
> কিছু কিছু পেচার মাংস বাটিয়া গুটিয়া।
> তিল পরিমাণ বড়ী করে রৌদ্রে শুকাইয়া।।
> এক এক বড়ির দাম পাঁচ থুরি কড়ি।
> এরে খাইলে পাগল হয় পাড়ার যত নারী।
> বাসী জলে বড়ী খায় উঠিয়া বিয়ানে।
> সতী নারী পতি ছাড়ে ঔষধের গুণে।।"

ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলে'র হীরা মালিনীকে বোধ হয় এই চিকন গোয়ালিনী বারংবার ক্রয়-বিক্রয় করতে পারে। যাই হোক, ময়মনসিংহ গীতিকার বিভিন্ন পালায় এমন যাদু-বিশ্বাস সংক্রান্ত উপাদান সুপ্রচুর। সুতরাং আরো দৃষ্টান্ত উপস্থাপনের অপরিহার্যতা নেই।

•

লৌকিক ব্রত ও ব্রতকথা

বাংলার ব্রত সম্পর্কে প্রথম বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে নির্মোহ আলোচনা সম্ভবত শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরই করেছিলেন; নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিকের দৃষ্টি নিয়ে তিনি ব্রতকে দেখেছেন। তাই কুণ্ঠাহীনভাবে বলেছেন :

"ব্রত হল মনস্কামনার স্বরূপটি। আল্পনায় তার প্রতিচ্ছবি, গীতে বা ছড়ায় তার প্রতিধ্বনি এবং প্রতিক্রিয়া হচ্ছে তার নাট্যে নৃত্যে,· এককথায় ব্রতগুলি মানুষের গীত, কামনা, চিত্রিত বা গঠিত কামনা, সচল জীবন্ত বাসনা।"[৬৮]

অবনীন্দ্রনাথ ব্রতগুলিকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন— শাস্ত্রীয় ব্রত, নারী ব্রত ও কুমারী ব্রত। তাঁর মতে কুমারী ব্রতগুলিই খাঁটি। আবার ব্রতের গঠন বা পর্যায় তাঁর মতে মোটামুটি তিনটি ভাগে বিভক্ত, যথা— আহরণ অর্থাৎ উপচার সংগ্রহ, আচরণ অর্থাৎ যা যা করতে হয়, যেমন আলপনা দেওয়া বা নির্দিষ্ট নিয়মে উপচার সাজানো, মন্ত্র পড়া ইত্যাদি এবং পরিশেষে ব্রতকথা পাঠ। ব্রতের এই প্রত্যেকটি পর্যায়ের উৎসই হল যাদুবিশ্বাস। এবং মূলত তা সহানুভূতিমূলক, প্রবর্তক, শুভ্র ইন্দ্রজাল। প্রাগুক্ত 'আচরণ' পর্যায় প্রধানত সদৃশ যাদু বিধানের নিয়ন্ত্রণাধীন। ব্রতকথা রূপকথারই সমধর্মী কিন্তু প্রচার ধর্মী ও উদ্দেশ্যমূলক।

আহরণ পর্যায়ে ব্যবহৃত উপচারের প্রায় সবটাই বিভিন্ন বিষয়ের প্রতীক এবং উর্বরাতন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত।

ব্রত ও ধর্ম এক নয়, ব্রত আসলে সম্পূর্ণতঃই ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়াচার (ধর্ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। কিন্তু লৌকিক দেবদেবীর পূজা পদ্ধতি ও উদ্দেশ্য গত কারণ ব্রতের অনেকটা নিকটবর্তী বলে ব্রত ও ধর্মাচার কখনো কখনো অভিন্ন বলে প্রতিভাত হতে পারে।

ব্রতের উপচারে যে যে বস্তু থাকে, যেমন ধান, দূর্বা, ঘট, কড়ি, হলুদ, পান, সুপারি, সিঁদুর, চাল কলা— ইত্যাদি সবই প্রায় যাদুশক্তি সঞ্চারকারী ও উর্বরাতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার প্রতীক (কৃষি ও উর্বরাতন্ত্র অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। ব্রতের অনুষ্ঠানে কোনো পুরোহিত থাকে না।

আচরণ পর্যায়ের সবকিছুই মূলত অনুকৃতি মূলক যাদু বিশ্বাসের প্রতিফলন তা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। ব্রতের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলপনা। ধানের শীষ, ধানের গোলা, ফুল, পদ্ম, দুয়ার থেকে গৃহমুখী লক্ষ্মীর পদচিহ্ন—ইত্যাদি আলপনার মূল বিষয়। বস্তুত এ হল কামনার প্রতিচ্ছবি। অনুকৃতিমূলক যাদু। আদিম মানুষ যে শিকারের কামনা নিয়ে পর্বত গুহা গাত্রে শিকারের ছবি এঁকেছে— ব্রতের আলপনা অবিকল একই প্রবণতা থেকে সৃষ্ট। লক্ষ্মী ঘরে অচলা হবেন, তাই গৃহমুখী পদচিহ্ন। ধানে গোলা ভরে থাকবে তাই ধানের বা ধানের গোলার ছবি। পদ্ম ইত্যাদি উর্বরাতন্ত্র সম্পৃক্ত বিষয়ের প্রতীক।

আমরা ব্রতের একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করতে পারি। যেমন দশপুতুল ব্রত।

ব্রতফল : কুমারী মেয়েরা পাঁচ বছর বয়সে আরম্ভ করে ও চার বছর ধ'রে ব্রত

উদযাপন করে। ভালো ঘরে যাতে বিয়ে হয়, অথবা সুখী বিবাহিত জীবনের জন্য এই ব্রত।

সময় : চৈত্র সংক্রান্তির দিন থেকে আরম্ভ করে সারা বৈশাখ মাস পালন করতে হয়।

বিধান : বাড়ির উঠানে একটু জায়গা পরিষ্কার করে পিটুলির (আলোচাল গোলা) দ্বারা দশটি পুতুল আঁকতে হয়। পরে এক একটি পুতুলের মাথায় মন্ত্র বলার সঙ্গে ফুল তুলসী ও দূর্বা দিতে হবে।

মন্ত্র :

১) এবার মরে মানুষ হব, রামের মত পতি পাব।
২) এবার মরে মানুষ হব, সীতার মত সতী হব।।
৩) এবার মরে মানুষ হব, লক্ষ্মণের মত দেবর পাব।
৪) এবার মরে মানুষ হব, দশরথের মত শ্বশুর পাব।।
৫) এবার মরে মানুষ হব, কৌশল্যার মত শাশুড়ী পাব।
৬) এবার মরে মানুষ হব, কুন্তীর মত পুত্রবতী হব।।
৭) এবার মরে মানুষ হব, দ্রৌপদীর মত রাঁধুনী হব।
৮) এবার মরে মানুষ হব, দুর্গার মত ষোড়শী হব।।
৯) এবার মরে মানুষ হব, পৃথিবীর মত ভার সব।
১০) এবার মরে মানুষ হব, ষষ্ঠীর মত সেঁওজ হব।।[৬৯]

ব্রতটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, অন্যান্য ব্রতের মত এখানেও একটা নির্দিষ্ট দিনে এর সূচনা। এই দিন-ক্ষণ-তিথি বা জ্যোতিষ শাস্ত্রসম্মত দিন যাদু বিশ্বাসগত উৎস থেকে জাত। সংক্রান্তি, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, শনি-মঙ্গলবার ইত্যাদি বিশেষ শুভাশুভ হিতকর-অহিতকর যাদু সংস্কার সম্ভূত। রামচন্দ্র, দশরথ, লক্ষ্মণ— ইত্যাদি চরিত্রের প্রতীক আলপনার দশটি পুতুল। 'রামের মত পতি পাব'— ইত্যাদি কামনা প্রতিটি চরিত্রের প্রতীককে স্পর্শ করে ব্যক্ত করা হচ্ছে— যা মূলত অনুকৃতি যাদু, কিন্তু স্পর্শযাদুর প্রাথমিক স্তরের মধ্য দিয়ে প্রকাশমান। পূজা উপচার হিসেবে ধান-দূর্বা ব্যবহারের সংস্কার আছে— যা আসলে উর্বরা-তান্ত্রিক বিশ্বাসের প্রতীকী রূপ, যদিও এসব ক্ষেত্রে অর্থ নয়-সংস্কারটিই বড়। এই ব্রত-অনুষ্ঠান সম্পৃক্ত ব্রতকথাটির বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট্য না থাকায় তা উদ্ধার করা হ'ল না।

বেশীর ভাগ ব্রতের সঙ্গে ব্রতকথা সংযুক্ত থাকে। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, ব্রতকথার মধ্যে উদ্দেশ্যমূলকতাই প্রধান। বিশেষ বিশেষ ব্রত কেন পালন করা উচিত, বিভিন্ন প্রতিকূলতা থেকে কিভাবে ব্রত ক'রে কোনো নারী সংকট মুক্ত হয়েছে, ঐ ব্রতকে তাচ্ছিল্য করার ফলই বা কি হয়েছে—এমন দৃষ্টান্ত মূলক বিষয়ই ব্রতকথার উপজীব্য,—এই বিষয়কে কেন্দ্র করে এই রূপকথাধর্মী ব্রতকথাগুলি প্রচলিত হয়ে আসছে। কখনো কখনো কোন মিথ বা তার ভগ্নাবশেষও ব্রতকথায় সম্পৃক্ত হয়ে

যায়। কাজেই রূপকথা এবং লোককথার যাবতীয় বৈশিষ্ট্যের কিছু না কিছু ব্রতকথার কায়া গঠনে ভূমিকা নেয়।

লৌকিক ধর্ম

'ধর্ম' মানব সংস্কৃতিরই একটি অন্যতম দিক। স্থান-কাল-পাত্রভেদে ধর্মের বিচিত্র সংস্কার, বিচিত্র বিশ্বাস, বিচিত্র ধারণা। কিন্তু ধর্মের মূল প্রবণতা— মানুষ তার অনিশ্চিত জীবনকে সুস্থ করতে চায়। অপার্থিব শক্তি— যা সমস্ত কিছুর চালিকাশক্তি, তাকে ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়াচারে বশ করার প্রত্যক্ষ চেষ্টার সঙ্গে দেশ ভেদে বিচিত্র বিশ্বাস-সংস্কার ও ক্রিয়াচার নিয়ে ধর্মের উৎপত্তি। মানা- অ্যানিমেটিজ্‌ম— অ্যানিমিজ্‌ম— ইত্যাদি বিশ্বাস ধীরে ধীরে দেব-দেবী ও ধর্মে রূপান্তরিত। কাজেই ধর্ম হল অতিলৌকিককে ঘিরে গড়ে ওঠা সার্বিক এক বিশ্বাস-সংস্কার ও ক্রিয়াচার— যার মধ্য দিয়ে বিশিষ্ট গোষ্ঠীর সামগ্রিক সংস্কৃতি নিয়ন্ত্রিত হয়। ঐ অতিলৌকিক শক্তি শেষপর্যন্ত দেবতারূপ পরিগ্রহ করে। যেমন হিন্দুদের ব্রহ্ম কল্পনা। টাইলর ব্রহ্ম সম্পর্কে বলেছেন :

"The doctrine of mighty nature-spirits, inhabiting and controlling sky and earth and sea, seems to expand in Asia into such ideas as that of Mahatman the Great Spirit, Paramatman the Highest Spirit, taking personality as Brahma the all pervading soul"[৭০]

ঠিক তেমনই 'God' বা আল্লা সেই মহাশক্তিরই এক এক রূপ। কিন্তু আমাদের বক্তব্য : এই প্রকার উন্নত ধর্মচেতনা ও সংস্কৃতি যে ঈশ্বরকে ঘিরে, সেই মহাশক্তি, ঐ সর্বপ্রাণবাদ ও যাদু আচারের চূড়ান্ত সংশ্লেষিত রূপ,— টাইলর এবং আরো বহু নৃতাত্ত্বিক তা স্বীকার করেছেন।[৭১] মোটের উপর, লৌকিক সাহিত্যের একটা বড় অংশের উৎস হ'ল ধর্ম। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা 'ধর্ম' অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, বিভিন্ন লৌকিক সঙ্গীত, ধর্মীয় সঙ্গীত, মন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত ছড়া, খেলার ছড়া, ধাঁধা-প্রবাদের ছিন্নদংশ, ব্রতের ছড়া, ব্রতকথা, কিছু কিছু লোকনৃত্যের ছড়া, গান; কোনো কোনো লোকনাট্য ও তার সঙ্গে অন্বিত কিছু ছড়া, গান— এ সব কিছুরই উৎস খুঁজতে গেলে, শেষপর্যন্ত মানুষের যাদুবিশ্বাসকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করতে হবে। কোথাও তা প্রত্যক্ষভাবে যাদুর সঙ্গে যুক্ত, কোথাও তা যাদু থেকে সৃষ্ট বিভিন্ন অনুষ্ঠান-প্রসূত মাত্র। বস্তুত যাদুবিশ্বাস শুধু মানুষের সাংস্কৃতিক ও আর্থ-সামাজিক বিবর্তনেরই অন্যতম নিয়ন্ত্রক নয়, প্রবলভাবে লোকসাহিত্যেরও অন্যতম উৎস।

বাংলা লোকসাহিত্যে বিধিনিষেধ

ব্যবহারিক যাদুবিদ্যায় দুটি প্রকার ভেদের অন্যতম একটি হল 'নিষেধবিধান' যার

নৃতত্ত্বসম্মত পরিভাষা ট্যাবু (taboo)।[৭২] ফ্রয়েডের ভাষায় : It is Principally expressed in prohibitions and restrictions.[৭৩] ট্যাবু হল সতর্কতামূলক নিষেধ বা আপত্তি, যা ইতর প্রাণী, বস্তু, নাম, নামের বিশেষ অক্ষর, বিভিন্ন কাজ, নক্ষত্র, ফল, বার, মাস, ইত্যাদি অনেক কিছুকে ঘিরেই হতে পারে। কী না করলে অতিপ্রাকৃত শক্তি অসন্তুষ্ট হন না, কী না করলে পৃথিবী তথা মানুষের নিজের জীবনে মঙ্গল সাধিত হয়, 'ট্যাবু' তাই-ই নির্দেশ করে। সাধারণত পবিত্র বা অপবিত্র, ভীতিপ্রদ বা বিপজ্জনক কোনো কিছুকে কেন্দ্র করেই ট্যাবুর উদ্ভব। সুতরাং ট্যাবু না মানলে ক্ষয়-ক্ষতির আশঙ্কা। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে একই বিষয়কে কেন্দ্র করে ট্যাবুর উদ্ভব হতে পারে আবার নাও হতে পারে। আবার পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় একই বিষয় থেকে সমপ্রকার বা ভিন্ন ভিন্ন এমন কি বিপরীত ধর্মী ট্যাবুরও সৃষ্টি হতে পারে। তবে বিভিন্ন দেশের লোক-সমাজে প্রচলিত ট্যাবুগুলি বিশ্লেষণ করলে তিনটি সাধারণ নিয়ম লক্ষ্য করা যায় :

১। কোনো কোনো ট্যাবু স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে সমাজের সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।
২। কোনো কোনো ট্যাবু সমাজের সকল স্ত্রী অথবা সকল পুরুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।
৩। কোনো ট্যাবু সমাজ ভেদে, স্ত্রী-পুরুষ, শিশু, ধর্ম, বিবাহিত-অবিবাহিত এবং বিভিন্ন অবস্থা ও সময় ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়।

এছাড়া অন্য দিক থেকে ট্যাবুর তিনটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়—

১। কোন কোন কাজ আচরণীয় নয়, তা নির্দেশ করে। অর্থাৎ কোনো কিছু করা দেখা, বলা, দেওয়া, নেওয়া, খাওয়া, কোনো কিছু কাটা, আঘাত করা, স্পর্শ করা ইত্যাদি নিষিদ্ধ, ট্যাবু তা নির্দেশ করে।
২। এর বিপরীত অর্থাৎ কী কী আচরণীয় তা নির্দেশ করে।
৩। কখনো কখনো কেন আচরণীয় অথবা অনাচরণীয় তার কারণ নির্দেশ করে।

ফ্রেজার তাঁর 'গোল্ডেন বাও' গ্রন্থে ট্যাবুগুলিকে 'কর্ম', 'দ্রব্য', 'ব্যক্তি' 'শব্দ' —ইত্যাদি বিষয়-এর ভিত্তিতে শ্রেণীবিভক্ত করেছেন এবং প্রাগুক্ত প্রতিটি বিষয়ের অন্তর্গত উপবিভাগে বিশেষ বিশেষ কতকগুলি দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করেছেন। যেমন 'ট্যাবুড্‌থিংস্'-এর মধ্যে লৌহ সংক্রান্ত ট্যাবু, ধারাল অস্ত্র ট্যাবু, রক্ত, মাথা, চুল সংক্রান্ত ট্যাবু —এমন বিভিন্ন বিষয় আছে। কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন প্রকার ট্যাবুগুলিকে যিনি বিশদ এবং বৈজ্ঞানিকভাবে মোটিফ অনুযায়ী শ্রেণীবিন্যস্ত করেছেন, তিনি হলেন Stith Thompson। তৎকৃত এই শ্রেণীবিভাজন নৃতাত্ত্বিক ও গবেষকদের দ্বারা দ্বিধাহীনভাবে অনুসৃত হয়ে আসছে।[৭৪]

বিধিনিষেধ ও লোককথা

লোকনাট্য ছড়া লোকসাহিত্যের অন্যান্য প্রকরণগুলির থেকে লোককথার আয়তন ও ব্যাপ্তি অপেক্ষাকৃত বেশি। অবশ্য আয়তনের দিক থেকে গীতিকাও কম নয়, কিন্তু

লোককথার সামগ্রিক ব্যাপ্তি গীতিকায় ততটা নেই বললে অত্যুক্তি করা হয় না। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য অবশ্য পদ্যে রচিত 'কথা'-কে 'গীতিকা' বলে চিহ্নিত করেছেন (বাংলার লোকসাহিত্য ১৯৫৪ সং, পৃঃ ৩০৫), কিন্তু তা কতটা গ্রহণযোগ্য বিচার করা বাঞ্ছনীয়, কেননা তাহলে পদ্যে রচিত 'ব্রতকথা'-কেও 'গীতিকা' বলতে হয়। আসলে 'গীতিকা'র একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য ও মেজাজ আছে। লোককথার অধিকাংশ উপশাখার (যেমন 'রূপকথা', 'উপকথা' ইত্যাদি) চলিষ্ণুতাই ঐ ব্যাপ্তির কারণ। নারী পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ নির্বিশেষে লোককথা প্রাসঙ্গিক-অপ্রাসঙ্গিকভাবে মানুষের কৌতূহল চরিতার্থ করে। গ্রাম, শহর, বর্ণের ভেদাভেদ অতিক্রম ক'রে তা সবার হৃদয়ে এবং স্মৃতিতে একটা স্থায়ী জায়গা ক'রে নিয়েছে। বস্তুত মাটির খুব নিকটবর্তী হওয়ায়, কথা লোকসমাজ তথা লোকমানসের অন্তরঙ্গ বৈশিষ্ট্য অপেক্ষাকৃত বেশি বহন করে। ফলে স্বভাবতই আমাদের লোককথায় নৃতাত্ত্বিক উপাদানের প্রাচুর্যও বেশি। আলোচ্য পরিচ্ছেদে বিভিন্ন প্রকার 'বাধানিষেধ' লোককথার বিভিন্ন শাখায় কোথায় কোথায় কেমনভাবে এবং কোন্ কারণে এসেছে তার অনুসন্ধান করা গেল।

রূপকথা

'কলাবতী রাজকন্যা' গল্পে নিঃসন্তান সাত রাণীর জন্য কোন এক সন্ন্যাসী একটি গাছের শিকড় দিয়ে বড় রাণীকে বলেছিলেন সাত রাণীতে মিলে এটা বেটে খেলে সোনার চাঁদ ছেলে হবে। আমাদের সমাজে সন্ন্যাসীর নির্দেশ অবশ্য-পালনীয়। এখানে ট্যাবু কী আচরণীয় তা নির্দেশ করছে। কিন্তু ন' রাণীর ভাগ্যে শিকড় বাটার তলানি ও ছোটরাণীর ভাগ্যে শিল ধোয়া জলটুকু জোটে। ফলে তার পরিণামে তাদের গর্ভে যথাক্রমে প্যাঁচা (ভুতুম) ও বানর (বুদ্ধু) জন্মায়। লক্ষণীয় এখানে ঔষধ যথাযথ না খাওয়ায় ফলের থেকে না দেওয়ার কারণটিই বেশী তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।[৭৫]

আমাদের সমাজে যে বয়সে সর্বাপেক্ষা বড় তার কর্তব্য, কদর ও সম্মান সর্বাপেক্ষা বেশী। এই কারণেই আলোচ্য গল্পে সন্ন্যাসী বড় রাণীকেই এই ঔষধ সংক্রান্ত নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু বড় রাণী তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে নি। বড় রাণী সহ অন্যান্য স্বার্থান্ধ মেজ, সেজ ও কনেরাণী, ন' রাণী ও ছোট রাণীকে ঔষধ থেকে প্রায় বঞ্চিত করেছে। যার প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে শেষোক্ত দু'রাণী ছাড়া সবারই সোনার চাঁদ ছেলে হয়েছে বটে. কিন্তু পরিশেষে বুদ্ধু আর ভূতুমই জয়লাভ করেছে এবং শেষ পর্যন্ত তারাই সর্বাপেক্ষা রূপবান এবং সব দিক থেকে শ্রেষ্ঠ তা প্রমাণিত হয়েছে। আর নৈতিক নিষেধ লঙ্ঘনের অনিবার্য ফল অন্যান্যরা ভোগ করতে বাধ্য হয়েছে।

আলোচ্য গল্পেই দেখা যায়, বুদ্ধু ও ভূতুম ছাড়া বাকি পাঁচ রাজপুত্র কাঞ্চনমালাকে নিজের রাজ্যে নিয়ে আসে। রাণীরা রাজকন্যাকে বরণ করে জিজ্ঞাসা করেন, 'রাজকন্যা তুমি কার?' যখন তারা রাজকন্যার মুখ থেকে জানতে পারেন, রাজকন্যা হীরা, মাণিক, মোতি, শঙ্খ, ও কাঞ্চন রাজপুত্রের নয়, তখন তারা কাঞ্চনমালাকে কাটতে উদ্যত হন। তখন বুদ্ধিমতী রাজকন্যা বলে, 'আমার এক মাসের

ব্রত, একমাস পরে যাহা ইচ্ছা করিও।' এবং তাই-ই ঠিক হয়। এখানে সাধারণ বিধিনিষেধই রাজকন্যাকে একমাস সময় দেয়, যা রাণীদের পক্ষে লঙঘন করা সম্ভব হয় না। পুজো, ব্রত ইত্যাদি অনুষ্ঠান পণ্ড করলে মহাপাতক হয়, এই রকম একটা লোকবিশ্বাস হিন্দু সমাজে আছে। সুতরাং এই নিষেধ কি করা অনুচিত তা নির্দেশ করছে। মণিমালার গল্পেও এইভাবে সে একবছর সময় লাভ করেছে।

'কিরণমালা' গল্পে অরুণ, বরুণ ও কিরণমালা তাদের স্বনির্মিত অট্টালিকাকে তিন ভুবনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুরীতে রূপান্তরিত করার বাসনায় এক একে মায়া পাহাড়ে যাত্রা করল। প্রথমে যাত্রা করল অরুণ। কিন্তু যাত্রাপথে বিভিন্ন প্রলোভন ও হয়ত অপ্সরাদের ডাকে পিছনে তাকানোর ফলে সে শিলাস্তূপে পরিণত হল। ভাই বরুণের পরিনামও অনুরূপ। পরিশেষে কিরণমালা মায়া পাহাড়ের উদ্দেশে যাত্রা করল। এবং বাজনা, অপ্সরা, দৈত্য, বাঘ, সাপ, ভূত-পেত্নী, বজ্র,— কোন কিছুই তার পথরোধ করতে পারে না। এমন কি একবারও সে পিছনে ফিরে তাকায় না। ফলে সে তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছাল, কাঙ্ক্ষিত বিষয় লাভ করল ও ভ্রাতা সহ আরো অন্যান্য রাজপুত্রের প্রাণ দান করল। এটিতে মিশ্র বিধি-নিষেধ ও পিছনে না তাকানোর নির্দেশ আরোপিত হয়েছে। নির্দেশ অমান্য করলে মৃত্যু। এই বিধি নিষেধের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমরা বলতে পারি, মানুষ যদি তার নির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করে একাগ্রচিত্তে এগিয়ে চলে, জীবনের বিভিন্ন আসক্তিকে জয় করতে পারে, তবেই তার সাধনা সফল ও সার্থক হয়ে ওঠে। এ হল মানুষের অভিজ্ঞতার এক শাশ্বত সিদ্ধান্ত।

'পাতাল কন্যা মণিমালা'র গল্পে একটি সুন্দর নিষেধ লক্ষ্য করা যায়। পাতালপুরীতে রাজপুত্রের সঙ্গে মণিমালার গান্ধর্ব মতে বিবাহ হয় এবং মন্ত্রীপুত্র অতঃপর তাদের যথোচিত সমারোহে নিজ রাজ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য পৃথিবীতে উঠে আসেন। এদিকে মণিমালার ক্ষোভ সে কখনো পৃথিবী দেখল না। অন্যদিকে রাজপুত্র এ সম্পর্কে সদর্থক কিছুই বললেন না। কারণ কয়েকদিন পরেই তাঁরা নিজ রাজ্যে ফিরে যাবেন। ক'দিন পরে রাজপুত্রের দিবানিদ্রার সুযোগে কৌতূহল দমন করতে না পেরে মণিমালা মণি নিয়ে সরোবরের উপরে এলেন স্নান করতে। ফল হল মারাত্মক। সেই দেশের রাজপুত্রের চোখে মণিমালা ধরা পড়ে গেলেন। এবং কাঠকুড়ানী এক বুড়ির সহায়তায় অন্য আর একদিন ধরা পড়ে অশেষ দুঃখকষ্ট স্বীকার করেন।

ভারতীয় সমাজে— (পুরুষ শাসিত হওয়ায়) পতি স্ত্রীর রক্ষাকর্তাই নন, তাঁর চোখে দেবতা। স্বামীকে অগ্রাহ্য করলে স্ত্রীকে বহু দুঃখকষ্ট পেতে হয়। মণিমালা নারী সুলভ কৌতূহল দমন করতে না পেরে নিষেধ অমান্য ক'রে ফল ভোগ করলেন।

'দেড় আঙ্গুলে'র গল্পে এক আঁটকুড়ে কাঠুরিয়া এক খুনখুনে বুড়ির কাছ থেকে একটি ছোট্ট শশা পায়। বুড়ি বলে সেটা সাতদিন পরে বোঁটা ইত্যাদি কিছু না ফেলে তাঁর স্ত্রী যেন খায়। কিন্তু আনন্দের আতিশয্যে কাঠুরে বউ সাতদিন তো দূরের কথা, সাত মুহূর্ত সময়ও নষ্ট করে না। বোঁটা খোসা ফেলে শশাটি খেয়ে নেয়। এবং নিষেধ অমান্য করার ফলে তার একরত্তি দেড় আঙুলে ছেলে জন্ম লাভ করে। এখানে

অসংযমের পরিণাম যে সর্বদাই অবাঞ্ছিত ও অশুভ, তাই প্রকাশ পেয়েছে। দ্বিতীয়ত ঔষধ সেবনের বা প্রতিষেধক গ্রহণের বিধিনিষেধ ও নিয়মকানুন যথাযথ পালন না করলে তার ফল বিষময় হয়ে ওঠে— মানুষের এই সহজ অভিজ্ঞতাই এই জাতীয় বিধিনিষেধের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন রয়েছে।

'সুখু আর দুখু'র গল্পটি লক্ষ্য করা যাক। তাঁতীর বড়বৌ আর কন্যা সুখু সুখে দিন কাটায়। তারা তাঁতীর মৃত্যুর পর সমস্ত 'কড়ি' হস্তগত ক'রে ফেলে। ওদিকে ছোট বৌ আর তার কন্যা দুখু দারিদ্র্যে কোন রকমে অশেষ দুঃখ কষ্টে দিন যাপন করে। একদিন দুখুর সব তুলো উড়ে যাওয়ায় মনের দুঃখে সে যখন ক্রন্দন করছে, বাতাস তাকে তুলো দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তার পশ্চাদগমন করতে বলে। পথে তাকে এক গাই তার গোয়ালটা পরিষ্কার করে দিতে বলে, শ্যাওড়া গাছ তার গুঁড়ির জঞ্জাল ঝাড়ু দিতে বলে, ঘোড়া তাকে ঘাস দিতে বলে—এই ভাবে সে সকলের কাজ করে চরকা বুড়ির বাড়িতে আসে এবং তার নির্দেশে সে স্নান করতে যায়। দুখু তার স্বভাব-সিদ্ধ রীতি অনুযায়ী লোভ জয় করে ভালো ভালো গামছা—কাপড় না নিয়ে ছেঁড়া নেতা-গামছা নেয়। এবং স্নান করতে গিয়ে সে তার সততা, নিষ্ঠা ও পরহিতাকাঙ্ক্ষার জন্য পুরস্কার লাভ করে; পক্ষান্তরে পরশ্রীকাতর, ক্ষুদ্রমনা সুখু বিপরীত আচরণের জন্য যথোচিত শাস্তি ভোগ করে।

এই গল্পে এক অঘোষিত নিষেধ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এবং সে 'নিষেধ' উঠে এসেছে ভারতীয় জীবনাদর্শের অন্তঃস্থল থেকে। সে আদর্শে মানুষ অশেষ কৃচ্ছ্রসাধন করে, সে সততা, নিষ্ঠা ও মমতার সঙ্গে অন্যের প্রয়োজনে নিজেকে উৎসর্গ করে অক্লেশে, সে আদর্শে মানুষ যে তার সবটুকু পুণ্যও নির্দ্ধিধায় দান করতে পারে। এই গল্পে দুখু সেই আদর্শের প্রতীক আর সুখু হল ঐ বিরুদ্ধ আদর্শের প্রতীক বা তার মূর্ত নিষেধ।

প্রবল আত্মবিশ্বাস অথবা মানুষের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত বিশ্বাস চরম সর্বনাশের কারণ হতে পারে। এই কারণে প্রাচীন গোষ্ঠী সমাজ এমনকি বর্তমানের আদিবাসী সম্প্রদায় তাদের নিজ গোষ্ঠীর বিভিন্ন ক্রিয়াচার ও বিশ্বাস-সংস্কার সাধারণত নিজেদের মধ্যেই আবদ্ধ রাখতে প্রয়াসী হয়। অন্তর্বিবাহের এটি একটি অন্যতম কারণ, আবার উপর্যুক্ত এ কারণ থেকে বহু বিধিনিষেধের সৃষ্টি হয়েছে।

রূপকথা— উপকথার বিভিন্ন গল্পে দেখা যায় রাক্ষসের প্রাণ সাধারণত ভ্রমর, কোনো পাখি ইত্যাদির মধ্যে নিহিত থাকে। সহানুভূতি ও প্রবল আত্মবিশ্বাসের কারণে রাক্ষস বুড়ি সেই গুপ্ত কথা রাজকুমারীকে ব'লে ফেলে এবং পরিশেষে মৃত্যু বরণ করে। 'সাত মায়ের এক ছেলে' গল্পে বুড়ি বলতে নেই জেনেও শোভমকে সবুজ পাখির কথা বলে দেয়, 'সোনার কাটী রূপার কাটী' গল্পে বুড়ি রাক্ষসী রাজকন্যাকে 'সাতফনী সাপের' কথা কিংবা 'নীলকমল লালকমল' এর গল্পে রাক্ষস বুড়ি ভ্রমরের কথা বলে দেয়। এবং পরিশেষে রাক্ষসরা মৃত্যুবরণ করে।

আবার রিপুর বশবর্তী হয়ে মানুষ অনেক সময় দিনকে রাত অথবা রাতকে

দিনের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলে। এর পরিণাম স্বভাবতঃই শুভ নয়। একবার প্রলোভন মানুষকে গ্রাস করলে, পরম প্রিয়র নিষেধ বাক্য, লোকলজ্জা বা হিতাহিত জ্ঞান লুপ্ত হয়ে যায়, আপনও হয়ে ওঠে পর। মানুষের এই বৃত্তি ও অভিজ্ঞতা লোক সাহিত্যের বিভিন্ন প্রকরণে বাহিত হয়ে আসছে। 'রাক্ষসের গল্পে' গরীব অলস বামুন এই কারণেই ছদ্মবেশী সুন্দরী রাক্ষসীকে শুধুমাত্র তার কথাতেই নিজের স্ত্রী বলে মনে করল, ঐশ্বর্যের ফাঁদে আবদ্ধ হয়ে তার প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী স্ত্রীর নিষেধ বাক্য গ্রাহ্য না করে, রাক্ষসীর পুরীতে গিয়ে রাক্ষসীর জলযোগের সামগ্রীতে পরিণত হল। এমন কি নিজের নির্দোষ স্ত্রীকেও এইভাবে প্রাণ বিসর্জন দিতে বাধ্য করল।

ঈপ্সিত ফললাভ তখনই সম্ভব হয়, যখন মানুষের অন্যান্য ক্ষমতার সঙ্গে ধৈর্য শক্তি ও স্থির মনোবল যথেষ্ট মাত্রায় থাকে। আনন্দের আতিশয্য বা প্রাপ্তির পরিতৃপ্তির অতিরেক মানুষকে অন্ধকার গর্ভে নিক্ষেপ করতে পারে। ব্যবহারিক জীবনে মানুষের এই অভিজ্ঞতা বহু 'নিষেধ' সৃষ্টির কারণ। 'হীরামনের গল্পে' সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার থেকে রাজকন্যাকে নিজরাজ্যে নিয়ে আসার পথে রাজা অধৈর্য হয়ে হীরামনের নিষেধ অগ্রাহ্য করে পক্ষীরাজকে একবারের পরিবর্তে একাধিকবার বেত্রাঘাত করেন, যার পরিণাম মোটেই সুখকর হয় নি।

মানুষের কাছে যা দুর্জ্ঞেয়. যা অজ্ঞাত ও যা অন্ধকারাচ্ছন্ন তা স্বভাবতঃই মানুষেব ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ফলে জীবনের নিরাপত্তাকে নিশ্চিত করতে সেই অজানা বিষয় বা বস্তু সম্পর্কে মানুষ বিভিন্ন প্রকার নিষেধ-বিধান সৃষ্টি করে। ভ্রমবশঃত সেই সব ট্যাবু লঙঘন করে কখনো মানুষ চরম বিপদের সম্মুখীন হয়েছে, কখনো সেই বহস্যের আবরণ উন্মোচিত করে প্রমাণ করেছে সেই অন্ধকার মানুষের কোনোরকম ক্ষতি করার সামর্থ্য রাখে না। লোকসাহিত্যে এই জাতীয় নিষেধ ও নিষেধ লঙ্ঘনের উদাহরণ প্রচুর। যেমন 'নিখুঁত মানুষ' গল্পে জনৈক সাধু প্রদত্ত ঔষধে রাণীর দুইটি যমজ পুত্র হয়। কথা অনুযায়ী সাধু যোল বছর পর একজন (বড়) রাজপুত্রকে নিয়ে বনে চলে যায়। সেখানে রাজপুত্রের কাজ ছিল সাধুর পুজোর ফুল তোলা ও বনে বিচরণ করা। কিন্তু সন্ন্যাসী রাজকুমারকে উত্তর দিকে যেতে নিষেধ করেছিলেন এবং সেদিকে গেলে যে বিপদ হবে তাও জানিয়ে দিয়েছিলেন। তথাপি রাজপুত্র হরিণ শিকার করতে গিয়ে ভ্রমবশত হরিণের পশ্চাদ্ধাবন করে ভয়ঙ্কর বিপদের সম্মুখীন হন।

এবাবে আমরা ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের বাংলা লোকসাহিত্য গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডে ধৃত বিভিন্ন গল্প থেকে লোককথার আরো কিছু ট্যাবুর দৃষ্টান্ত দিতে পারি। যেমন 'সিদ্ধিলাভ' গল্পে দেখা যায় সাধু রাজপুত্রকে উত্তর দিকে যেতে নিষেধ করেছেন। রাজপুত্র এই আদেশ অমান্য করায় বিপদাপন্ন হয়ে পড়েছিল। 'শঙ্খনাথ' গল্পে সন্ন্যাসী শঙ্খনাথকে দক্ষিণ দিকের দরজা খুলতে নিষেধ করেছিল। 'নরঘাতক সন্ন্যাসী' গল্পে সন্ন্যাসী রাজপুত্রকে নির্দেশ দিয়েছে পশ্চিম দিকে তার যাওয়া ব্যতীত অন্যকোন কাজেই নিষেধ নেই। 'কাঞ্চনমালা' গল্পে বউ নিয়ে সওদাগর ফিরলে নলিনী চোখের পরত

খুলতে নিষেধ করেছিল। 'বিধিলিপি'তে বিধাতাপুরুষ শ্বশুরবাড়ী গমনরত ব্রাহ্মণকুমারকে দুই পাত্র দধি দিয়ে বলেছেন সকলে দধি খেতে পারে, কিন্তু কোনক্রমেই জ্যেষ্ঠ শ্যালক যেন না খায়, তাহলে সে বাঁচবে না। ব্রাহ্মণকুমারের জ্যেষ্ঠ শ্যালক তথাপি সেই দধি ভক্ষণ করে এবং মৃত্যুর শিকার হয়। 'খোঁড়া কবুতর' গল্পে রাজা ছোটরাণীর কাছে জানতে চেয়েছিলেন যে দেরী করে পাক সাক করতে গেলেও চোখের নিমেষে তিনি সব শেষ করেন কী ক'রে! উত্তরে রাণী রাজাকে অনুরোধ করেছেন সে রহস্য শুনে তাঁর কাজ নেই। তথাপি রাজা তার আগ্রহাতিশয্য চেপে রাখতে পারেননি। রাণীর নিষেধাজ্ঞা অমান্য ক'রে রহস্য উন্মোচনের প্রয়াস চালিয়েছেন। ফলে ছোটরাণীর মৃত্যু হয়েছে। 'নাগসন্তান' গল্পে দেখা যায় মা মনসা নাগপুরীতে উপস্থিত মানব কন্যাকে বলেছেন, 'খেয়ে দেয়ে বেরিও, তিন দিক দেখো, এক দিক দেখো না। দক্ষিণ দিক দেখোনা।' 'নীলপদ্ম' গল্পে বর্ণিত হয়েছে সন্তান হীনা ছোটরাণী এক সন্ন্যাসীর আনুকূল্যে পুত্র সন্তান লাভ করেছে। সন্ন্যাসী বলেছে, আমি ঔষধ দিতে পারি, রাজার পুত্র লাভ হইবে, কিন্তু রাজা পুত্রমুখ দর্শন করিতে পারিবে না। যে দিন রাজা ছেলের মুখ দেখিবেন, সেইদিনই তিনি অন্ধ হইয়া যাইবেন'। ছোটরাণী সন্ন্যাসীর সাবধানবাণী শুনে পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়েই নবজাতককে নিয়ে রাজ্য ত্যাগ করেছেন। তবু ঘটনাচক্রে রাজা ছোট রাণীর সন্তানকে পরবর্তীকালে দেখে ফেলেছেন এবং সন্ন্যাসীর কথামত অন্ধ হয়ে গেছেন। 'প্রাণ সঞ্চারিণী' গল্পে রাজকুমারীর পিতা আশ্রয় গ্রহণকারী যুবরাজকে একটি মন্ত্র শিখিয়ে দিয়েছেন, আর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন, 'এ মন্ত্র কাহারও কাছে প্রকাশ করিও না।' 'কাজলরেখা' গল্পে সন্ন্যাসী কাজলরেখাকে পরামর্শ দিয়েছে সে যেন তার মৃত স্বামীর চোখের সূঁচ না খুলে নেয়। আরো বলেছে স্বামীর কাছে নিজ পরিচয় দিলে সে বিধবা হবে। 'দুঃখমোচন' গল্পে ক্ষেত্রপাল দুইখ্যাকে সাবধান করে দেন এই বলে, তার মা যেন কোন দিন ক্ষেত না দেখে। দেখলে কিন্তু নাড়া ক্ষেতে আর ছড়া দেখবে না। দুইখ্যার মা এই নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করায় দুইখ্যা ধান কাটতে গিয়ে দেখলে শুধু 'নাড়া শুকাইয়া, দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, আজ আর ছড়া নাই।' ইত্যাদি।

শুধু আমাদের লোককথাতেই নয় সারা বিশ্বের লোককাহিনীতেও অনুরূপ ট্যাবুর সন্ধান মিলবে। স্টিথ থম্পসনের 'মোটিফ ইনডেক্স' এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য হ'তে পারে। তবে আমাদের লোককথাগুলিতে সচরাচর যে সমস্ত ট্যাবুর সাক্ষাৎ মেলে জনৈক সমালোচক তার একটি তালিকা করেছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিষেধ নিম্নরূপ :

ক। ভূত প্রেতের নাম ডাকলে ক্ষতি হয়, কাজেই ভূত প্রেতের নাম ডাকা নিষেধ।
খ। পবিত্র বৃক্ষ কাটলে সমূহ সর্বনাশ, তাই এমন বৃক্ষ কাটা নিষেধ।
গ। দেবতাদের ক্রুদ্ধ করা নিষেধ
ঘ। ভিন্ন গোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ
ঙ। বিভিন্ন বা বিশিষ্ট ফল ভক্ষণে নিষেধ জারি করা হয়

চ। সন্তানহীন রাজাকে দর্শন করায় নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়
ছ। নিষিদ্ধ পথে হাঁটা নিষেধ
জ। গোপন তত্ত্ব বলা নিষেধ
ঝ। বিশেষ বিশেষ দিক বা নিষিদ্ধ দিকে তাকানো নিষেধ
ঞ। পিছন ফিরে তাকানো নিষেধ
ট। কখনো কখনো বারো বা চোদ্দ বছরের আগে সন্তানের মুখ দর্শনে নিষেধাজ্ঞা
ঠ। নিষিদ্ধ বস্তু বা বিশেষ বস্তুকে স্পর্শ করা নিষেধ

ময়মনসিংহ গীতিকার বিভিন্ন পালায় বহুবিধ 'নিষেধ' লক্ষ্য করার মত। 'মলুয়া' পালায় হীরাধর কন্যা মলুয়ার বিবাহ দেবার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছে। কিন্তু সব মাসে বিবাহ দেওয়া যায় না; শ্রাবণ, ভাদ্র বা পৌষ মাসে হিন্দুদের বিবাহের মত মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান হয় না। আলোচ্য পালায় এই প্রচলিত নিষেধের কথা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলা হয়েছে:

'শায়ন মাসে বিয়া দিতে দেশের মানা আছে।
এই মাসে বিয়া দিয়া বেউলা রাঢ়ি হইছে।।
ভাদ্রমাসে শাস্ত্র মতে দেব কার্য্য মানা।
এই মাসে না হইল বিয়া কেবল আনাগুনা।।'

কিংবা—

'পৌষ মাসে পোষা আন্ধি দেশাচারে দোষ।
এই মাস গেলে হইব বিয়ার সন্তোষ।।'

—শ্রাবণ মাসে বেহুলার বিবাহ হয়েছিল ও বৈধব্য বরণ করতেও হয়েছিল। হিন্দু সংস্কার অনুযায়ী শ্রাবণ মাসে বিবাহ নিষিদ্ধ। এই নিষেধটির কারণ স্পষ্ট হলেও ভাদ্র ও পৌষ মাসে বিবাহ নিষিদ্ধ কেন তা বলা হয় নি। নিষেধই এখানে বড় কথা—লোকগোষ্ঠীর কারণ অনুসন্ধানের প্রয়োজন নেই।

এই পালাতেই কবি বিবাহ সংক্রান্ত আর একটি নিষেধের কথা বলেছেন:

'কালরাতে কালক্ষয় যাত্রা করতে মানা।
এই দিনে জামাই বউয়ে নাহি দেখাশুনা।।'

— বলাবাহুল্য বেহুলা সংক্রান্ত মিথটিই এই নিষেধ বিধানের উৎস; এখনো হিন্দুরা এই নিষেধ মেনে চলেন।

অতঃপর মলুয়ার রূপে লুব্ধ দেওয়ান তাকে নিজ গৃহে নিজ অধিকারের মধ্যে পেয়েও স্পর্শ করতে সক্ষম হয়নি। মলুয়া দেওয়ানকে বলেছে:

'বার মাসের বর্ত্ত মোর নয় মাস গেছে।
পরর্ত্তিষ্টা করিতে আর তিন মাস আছে।।
শুন শুন দেওয়ান সাব কহি যে তোমারে।

পরতিজ্ঞা করহ তুমি আমার গোচরে।।
না খাইব উচ্ছিষ্ট অন্ন না ছুইব পানি।
এক জ্বালে খাইব অন্ন আলু ও আলুনি।।
পালঙ্কে শুইতে মোর দেবের আছে মানা।
জমিনে শুইব আমি আঁচল বিছানা।।
পরাচিত্ত করি আমি ব্রত না ভাঙ্গিব।
পর পুরুষের মুখ কভু না দেখিব।।'

—অর্থাৎ ব্রত প্রতিষ্ঠার জন্য মলুয়া আরো তিনমাস সময় পেয়েছে। স্বপাক আহার, মাটিতে শয়ন করা, পরপুরুষের মুখ না দেখা— ইত্যাদি দাবিগুলি মুসলমান দেওয়ানকে ধর্মীয় নিষেধ বিধানের জন্যই মেনে নিতে হয়েছে।

মলুয়া 'সতীনারী' হ'লেও মুসলমানের গৃহে কাল যাপনের জন্য সমাজ তাকে জাতিচ্যুত করেছে। এমনকি বিনোদও পরিত্রাণ পায়নি। বিনোদের কুলীন মামা জানিয়েছে—

'ভাইগনা বউয়ের হাতের ভাত খাইতে নাহি পারি।
জাতিতে উঠুক বিনোদ পরাচিত্তি করি।'

শেষ পর্যন্ত 'ব্রাহ্মণের পাতি দিয়ে পরাচিত্ত' ক'রেও সামাজিক নিষেধকে বিনোদ অমান্য করতে পারেনি— সতী-সাধ্বী স্ত্রী মলুয়াকে ত্যাগ করেছে! আজকের যুগে, আমাদের চোখে এই দোষে বিনোদ মানবধর্ম ও তাব প্রেমকে লঙ্ঘন করেছে তা স্বীকার করতেই হয়, কিন্তু যে সমাজ ও লোকগোষ্ঠীতে বিনোদ-মলুয়ার জীবন-যাপন— সেখানে ধর্মীয় হোক, শাস্ত্রীয় হোক, বা সংস্কারগতই হোক; নিষেধ অমান্য করার সাহস ও শক্তি মানুষের ছিল না এবং এই বিষয়টি মনে রেখে বিচার করলে বিনোদকে হয়ত ততটা অভিসম্পাৎ করা যাবে না।

মোটের উপর নিষেধ অলঙঘনীয়। ময়মনসিং গীতিকায় লোকজীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত এমন বহু নিষেধ বিধানের উল্লেখ আছে। আমরা আর একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে আলোচনায় ইতি টানব।

'কাজলরেখা' পালায় ভাগ্যচক্রে শেষপর্যন্ত মৃত সূচরাজপুত্রের সঙ্গে কাজলরেখার বিবাহ হয়েছে। কিন্তু সন্ন্যাসীর নিষেধ ছিল ধর্মমতী শুক সত্য প্রকাশ না করা পর্যন্ত কাজলরেখা যেন স্বামীর কাছে নিজ পরিচয় না দেয়। পরিচয় দিলে সমূহ সর্বনাশ। কাজলরেখাকে এই নিষেধ বহু যন্ত্রণা স্বীকার করেও মান্য করতে হয়েছে।

সাধুরত্নেশ্বর ভ্রমবশত কাজলরেখাকে বিবাহ করতে চাইলে, পরিচয় "না জানিয়া বিয়া করতে শাস্ত্রে আছে মানা।"— এই নিষেধ সে যাত্রায় তাকে বাঁচিয়ে দেয়।

প্রবাদে নিষেধাজ্ঞা

প্রবাদ ব্যক্তি জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার তাৎপর্যপূর্ণ, সরস অভিব্যক্তি এবং অধিকাংশ

ক্ষেত্রে এর প্রকাশ তির্যক। ছড়ার ক্ষেত্রেও সংক্ষিপ্ত এই বাক্য বা বাক্যাংশের মধ্যে বহু কালের বহু অভিজ্ঞতা বাহিত হয়। তা মহৎ দার্শনিকের অভিজ্ঞতা বা বিজ্ঞানের ধ্রুব সত্য না হলেও সমাজ জীবনের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সুপ্রযুক্ত। তাই প্রবাদ সমাজ স্বীকৃত ও প্রবলভাবে সমাজ সমর্থিত। 'ইহা ভাবের কথা নয়, আদর্শের কথা নয়, একান্ত ঘরের কথা। সাংসারিক ঘটনা, প্রত্যক্ষ অনুভূতিব অকৃত্রিম প্রকাশ' (ড. সুশীল কুমার দে; 'বাংলার প্রবাদ')।

প্রবাদ সম্পর্কে ইংরিজিতে একটা প্রবাদ আছে : As the country, so the proverb। সমাজভেদে প্রবাদের এই ভিন্নতা প্রমাণ করে প্রবাদের তীব্র স্পর্শকাতরতা। ভিন্ন ভিন্ন লোকসমাজের যে বিভিন্ন আপেক্ষিক পার্থক্য, সাধারণত তা তীব্রভাবে লোকসাহিত্যের অন্যান্য প্রকরণে ধরা পড়ে না। কিন্তু প্রবাদ সমাজের খুঁটিনাটি বৈশিষ্ট্য এমনকি একান্তভাবে মেয়েলি বা রান্নাঘরের কথাকেও উপেক্ষা করে না। ফলে প্রবাদের মধ্যে বিভিন্ন সমাজের নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য প্রকটভাবে প্রতিফলিত হয়। সুতরাং বাংলা প্রবাদে যেমন বিপুল পরিমাণে সাধারণ নৃতাত্ত্বিক উপাদান পাওয়া যাবে, তেমনই অনেক সময়েই তা বাংলাদেশের বিশিষ্ট নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যকেও আলাদাভাবে তুলে ধরবে।

বাংলা প্রবাদের মধ্যে কৃষি ও জ্যোতিষশাস্ত্র বিষয়ক কিছু বচন স্থান লাভ করেছে--- যা যথাক্রমে খনার বচন ও ডাকের বচন নামে পরিচিত। প্রবাদের সার্বিক বৈশিষ্ট্য এগুলিতে অধিকাংশ সময়েই অনুপস্থিত। সেই কারণে লোকসাহিত্যের কোনো কোনো গবেষক ডাক ও খনাব বচনকে প্রবাদের অন্তর্ভুক্ত করার সমীচীনতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেন। তবে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও প্রচলিত ধারার কথা ভাবলে বাংলা লোকসাহিত্যের এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বচনগুলিকে প্রবাদেব আলোচনায স্থান দেওয়া যেতে পারে।

বাংলাদেশে প্রচলিত খনার বচনগুলি মুখ্যত আবহাওয়া ও কৃষি বিষয়ক। খনা,— জনশ্রুতি-কিংবদন্তীর নায়িকা। বিখ্যাত জ্যোতিষী বরাহপুত্র মিহিরের পত্নী। লোকবিশ্বাস এই যে খনার বচনগুলি ঐ মহিলাবই সৃষ্টি। কিন্তু পণ্ডিতদের ধারণা শুভক্ষণে জন্ম যে বচনের তাই-ই খনার বচন। কেননা— ক্ষণ>খন এবং তা থেকে 'খনা' শব্দের উৎপত্তি। অর্থাৎ কোন ক্ষণ বা সময়ে কি পালনীয় তা খনার বচনের দ্বারাই অনুসৃত হবে। সুতরাং খনার বচনগুলি নিঃসন্দেহে লোকসমাজের উত্তরাধিকার সূত্রে লব্ধ ব্যবহারিক জীবনের অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতি।

ডাকের বচন হল জ্ঞানের বচন বা প্রাজ্ঞ বচন। 'ডাক' শব্দের অর্থ মন্ত্রসিদ্ধ গুণী, বিজ্ঞ বা অভিজ্ঞ ব্যক্তি। এগুলি প্রধানত ব্যবহারিক জ্যোতিষশাস্ত্র বিষয়ক বা নীতিমূলক। আবার কখনো কখনো চরিত্রনীতি বিষয়ক বচন বললেও অত্যুক্তি হয় না। বিভিন্ন সামাজিক সংস্কার এই বচনগুলির মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। আবার কখনো কখনো স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন 'বচন'ও এর অন্তর্ভুক্ত।

ডাক ও খনার বচনে লোকবিজ্ঞান সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত। দীর্ঘকাল ধরে

লোকায়ত মানুষের জীবনের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এগুলি প্রযুক্ত হয়। তাই এগুলো প্রবাদপ্রতিম এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রবাদের মূল লক্ষ্য যা এগুলিরও তাই। সুতরাং আমরা প্রবাদের সঙ্গেই ডাক ও খনার বচনের নৃতাত্ত্বিক উপাদান নির্ণয়ের চেষ্টা করব।

ডাকের বচন, খনার বচন ও বাংলা প্রবাদে কখনো প্রত্যক্ষভাবে, কখনো পরোক্ষভাবে বিভিন্ন প্রকার নিষেধ আরোপিত হয়েছে। নিম্নে দৃষ্টান্ত সহ আলোচিত হল :

১। 'ছাগলের কান নাড়া, গরুর কাশ
বিড়ালের হাঁচি করে সর্বনাশ।' (ডাক)

যাত্রাকালে ছাগলের কান নাড়া, গরুর কাশি বা বিড়ালের হাঁচি দেখলে বা শুনলে তা মঙ্গলদায়ক হয় না। অর্থাৎ যাত্রা করতে নিষেধ করা হচ্ছে।

২। 'পূর্ণিমায়-অমায় যে ধরে হাল। তার দুঃখ সর্বকাল।
তার বলদে হয় বাত। ঘরে তার না থাকে ভাত।।
খনা বলে— আমার বাণী। যে চষে তার হবে হানি।

কৃষককে পূর্ণিমায় হলকর্ষণ করতে নিষেধ করা হচ্ছে। কারণ হিন্দু ধর্মে পূর্ণিমা-অমাবশ্যার বিশেষ গুরুত্ব। ভারতবর্ষে সৌর মাস গণনার সঙ্গে চান্দ্র মাস বা বৎসর গণনারও ব্যাপক প্রচলন ছিল।

এইভাবে বাংলা লোকসাহিত্যের কোনো কোনো শাখায় ট্যাবু অনেকটা স্থান দখল ক'রে আছে। এই সমস্ত 'নিষেধে'র উৎস মূলত মানুষের যাদুভিত্তিক ধ্যান-ধারণা বা বিশ্বাস-অবিশ্বাস ঠিক কথা, কিন্তু মানুষের নৈতিক মূল্যবোধ ও সমাজ প্রতিবেশের বিশিষ্ট প্রভাবও যে কোথাও কোথাও পড়েনি, তা বলা যায় না। আবার, লোকসমাজে উদ্ভুত বিজ্ঞান-নির্ভর দুর্লভ কিছু বিধি-নিষেধও নিছক ট্যাবু হয়ে উঠেছে— ডাক ও খনার কিছু কিছু বচন তার দৃষ্টান্ত। কারণ বৃহত্তর লোকসমাজ নিষেধের কারণ নিয়ে প্রশ্ন তোলে না— যা করতে নেই তা করলে অমঙ্গল অনিবার্য— এই বিশ্বাসই তাদের কাছে শেষ কথা; অর্থাৎ সেটি তাদের কাছে 'ট্যাবু'।

তৃতীয় অধ্যায়

ধর্ম ও লোকধর্ম

নৃতাত্ত্বিকরা দেখিয়েছেন মানুষের ধর্ম বিশ্বাস গড়ে উঠেছে— রহস্যময় প্রাকৃতিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ ও বশীভূত করার ঐকান্তিক অভীপ্সা থেকে। সর্বপ্রাণবাদ, সর্বাত্মবাদ, মানাবাদ, টোটেমবাদ— ইত্যাদি বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক তত্ত্বে তার যৌক্তিক ব্যাখ্যা-পর্যালোচনা আছে যার মধ্যে কয়েকটি বিষয় আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। এখন আমাদের আলোচ্য বিষয় বাংলার লোকধর্ম ও তার উন্মেষ, কেননা অন্যান্য ক্ষেত্রের মতই লোকসাহিত্যে তার ব্যাপক প্রতিফলন লক্ষ্য করার মত।

'ধর্ম' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে 'ধৃ' ধাতুর সঙ্গে 'ম' প্রত্যয় যোগে। সুতরাং ব্যুৎপত্তিগত অর্থে ধর্ম হল— 'যা ধারণ করে'। অর্থাৎ মানুষের জীবনযাত্রা, কৃষ্টি-সংস্কৃতি সবকিছুই ধর্মের অন্তর্ভুক্ত, মানুষ ধারণ করে সভ্যতা-সংস্কৃতিকে, আবার সভ্যতা সংস্কৃতি ধারণ করে মানুষকে। সভ্যতা-সংস্কৃতি বলতে বোঝায় মানুষের বৈশিষ্ট্যমূলক সমাজ-জীবনাচরণের সামগ্রিক রূপ ও পদ্ধতি। সুতরাং সেই পদ্ধতি হল ধর্ম। নৃতাত্ত্বিক ডুরখাইম তাঁর সোস্যাল থিওরীতে ধর্ম বলতে তাই অনিবার্যভাবেই 'সংস্কৃতি'কে বুঝিয়েছেন। যেমন ভারতবর্ষের সংস্কৃতি হিন্দু সংস্কৃতি বা হিন্দু সভ্যতা।

তবু 'ধর্ম' বলতে সাধারণভাবে আমরা একদল মানুষের অধ্যাত্ম-উপাসনার পদ্ধতিকে বুঝি। এই সংকীর্ণ অর্থে ধর্ম ইংরেজি 'রিলিজিয়ান' (religion)-এর সমার্থক। যেমন হিন্দু ও মুসলমান ইত্যাদি বললে বোঝায় মানুষের দু'টি ধর্মীয় শ্রেণীকে যাদের বিশিষ্ট দু'টি পূজা-উপাসনা পদ্ধতি বিদ্যমান। আবার যদি বলা হয় (হিন্দুদের মধ্যে) শৈব ধর্ম— তবে অনিবার্যভাবেই তা হিন্দু ধর্মের অন্তর্গত একটা বিশিষ্ট ধর্ম বিশ্বাস বা উপাসনা রীতিকে (cult) বোঝায়।

সনাতন ধর্ম ও লৌকিক ধর্মের (folk religion/cult) মধ্যে স্পষ্টতঃই পার্থক্য বর্তমান। সনাতন ধর্ম বা শাস্ত্রীয় ধর্মের ক্ষেত্রে কতকগুলি অনড় রীতি-নীতি থাকে যা বিশেষ সচেতনতার সঙ্গে পালিত হয়। সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি হয়ে একজন বা কয়েকজন হোতা বা পুরোহিত এখানে নিয়মনিষ্ঠভাবে পূজা-অর্চনা করেন। মন্ত্রোচ্চারণ ধ্যান ও কিছু জটিল ক্রিয়াচার শাস্ত্রীয় ধর্মের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী। আবার সেই সঙ্গে থাকে তার গভীর তাৎপর্যপূর্ণ দার্শনিক ব্যাখ্যা ও ধ্যান-ধারণা। বস্তুত শাস্ত্রীয় ধর্ম প্রজ্ঞাসম্পন্ন মানুষের তৈরী। রাজা মহারাজা পুরোহিত শ্রেণী প্রত্যক্ষভাবে শাস্ত্রীয় ধর্ম প্রচার ও ঈশ্বরের সেবা বা পূজা-অর্চনা করার অধিকার নিজেদের কুক্ষিগত ক'রে রাখলেও জনসাধারণকে ঐ ধর্মের প্রতি বিশ্বাস ও ভক্তি রাখতে এক প্রকার বাধ্য করেছিল। শাস্ত্রীয় ধর্মবিরোধী কোনো আচরণ করলে সাধারণকে তাই শাস্তি পেতে হয় বা

প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। শাস্ত্রীয় ধর্মোপাসনার ক্ষেত্রে কখনো কখনো দেবদেবীর মূর্তি কল্পনা করে পুজো করা হয়— যেমন হিন্দু ধর্মে, আবার তা নাও হতে পারে, যেমন ইসলাম ধর্ম।

পক্ষান্তরে সামাজিক মঙ্গল অমঙ্গল চিন্তা থেকে লোকসমাজে শাস্ত্র নিরপেক্ষ যে ধর্ম বিশ্বাস গড়ে ওঠে— তাই-ই লৌকিক ধর্ম। পুরুষানুক্রমে এই ধর্মবিশ্বাস চলে আসে। এই বিশ্বাসের মধ্যেই জন্ম নেয় বিভিন্ন দেব-দেবী। তাই তারা লৌকিক দেবতা। শ্রদ্ধা-ভক্তি-ভয় এবং মানুষের বিভিন্ন কামনা-বাসনা এই সব বিশ্বাস-সংস্কারও দেবতাদের গ'ড়ে তোলে, আর প্রত্যক্ষভাবে লোকসমাজ সেই সব দেবদেবীকে পুজো করে বা বিনম্র ভক্তি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। এখানেও বিভিন্ন ক্রিয়াচার আছে, কিন্তু শাস্ত্রীয় ক্রিয়াচারের মত তা অপরিবর্তনীয় নয় এবং বেশির ভাগই তা পুরুষানুক্রমে মানুষের মনে গাঁথা থাকে। এই বিভিন্ন ক্রিয়াচারের উৎস কখনো হয়ত আর্যীকরণের ফল, কিন্তু মুখ্যত যাদু বিশ্বাসই লৌকিক দেব-দেবতা পূজা পদ্ধতি ও আচার অনুষ্ঠানের উৎস। লৌকিক ধর্ম বিশ্বাসের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল, মানুষের (লোকসমাজে) প্রত্যক্ষ প্রয়োজনেব সঙ্গে লৌকিক ধর্মবিশ্বাস ও লোকদেবতার গভীর সম্বন্ধ থাকায়, নতুন নতুন বিশ্বাস (cult) ও দেব-দেবতার সৃষ্টি হয়, আবার কালের গর্ভে বহু বিশ্বাস, সংস্কার ও দেব-দেবতা বিলীন হয়ে যায়— যা শাস্ত্রীয় ধর্ম বিশ্বাস (cult) ও শাস্ত্রীয় দেবতার ক্ষেত্রে দুর্লক্ষ্য। এছাড়া একটু অভিনিবেশ সহকারে লৌকিক দেব-দেবীর পূজা পদ্ধতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শাস্ত্রীয় দেবতার পূজা পদ্ধতির মতই এখানেও 'মন্ত্র' বিদ্যমান; কিন্তু পার্থক্য হল. এখানে মন্ত্রের মধ্যে কোনো রকম দার্শনিক ব্যাখ্যা নেই, লোক সমাজের কতকগুলি বিশেষ কামনা বাসনা কথ্য ভাষায় বা স্থানিক উপভাষায় ছড়ার আকারে বিবৃত হয়। আবার সাধারণ মানুষের মধ্যে সেই দেবতার প্রচার ও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি জাগিয়ে তোলার জন্যে, বিভিন্ন রূপকথা-ধর্মী গাল-গল্পের (তাও ছড়ার আকারে বদ্ধ) মধ্যে ঐ দেবতার শক্তি ও ক্ষমতা জাহির করা হয়। বিভিন্ন ব্রতকথা বা মঙ্গল কাব্যগুলি তার দৃষ্টান্ত। এছাড়া আরও একটি বিষয় উল্লেখ্য, তা হল লৌকিক পূজাচারে সাধারণত নারীর ভূমিকা থাকে অনেক বেশি— যা শাস্ত্রীয় পূজাচারের বিপ্রতীপ।

এবারে বাংলাদেশের লোকধর্ম বা বিভিন্ন লৌকিক দেব-দেবীর উৎস সংক্রান্ত মূল বিষয়গুলি আমাদের আলোচ্য হবে, কেননা ঐ প্রেক্ষাপটের নিরিখে আমরা সহজেই অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছতে পারি।

ভারতীয় সংস্কৃতি যেহেতু মুখ্যত হিন্দু সভ্যতা কেন্দ্রিক, তাই বাংলা দেশের লৌকিক ধর্মাচরণে হিন্দু ঐতিহ্যই বাহিত হয়ে আসছে। তাই এদেশের মুসলমান বা উপজাতি-সংস্কৃতিও তার পৃথক অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারেনি— হিন্দু ঐতিহ্যেই পরিপ্লুত হয়ে আছে। আবার হিন্দু ঐতিহ্য বলতে কোনো মৌলিক প্রাচীন সংস্কৃতি বোঝায় না, কারণ হিন্দু সংস্কৃতি হল এক মিশ্র সংস্কৃতি। এই মিশ্রণ হয়েছে বহিরাগত

আর্য ও ভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের সংস্কৃতির সঙ্গে দেশীয় দ্রাবিড় গোষ্ঠীর মানুষের সংস্কৃতির মিলনে। ভারতবর্ষে আর্য আগমন আনুমানিক ২০০০ থেকে ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে বলেই ঐতিহাসিকদের অনুমান। দুটি আর্য-গোষ্ঠী (অর্থাৎ যারা আর্যভাষায় কথা বলে) নর্ডিক ও আল্‌পীয় গোষ্ঠী ভারতে এসেছিল। দীর্ঘকায়, গৌরবর্ণ, উন্নত নাসা বর্বর পশুপালক প্রকৃতি উপাসক নর্ডিক আর্যরাই 'বৈদিক আর্য' (এরাই ঋক্‌বেদের রচয়িতা), যাদের সঙ্গে উন্নত ভারতীয় দ্রাবিড় বা অনার্য সভ্যতার সংঘর্ষ ঘটে— দিনেব পর দিন ধরে। কিন্তু তাদের কৃষি কার্য জানা ছিল না, অভাব ছিল নারীর। ঋক্ বেদের বহু স্তোত্রে তারা তাই বারংবার বলেছে 'শত্রুরা যার রথযুক্ত অশ্বদ্বয়ের সম্মুখীন হতে পারে না, সেই ইন্দ্র! আমাদের ধন প্রদান করুন, স্ত্রী প্রদান করুন, অন্ন নিয়ে আমাদের নিকট আগমন করুন' (১। ৫। ৩।)। ফলে তারা অনার্য রমণী বিয়ে করতে বাধ্য হ'ল এবং পশ্চিম থেকে যত পূর্ব দিকে এগিয়ে যেতে লাগল— বিশেষত কুরু পাঞ্চাল দেশে (গঙ্গা যমুনার মধ্যবর্তী দোয়াব অঞ্চল) আর্য-অনার্য সংশ্লেষণ (diffusion) গভীর হয়ে উঠল। এইভাবে আর্যরা ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে আপোষ করে নিল।[১] ক্রমে তা বিবর্তিত হতে লাগল। এবং নৃতাত্ত্বিকের ভাষায়, "এটা বিবর্তনের ক্রমিক ধারাবাহিকতার ভিতর দিয়ে সম্পূর্ণতা লাভ করেছিল পৌরাণিক যুগে। এই সংশ্লেষণের পর আমরা ভারতীয় সভ্যতার সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ দেখি, যেটা বৈদিক সভ্যতা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এবং যে সভ্যতা পরবর্তীকালে 'হিন্দু সভ্যতা' নামে পরিচিতি লাভ করেছিল। বিবর্তনের পরে লোকে আর ইন্দ্র-বরুণ প্রভৃতি বৈদিক দেবতাব স্তুতি করে না। বৈদিক যজ্ঞও সম্পাদন করে না। নূতন দেবতা মণ্ডলীর পত্তন ঘটে। যজ্ঞের পরিবর্তে আসে পূজা ও উপাসনা। বৈদিক আত্মকেন্দ্রিক স্তুতিগানের পরিবর্তে আসে ভক্তি। এর ওপর প্রাগার্য তান্ত্রিক ধর্মেরও প্রভাব পড়ে।"[২]

"...যদিও বৈদিক আর্যগণের সঙ্গে বেশ কিছুকাল তাদের (অনার্যদের) দ্বন্দ্ব, সংঘাত চলেছিল, পরিণতিতে কিন্তু অনার্য সংস্কৃতিরই জয় হয়েছিল। জাতি ভেদ, গোত্র বিভাগ বিবাহে লৌকিক আচার অনুসরণ, যজ্ঞের পরিবর্তে পূজার প্রবর্তন, দেবতার জন্য মন্দির নির্মাণ ও নানারূপ শৈল্পিক রীতনীতি, এ সবই অনার্য সমাজের দান। আজ এই বিংশ শতাব্দীর যান্ত্রিক সভ্যতার যুগেও আমরা প্রাগার্য সমাজের অবদান সমূহের ক্রমিকতা লক্ষ্য করি। বিবাহে লৌকিক আচারের অনুসরণ, আপদ-বিপদে অভিচারিক ক্রিয়াকলাপাদির আশ্রয় গ্রহণ, পরিবহনের জন্য গোশকটের ব্যবহার, জ্বালানীর জন্য গোময় পিষ্টিকার প্রস্তুত ইত্যাদি সেই ক্রমিকতারই সজীব দৃষ্টান্ত। হিন্দু সভ্যতার নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করলে হাজার হাজার এরকম নিদর্শন পাওয়া যাবে। লোকে এখন আর বৈদিক প্রথা অনুযায়ী সূর্যের উপাসনা করে না। বিহারের লোকেরা সেই প্রাগার্য যুগের 'ছট' পূজাই করে। বাঙলার মেয়েরা ইতু পূজাই করে। বসন্ত রোগাক্রান্ত হলে, শীতলার ওপরই নির্ভর করে। ওলাউঠা হলেই ওলাইচণ্ডীর স্থানে পূজা করে। অনুর্বরা সধবারা গাছে ঢিল বেঁধে সন্তান কামনা করে। এ সবের সঙ্গে বৈদিক আর্য ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই।"

"মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস, মৃতব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা, বিবিধ ঐন্দ্রজালিক

প্রক্রিয়া ও মন্ত্রাদি, প্রকৃতির সৃজন শক্তিকে মাতৃরূপে পূজা, শিব ও লিঙ্গ পূজা, কুমারি পূজা, অশ্বত্থ ও বটবৃক্ষ পূজা, সর্প পূজা, টোটেমের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা, দেবদেবীর বাহনের কল্পনা, জন্তু পূজা, গ্রাম, নদী, বৃক্ষ, অরণ্য, পর্বত ও ভূমির মধ্যে নিহিত শক্তির পূজা, মানুষের ব্যাধি ও দুর্ঘটনা সমূহ দুষ্ট শক্তি বা ভূতপ্রেত দ্বারা সংঘটিত হয় বলে বিশ্বাস, বিবিধ নিষেধ জ্ঞাপক অনুশাসন, জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতিতে লোকাচার, নবপত্রিকার পূজা, শবরোৎসব, নবান্ন, পৌষপার্বণ, হোলি, ঘেঁটু পূজা, চড়ক, গাজন, মনসা, শীতলা, কালী, করালী, ছিন্নমস্তা, পর্ণশবরী, প্রভৃতির পূজা, দেবতার জন্য মন্দির নির্মাণ চিত্রাঙ্কন ও লিখন-প্রণালী, দশাবতারবাদ প্রভৃতি আমাদের প্রাগার্যদের কাছ থেকেই নেওয়া।"[৩]

সুতরাং বোঝা যায় যে, আর্য বা বৈদিক সংস্কৃতি দেশজ লোক ধর্ম বা লোক দেবতাদের সম্পূর্ণ রূপে গ্রাস করতে পারেনি —আবহমান কাল ধরে এই সব লোক দেবতা তাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছে সেই সঙ্গে বজায় আছে তৎসংক্রান্ত লৌকিক আচার ও বিশ্বাস-সংস্কার। দ্বিতীয়ত, কখনো কখনো কিছু লৌকিক ধর্মাচার ও লৌকিক দেবতার আর্যীকরণ ঘটেছে।[৪] যেমন মূর্তি পূজা, বৃক্ষ পূজা, লিঙ্গ-যোনি পূজা, সূর্য পূজা ও তার চক্র, স্বস্তিকা চিহ্ন, দশাবতার (যা টোটেম পূজারই বিবর্তিত রূপ) পূজা, শিব, দুর্গা, কালী ইত্যাদি, তাছাড়া যাবতীয় স্ত্রী দেবতার পূজা বা মাতৃদেবীর পূজা,[৫] নাগপূজা, এমন কি দেবদেবীর বাহনগুলিরও অনার্য নিম্নকোটি সমাজের কুল প্রতীক বা টোটেম ছাড়া অন্য কিছু নয়।[৬] অতএব আমাদের মনে রাখতে হবে বাংলাদেশে হিন্দু ধর্মের অন্তর্গত বিবিধ দেবদেবী আসলে লৌকিক দেবদেবী। কিন্তু তাদের গায়ে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ঘ্রাণ— তাই আমাদের পরবর্তী আলোচনার মধ্যে তুলনামূলকভাবে বাংলার খাঁটি লোকায়ত দেবদেবীই থাকবেন— যেমন বিভিন্ন ব্রত, শীতলা, অশ্বত্থ বৃক্ষ পূজা ইত্যাদি। মনসা শিবের মত দেব দেবীরাও আলোচনার বহির্ভূত নয়, কেননা ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির দ্বারা তাঁরা জাতে উঠলেও এখনও বাংলার নিভৃত বুকে স্পষ্টতঃই লোকায়ত ঐতিহ্য নিয়ে তাঁদের বসবাস, বস্তুত এমন কোনো কোনো দেব-দেবী তাই দ্বৈত-সত্তায় বিরাজমান।

বাংলা লোকসাহিত্যর একটা বড় অংশ এই লৌকিক ধর্মকে আশ্রয় করেই গড়ে উঠেছে এবং এখনো পরিস্ফুট হয়ে চলেছে। বাংলা লোকসহিত্যের ভিন্ন ভিন্ন শাখায় লোকধর্ম এবং ধর্ম প্রসঙ্গের প্রতিফলন লক্ষণীয়। মূলত দুটি দিক থেকে আমরা বাংলা লোকসাহিত্যে ধর্ম ও ধর্ম অনুষঙ্গগুলি অন্বেষণ করতে পারি:

১। প্রত্যক্ষভাবে লোক-ধর্মকে উপজীব্য করে রচিত বাংলা লোকসাহিত্য থেকে এবং—

২। লোক ধর্ম নিরপেক্ষ বাংলা লোকসাহিত্য থেকে।

১। প্রত্যক্ষভাবে লোক ধর্মাশ্রিত বাংলা লোকসাহিত্য বলতে বোঝানো হচ্ছে লোকসাহিত্যের সেইসব বিভিন্ন শাখা বা তার অন্তর্গত বিভিন্ন অংশ, যা বিভিন্ন লোকধর্ম মূলক অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হয়; যার অস্তিত্ব লোক-ধর্মের অস্তিত্বের উপর

নির্ভরশীল এবং যা লোকধর্মের সঙ্গেই ওতপ্রোতভাবে যুক্ত— এমন সাহিত্য।

প্রথমে লোকসঙ্গীতের কথাই ধরা যাক। বিচিত্র বিষয়কে উপজীব্য করে রচিত লোকসঙ্গীতের মধ্যে বেশ কিছু গান ধর্মাশ্রিত। এই সমস্ত গান যেসব দেব-দেবী বা অনুষ্ঠানকে উপজীব্য করে রচিত, আমরা প্রয়োজনে এমন কতিপয় দেব-দেবী বা অনুষ্ঠানের নৃতাত্ত্বিক তাৎপর্যও প্রসঙ্গত বিশ্লেষণ করব। যেমন—

ক) পার্বণসঙ্গীত (Calendric song)

বিশেষ তিথি দিন বা সময়ে বাংলাদেশব্যাপী যে সার্বিক পুজো অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়, এবং সেই সব পুজো অনুষ্ঠানে সাধারণভাবে যে সব লোকগান গীত হয়, সেই গানগুলিকেই পার্বণ সঙ্গীত বলে। সার্বিক (universal) বলার কারণ তা বিশেষ আঞ্চলিক কোনো পূজা অনুষ্ঠান সম্পৃক্ত নয় এবং 'সাধারণভাবে' —এ কথা বলার কারণ, গানগুলি পূজাচারের অঙ্গ বা মন্ত্র জাতীয় নয়, কিন্তু বিশেষ বিশেষ পুজোর ক্ষেত্রে সেই পুজো সংক্রান্ত বিশেষ গানই গীত হয়। যেমন, মনসা পুজো। বাংলায় একটা নির্দিষ্ট সময়ে (শ্রাবণ মাসে) সর্বত্র এই পুজো হতে পারে এবং সেক্ষেত্রে মনসা দেবী বা মনসা পুজো-কেন্দ্রিক কোনো কোনো গান গীত হতে পারে— অন্য দেবদেবী বিষয়ক গান নয়। বিপরীতক্রমে বলা যায় যে এই মনসা গান, মনসা পুজো ছাড়া অন্য অন্য ক্ষেত্রে বা অন্য সময়ে গীত হয় না। এমন একটি মনসার গানের দৃষ্টান্ত:

'লামো, মনসাদেবী, শঙ্কর দুহিতা।
জরৎকারু মুনিপত্নী আস্তিকের মাতা।।
ব্রহ্মার দুর্লভ রথ দিয়াছেন বাপে।
সেই রথে লামো, মাগো, পূজার মণ্ডপে।।
হংসবাহন রথে জয় পদ্মাবতী।
অষ্টনাগ লইয়া লামো দেব পশুপতি।।
জালুমালু দুই ভাই কার্তিক গণাই।
সঙ্গে করে নিয়া লামো পাত্র নেতাই।।
আলিপন চিত্রপট রক্ত পদ্মপাতে।
আতপ তণ্ডুল ক্ষীর ঘৃত মধু তাতে।।
স্থানে স্থানে পাতিয়াছে রক্ত পদ্মপাতে।
কুশিয়ারি খণ্ড খণ্ড শোভিয়াছে তাতে।।
হংস কবুতর বলি ছাগ মেষ সনে।।[৭]

মনসা :

মানুষ দেবতা সৃষ্টি করেছে তার নিজস্ব বুদ্ধি, কল্পনা এবং প্রয়োজনের তাগিদে। সর্প অধ্যুষিত বাংলাদেশের মানুষ সর্পের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য সর্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মনসার শরণাপন্ন হয়েছে। সারা বছর ধরেই এঁর পুজো হতে পারে, তবে বর্ষাকালে

যেহেতু সর্পের উপদ্রব বেশী, তাই শ্রাবণ-ভাদ্র মাসব্যাপী মনসার পুজো চলে। গ্রামবাংলার বিভিন্ন স্থানে তাই 'মনসাতলা'র অভাব নেই। মনসা অনার্য লৌকিক দেবী। বিভিন্ন পুরাণে এঁর উল্লেখ আছে। মনসা আরাধনায় অংশ গ্রহণ করেন যাঁরা, সকলেই নারী। এই নারী প্রাধান্য বা মাতৃতান্ত্রিকতা, কোপন স্বভাবা মনসার চরিত্র-বৈশিষ্ট্য, এঁর পূজা বিধি, মনসামঙ্গল কাব্যে বর্ণিত মনসার অব্রাহ্মণ বণিকের দ্বারা সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভের প্রয়াস—ইত্যাদি বিষয়গুলি স্পষ্টতঃই প্রমাণ করে যে তিনি অনার্য লৌকিক দেবী। পরে ব্রাহ্মণ্য সংস্কারে তিনি পৌরাণিক দেবীতে রূপান্তরিত হন। মনসার বিভিন্ন নাম। যেমন পদ্মপাতায় জন্ম হওয়ায় 'পদ্মা', কেয়াবৃক্ষে জন্ম হওয়ায় 'কেতকা', সর্পবিষ হরণকারিণী বলে 'বিষহরি', সর্পে বিভূষিতা— তাই 'নাগমতী'। কিন্তু আমরা একটি বিশেষ নামের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করব, তা হল 'শাকম্ভরী'। যে কোন লৌকিক দেবীর সঙ্গে উর্বরাশক্তি সংক্রান্ত ধ্যান-ধারণার অন্বয় অত্যন্ত স্বাভাবিক। কারণ বেশিরভাগ লোকক্রীড়া, লৌকিক আচার অনুষ্ঠান উর্বরাশক্তিরই প্রতীকী আরাধনা। ফলে শস্যদাত্রী অর্থে তাঁর 'শাকম্ভরী' নাম থেকে প্রমাণ হয় যে মনসা আদিতে লৌকিক দেবী, কারণ শস্য দেবতা, শস্য উৎসব বা উর্বরা তন্ত্র (fertility cult) খাঁটি লোক সমাজেরই সৃষ্টি।

মনসার প্রচলিত মূর্তি হল, তিনি চতুর্ভুজা, সর্পভূষিতা, পদ্মাসনা এবং তাঁর বাহন হাঁস। কিন্তু গ্রাম বাংলায় সিজ বৃক্ষই (ফণীমনসা) মনসাদেবী হিসেবে পূজিতা। বৃক্ষপূজা নিঃসন্দেহে লৌকিক ধর্মাচারের একটি প্রধানতম অঙ্গ। প্রকৃতি তোষণার মধ্যে বৃক্ষ তোষণা অন্যতম। দ্বিতীয়ত, টোটেম হিসেবেও বৃক্ষ পূজিত হয়। আবার সর্পের সঙ্গে আকৃতিগত ও ভাবগত সৌসাদৃশ্যেও সিজ বৃক্ষ পূজা অসম্ভব নয়।

সুতরাং আমারা বলতে পারি, মনসার প্রাগুক্ত মানব মূর্তি বা anthropomorphic রূপ, কেতকা, নাগমতী, পদ্মা ইত্যাদি নামকরণ নিঃসন্দেহে আর্যীকরণের (Aryanisation) ফলেই সংঘটিত হয়েছে। এই কারণেই পরে তিনি শঙ্কর দুহিতা বা জরৎকারু, ব্রহ্মার সঙ্গে সম্পর্কযুক্তা হয়েছেন। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম কাব্যশাখার অনেকটা অংশ মনসাকে উপজীব্য করে গড়ে উঠেছে ঠিক কথা, কিন্তু ঐ মনসামঙ্গল কাব্য রচিত হওয়ার বহু পূর্ব থেকেই লৌকিক স্তরে মনসা-কেন্দ্রিক ব্রত-পাঁচালি যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল তা বলাবাহুল্যমাত্র। সুতরাং বাংলাদেশের সংস্কৃতির সঙ্গে অনেক দেব-দেবীর মত মনসার সম্পর্ক যথেষ্টই গভীর; তাই মনসা বাংলা লোকসাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

বনবিবির গান ও বনদুর্গার গান :

বনবিবি, দক্ষিণরায়, বড় খাঁ গাজী—দক্ষিণ বঙ্গে,—বিশেষত সুন্দরবন অঞ্চলে উপর্যুক্ত দেবদেবী বিশেষ ভাবে পূজিত হন। কাঠুরে, মউলে, ধীবর, নৌজীবী— এককথায় বিপদসংকুল অরণ্য নির্ভর মানুষের কঠোর জীবন সংগ্রামে এইসব দেবদেবীর আশীর্বাদ একান্ত অপরিহার্য বলে তারা মনে করেন। স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষার সংকট আরণ্যক মানুষের কাছে বড় কথা, তাই হিন্দু মুসলমানের ভেদাভেদ বা সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার

সীমাকে অতিক্রম করে জাতি—ধর্ম নির্বিশেষে এই সমস্ত দেবদেবী সকল মানুষেরই পূজার্হ। বনবিবি, দক্ষিণরায় বা বড় খাঁ গাজীর উদ্ভব ও ক্রমবিবর্তন আমাদের আলোচনার অন্বিষ্ট বিষয় নয়। কাজেই সেই বিতর্কের মধ্যে না গিয়ে এঁদের সাংস্কৃতিক পরিচয় ও বৈশিষ্ট্যের কথাই আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করব।

সুন্দর বন অঞ্চলে অরণ্য-নির্ভর মানুষ বনের সর্বশক্তিময়ী যে দেবীর কল্পনা করেছে, তিনিই বনবিবি। বিবি শব্দটি থেকে বোঝা যায় এই লৌকিক দেবী মুসলমান সমাজের। মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলের অরণ্য-নির্ভর মানুষ তার অনিশ্চিত জীবনকে রক্ষা করতে 'বনবিবি'র করুণা প্রার্থনা করে। তাঁর মাহাত্ম্য- জ্ঞাপক কাহিনীমূলক গানই 'বনবিবির গান' —যা ঐ অঞ্চলে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। আবার মুসলমানের কাছে যিনি বনবিবি, হিন্দুর কাছে তিনিই বনদুর্গাদেবী। অরণ্য অধিষ্ঠাত্রী এই লৌকিক দেবীর পূজা পূর্ব-মৈমনসিংহ, উত্তর ত্রিপুরা, পশ্চিম শ্রীহট্ট— ইত্যাদি অঞ্চলেও লক্ষ্য করা যায়। বনদুর্গার পূজা উপলক্ষে যে মেয়েলী গান শোনা যায়— তাই-ই বনদুর্গার গান। উল্লেখ্য বনবিবির গানের মত আখ্যান-মূলক নয়, বনদুর্গার পুজোকে কেন্দ্র ক'রে সংক্ষিপ্ত ছোট ছোট গানেরই সন্ধান পাওয়া যায়, যেখানে নারীর ইচ্ছা অনিচ্ছা বা ঐহিক কামনাই প্রকাশিত। যেমন একটি গানের উদাহরণ :

'কই গেলা গো, মালী ছেড়া, হের আইসা চাই,
পথখানি চাইচ্ছা দেও সইয়ের বাড়ীত্ যাই।
কই গেলা গো, মালী ছেড়ি, হের আইসা চাই,
পথখানি ছিটাইয়া দেও সইয়ের বাড়ীত্ যাই।
কই গেলা গো, গুণের ননদ, হের আইসা চাই।
চুড়ি গাছি পরাইয়া দেও সইয়ের বাড়ীত্ যাই।
কই গেলা, প্রাণের দেওর, হের আইসা চাই,
সোয়ামিখান আনাইয়া দেও সইয়ের বাড়ীত্ যাই।
কই গেলা গো, গুণের শাউড়ী হের আইসা চাই।
শঙ্খ সিন্দুরে সাজাইয়া দেও সইয়ের বাড়ীত্ যাই।।[৮]

লৌকিক পূজাপদ্ধতি বনবিবির পুজোতেও অনুসৃত হয়। 'বনবিবি জহুর নামা' নামক ব্রতকথা-ধর্মী একটি পুঁথি পাঠের পর পুজো শেষ হয়। মুসলমান সম্প্রদায়ের কাছে মূর্তিপুজো নিষিদ্ধ হলেও, ব্যাঘ্র বাহন মূর্তি বা দুখুকে কোলে নিয়ে বিশ্বজনীন মাতৃভাবমণ্ডিত মূর্তিতেও বনবিবি পূজিতা হন।

এ প্রসঙ্গে দক্ষিণ রায়-বৃত্তান্তে আসা যেতে পারে, কেননা এই লৌকিক দেবতা বিভিন্ন দেব-সংস্কারের সমন্বিত রূপ। দক্ষিণরায়ের মধ্যে কৃষিদেবতা, অরণ্যদেবতা, ব্যাঘ্রদেবতা ইত্যাদি বিচিত্রদেব ঐতিহ্যের সঙ্গে কুলপ্রতীক পুজোর সংমিশ্রণ ঘটেছে। ব্যাঘ্রদেবতা বলে পরিচিত এই দক্ষিণ রায়ের মূর্তি অত্যন্ত পৌরুষ-দীপ্ত। এঁর ব্যাঘ্র বা অশ্ববাহন মূর্তিও আছে— তবে সব ক্ষেত্রেই পাশে একটি ব্যাঘ্র মূর্তি থাকে। কোথাও তাঁর অনুচর বা ভ্রাতা কালু বায়েব মূর্তিও থাকে, যিনি বনবিবি-দক্ষিণরায় কেন্দ্রিক

প্রচলিত কাহিনীতে[৯] কুমিরের দেবতা ব'লে বর্ণিত। দক্ষিণ রায় ঘট প্রতীকে অথবা মুণ্ড মূর্তিতে বাবাঠাকুর, বড়ঠাকুর বা বারাঠাকুর রূপেও পূজিত হন— যদিও অনেকে দক্ষিণ রায় ও বারাঠাকুর অভিন্ন বলে মনে করেন না।। বারাঠাকুরের মুণ্ডদ্বয়ের একটিতে চাপদাড়ি আছে এবং অন্যটিতে দাড়ি-গোঁফ না থাকলেও গালপাট্টা আছে। কাজেই মূর্তিদ্বয় পুরুষের। দাড়ি-গোঁফ হীন মুণ্ডটি পরে নারায়ণীর মূর্তি বলে পূজিত হয়— যা ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের প্রভাবেই সম্ভব। বারাঠাকুরের মূর্তির শিরোভূষণে লতাপাতার অলঙ্কার থাকে যা আরণ্যক সংস্কৃতিরই পরিচয়বাহী। আবার এই শিরোভূষণ মিশরীয় ফারাওদের মুকুটের সঙ্গে সাদৃশ্য যুক্ত হওয়ায়, এই দেব মূর্তির কল্পনায় মিশরীয় সভ্যতার প্রভাব আছে বলে কোনো কোনো পণ্ডিত মনে করেন। সে যাই হোক, বারাঠাকুরের পূজা অর্থাৎ মুণ্ডপূজা বিষয়টি ও এই পূজার পদ্ধতি (মদ্য, মাংস, ভাং ইত্যাদি উপচার এই পূজায় অত্যাবশ্যক)— ইত্যাদি বিষয়গুলি লক্ষ্য করলে এমন কথা বলা যায় না, যে বারাঠাকুর হোক আর দক্ষিণ রায়ই হোক এই পূজার সঙ্গে একদা নরবলির সংযোগ ছিল না এবং পরে তন্ত্র সাধনার অভিচারিক ক্রিয়া কলাপের কিছু প্রভাব এর উপব পড়েনি। আরো পরে তা সম্ভবত দক্ষিণ রায়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়েছে। কেননা তীর-ধনুক হাতে দক্ষিণ রায়েব সুপুরুষ মূর্তি কোনো ভাবেই এই দেবতার আদিরূপ বলে ভাবা যায় না।

কৃষ্ণরাম দাসের 'রায়মঙ্গল' কাব্যে দক্ষিণরায়কে একজন শক্তিমান ক্ষেত্রপাল মানব হিসেবেই বর্ণনা করা হয়েছে। কাজেই এটি পরবর্তীকালের সৃষ্টি। এছাড়া দক্ষিণরায়ের পূজা নবান্নের দিনে অর্থাৎ পৌষ সংক্রান্তির দিনেই বিশেষভাবে উদযাপিত হয়— যা মূলত কৃষিদেবতার ক্ষেত্রেই স্বাভাবিক। তাছাড়া তাঁর তীর-ধনুক হাতে সুপুরুষ মূর্তির দিকে তাকালে প্রাচীন বাঘের দেবতা নয়, রক্ষক বা ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ এক পেশীবলে বলীয়ান নায়কের কথাই মনে আসা স্বাভাবিক। কাজেই এইসমস্ত যুক্তিবিচারে বলা চলে যে দক্ষিণরায় নামক দেবকল্পনা কোনো একসময় কৃষিদেবতার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল। পরবর্তীকালে তিনি বাঘের দেবতা হয়ে ওঠেন।

এই পরবর্তীকাল বলতে আমরা মোটামুটি সপ্তদশ শতককেই বুঝব। কেননা কৃষ্ণ রামদাসের 'রায়মঙ্গল' ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে সমাপ্ত হয়েছিল এবং ষোড়শ শতকে দক্ষিণরায় সংক্রান্ত কোনো মঙ্গলকাব্যের সন্ধান পাওয়া যায় না, এমনকি দক্ষিণরায়ের নামও কোনো সাহিত্যকীর্তিতে অনুল্লিখিত।

দ্বিতীয়ত চট্টগ্রাম-আরাকান অঞ্চল সহ প্রায় সমগ্র দক্ষিণবঙ্গে মুসলমান (যার সিংহভাগ ধর্মান্তরিত মুসলমান) সমাজে স্থিতাবস্থা আসে মোটামুটি সপ্তদশ শতক থেকেই, যার বড় প্রমাণ সৈয়দসুলতান, দৌলত কাজী, সৈয়দ আলাওল প্রমুখ' কবির আবির্ভাব।[১০] কেননা, কোনো অস্থির সময়ে শিল্প সাহিত্য চর্চা অর্থাৎ সারস্বত আরাধনা সম্ভব হয় না। এ সময়ে সূফি ধর্ম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার বিষয়টিও লক্ষণীয় যা বস্তুতপক্ষে মুসলমান ধর্মের প্রতিষ্ঠার ঘটনাকেই দ্যোতিত করে। সপ্তদশ পূর্ব শতকের হিন্দু-

মুসলমানের সংঘাত এই শতকের কিছু পূর্বেই ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে আসে এবং পূর্ব ও দক্ষিণবঙ্গে মুসলমান ধর্মাবলম্বী মানুষের প্রতিষ্ঠালাভ ঘটে। আর এই সময় থেকেই জীবিকার প্রয়োজনে দুর্গম সুন্দরবন অঞ্চলে মানুষের পদক্ষেপ। সৃষ্টি হয় বনবিবির। বড় খাঁ গাজীর মধ্যস্থতায় বনবিবির কাছে দক্ষিণরায়ের নতি স্বীকার বিষয়ক কাহিনীটিতে হিন্দু-মুসলমানের সংঘাত ও মুসলমানের প্রতিষ্ঠার বিষয়টিই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আমাদের এই সিদ্ধান্ত আরো সমর্থিত হয়, যখন আমরা দেখি যে বড় খাঁ গাজী একজন ঐতিহাসিক চরিত্র, কাল্পনিক চরিত্র নন।

"পীর মোবারক গাজী তথা বড় খাঁ গাজীর পরিচয় অবশ্য দক্ষিণবঙ্গে অন্য দুই প্রধান উপাস্যের তুলনায় অনেক বেশি স্বচ্ছ। ঘুটিয়ারী শরীফে এঁর মাজারও রয়েছে। তবে এঁরও মূর্তি--- অশ্বারোহীর বেশে— উপাসনা করা হয়। ইনি ইতিহাসের মানুষ, কিংবদন্তীর সিঁড়ি ধরে দেবকল্প হয়ে গেছেন হিন্দু-মুসলমানের ধর্মগত প্রভেদবুদ্ধিকে ঘুচিয়ে, এটি এঁর সম্বন্ধে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য"।[১১]

এ ছাড়া বিভিন্ন গাজীর পটে গাজী ও বৈষ্ণবের যুদ্ধের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা থেকেও উপর্যুক্ত বিষয়টি প্রমাণিত হয় (গুরুসদয় সংগ্রহশালায় রক্ষিত গাজীর পট)।

টোটেম বা কুলকেতু পূজার উৎস থেকে ব্যাঘ্র উপাসনা স্বাভাবিক। ভারতবর্ষ ও পৃথিবীর বহু দেশে এইভাবেই ব্যাঘ্র উপাসনার সৃষ্টি। সেক্ষেত্রে উপাসকরা ব্যাঘ্র[১২] হত্যা করে না, কেননা কুলকেতুর রক্তপাত ঘটানো বা তার অমর্যাদা করা নিষিদ্ধ। কিন্তু দক্ষিণরায়ের উপাসকরা প্রয়োজনে বাঘ হত্যায় কুণ্ঠিত নন। সুতরাং এ থেকে প্রমাণিত হয়, দক্ষিণরায়ের সঙ্গে কুলকেতুর সম্বন্ধ নেই। "সে জন্যে অনুমান করা যেতে পারে ব্যাঘ্র পূজা থেকেই দক্ষিণরায় পূজার উৎপত্তি হয়ত ঘটেনি তবে বলা যায় আদিকালের ব্যাঘ্রদেবতার সঙ্গে পরবর্তীকালে অন্য কোন দেবতা মিশ্রিত হয়ে দক্ষিণরায় দেবতার সৃষ্টি হয়েছে।"[১৩]

পরিশেষে আমরা বলতে পারি, অরণ্যনির্ভর মানুষ নিজ প্রয়োজনে বনবিবি— দক্ষিণরায়ের মত অর্বাচীন লৌকিক দেব-দেবীর সৃষ্টি করেছে। বনবিবির মূর্তির সঙ্গে দুখুর করজোড়ে বিবিমার স্মরণ নেওয়ার ভঙ্গিটি আসলে সাধারণ মানুষেরই তাঁর শরণার্থী হওয়ার দ্যোতনা বহন করছে। পক্ষান্তরে ব্যাঘ্রভীতি থেকে হিন্দুর ব্যাঘ্রের উপর অধিক নিয়ন্ত্রণক্ষম দেবতা দক্ষিণরায়ের পরিকল্পনা। এ ছাড়া তিনি ঐতিহাসিক চরিত্র হন বা না হন, তিনি কৃষিদেবতা এমনকি প্রয়োজনে ব্যাধির দেবতার সত্তা নিয়েও বিরাজমান। সেই সঙ্গে স্থানীয় প্রাচীন অনার্য মুণ্ড পূজাও (বারাঠাকুর,[১৪] রাত্রিকালে এই পূজা জাঁতাল) কোনো কারণে দক্ষিণরায়ের সঙ্গে একীভূত। অতঃপর হিন্দু-মুসলমানের সংঘাত ও মুসলমান ধর্ম প্রতিষ্ঠার অনিবার্য প্রভাবে বনবিবি, বড় খাঁ গাজী ও দক্ষিণরায়ের সংঘাত। এইভাবে দক্ষিণরায় হয়ে উঠেছেন এক মিশ্র ঐতিহ্যের স্মারক। এই ত্রয়ীকে নিয়ে রচিত লোককাহিনীটি তাই ইতিহাস, কিংবদন্তী ও রূপকথার এক অনন্যসাধারণ মেলবন্ধন। বনবিবির প্রতিস্পর্ধী বনদুর্গা নিঃসন্দেহে আরো

পরবর্তীকালের সৃষ্টি, তাই তাঁকে ঘিরে বিশেষ কোনো কাহিনী গড়ে ওঠেনি; শান্ত সমাজজীবনের স্বাচ্ছন্দ্যে মানব মন বিশেষত নারী মন, বনদুর্গাকে সামনে রেখে স্বীয় সুখ-দুঃখ, ইচ্ছা অনিচ্ছার প্রকাশ ঘটিয়েছে ছোট ছোট গানে— যার দৃষ্টান্ত পূর্বেই দিয়েছি।

দক্ষিণরায়-বনবিবি-বড় খাঁ গাজীকে নিয়ে প্রাগুক্ত লোককাহিনীটি এবং বারাঠাকুর বা দক্ষিণরায়ের গান বা পাঁচালি এক নয়। দ্বিতীয়ত, কাহিনীটিকে কেন্দ্র করেই 'রায় মঙ্গল' রচিত। 'মকর সংক্রান্তির সময় সারা রাত্রি জাগিয়া খোল করতাল সহযোগে এই গান গীত হয়। একে বারাঠাকুরের গান বলে।'

বাউল (লৌকিক)

বাংলায় যেসমস্ত ধর্মাশ্রিত গানগুলি বিদ্যমান তার মধ্যে 'বাউল' অন্যতম। বস্তুত রবীন্দ্রনাথই প্রথম বাউল সম্পর্কে বিদ্বজ্জনকে অনুসন্ধিৎসু করেন। 'বাউল' একটি বিশেষ ধর্ম বা ধর্মসাধনার প্রণালী যা 'বাউল' গানের মধ্য দিয়েই প্রকাশলাভ করে। গুরুবাদ বাউলের অন্যতম বিশেষত্ব। দেহের মধ্যে আত্মারূপী ঈশ্বর বিরাজমান বলে বাউল বিশ্বাস করে, সেই ভগবান দেহস্থিত 'মনের মানুষ' যা বাউলের অম্বিষ্ট। এই ঈশ্বর 'অচিন পাখি';— তাকে ধরা ছোঁয়া যায় না, আর তাঁকে ধরার সাধনার মধ্যেই বাউলের ধর্ম রক্ষিত হয়। বাউল কোনো আচারমূলক ধর্মকে স্বীকার করে না। সুতরাং বাউল বিশেষ এক তত্ত্ববাদী ধর্ম সাধনপন্থা এবং সাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্য বাউলের আছে। বাউলের গূঢ় ইঙ্গিতবাহী নৃত্যও গানের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। এছাড়া বাউল গানের বিশিষ্ট কিছু সুর বৈশিষ্ট্যও আছে। তন্ত্রধর্ম, চৈতন্যপ্রভাব ইত্যাদির দ্বারা বাউলের কিছু শ্রেণীবিভাগও পরবর্তীকালে সৃষ্টি হয়েছে। অতএব এই দিক থেকে বাউল গান লোকসঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না।

যে বাউলগানকে লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা আসলে বাউলের আর একটি লৌকিক ধারা যা মূল বাউলের সমান্তরাল খাতে প্রবহমান। মূল বাউল সাধনার আদর্শ বিচ্যুত, মূল বাউল সাধন-পন্থা ও সাধন-শাস্ত্র নিরপেক্ষ এই লৌকিক ধারাটির মধ্যে বৈরাগ্য, সাধারণ ভক্তি, ব্যক্তিজীবনের যন্ত্রণা এবং অন্যান্য বিভিন্ন ব্যক্তিক-চিন্তাই প্রধান উপজীব্য বিষয় হয়ে উঠেছে। অবশ্য কিছু দেহতত্ত্বের গান বা গুরুবাদী গান কিংবা মূল-বাউল গানের কিছু কিছু প্রতীকী শব্দ এখানেও লক্ষ্য করা যায়, যা মূলত বাউলের প্রভাবের জন্য সম্ভবপর হয়েছে।

যাই হোক লৌকিক বাউল গানের একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে:

'তোমায় দিবানিশি ডাকি তাই তোমারে হরি,
দাও দাও দরশন যাতনা জানাই।
চির সুখের তরে সংসারে সঁপিনু মন
কত দুখ দাও, হরি, তোমারে জানাই।
মনো বেদনা জানাই, হরি, যাতনা জানাই,

সংসার সাগরে পড়ি তোমারে ভুলেছি, হরি,
কেমনে পার হব হরি, এ ভব সংসার।
তুমি, হরি, দীনবন্ধু, অধম জনার বন্ধু,
নিজ গুণে কৃপা করে তরাও হে আমায়।
অধম গিরি কাতর প্রাণে ডাকে হে তোমায়।'

বসনরায় গীত বা বসন্তরায়ের গীত

ব্যাধির, বিশেযত বসন্ত রোগের নিয়ন্ত্রক দেবতা হিসেবে বসন্তরায় বা বসনরা দেবতার কল্পনা। সপ্তদশ শতকের কবি কৃষ্ণরাম দাস তাঁর শীতলা মঙ্গলে বিশদভাবে বসন্তরায়ের মহিমা বর্ণনা করেছেন। বসন্ত রোগের দেবী শীতলার পুত্র বলে কথিত বসনরাদেব শীতলার সঙ্গে যেমন পূজিত হন, তেমনি পৃথকভাবে অশ্বারোহী হয়েও বিরাজ করেন। দক্ষিণরায়ের মত তিনি সুপুরুষ, গাত্রবর্ণ হরিদ্রা। মূলত মৈমনসিংহ অঞ্চলে বসন্তকালে তাঁর আরাধনা করা হয় এবং স্ত্রীলোকেরাই তাঁর পূজা করে। পূজা পদ্ধতি ব্রতের অনুষ্ঠানের অনুরূপ। তাই 'বসনরায় ব্রত' 'বলেই এই পূজার খ্যাতি। নারীরা সমবেতভাবে এই ব্রত পালন করেন।

ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য মনে করেন যে এই দেবতার সঙ্গে বসন্ত রোগের কোনো সম্পর্ক নেই— ইনি আদিতে বসন্ত ঋতুর দেবতা। যুক্তি হিসেবে তিনি বলেছেন যে বসন্ত রায় বা বসনরার সঙ্গে বসন্ত রোগের নাম সাদৃশ্য হেতু তিনি কালক্রমে বসন্তরোগের দেবতা হিসেবে প্রতিপন্ন হয়েছেন এবং বসনরা বা বসন্তরায় নামটি বসন্তরাজ শব্দ থেকেই বিবর্তিত হয়েছে।[১৫]

এই মতের সমর্থনে আরো কতকগুলি যুক্তি উপস্থাপিত হতে পারে। যেমন, প্রথমত ব্যাধির দেবতাসুলভ কোনো বিশিষ্টতা বসনরার মূর্তিতে দুর্লক্ষ্য, বরং বসন্ত ঋতুরাজের সৌন্দর্যই প্রকটিত। দ্বিতীয়ত, উত্তমঠাকুরকে ফুল দেওয়া এ ব্রতের অন্যতম পালনীয় বিষয়। এবং এটি অত্যন্ত আনন্দোচ্ছল অনুষ্ঠান; ফুল দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চলে গীত— যে গীতগুলির সঙ্গে রোগের কোনো সম্পর্ক নেই, বরং বসন্তলীলার উচ্ছলতাই প্রকাশিত।[১৬] তৃতীয়ত, এই ব্রতের অনুষ্ঠানে কলাগাছের বিবাহ দেওয়া হয়, সিঁদুর সহ দুটি পিটুলির মূর্তি গড়া হয়, পূজা উপচারে দূর্বা, বিভিন্ন ফুল, মাটির ঢিল ব্যবহৃত হয় এবং সধবা বা এয়োস্ত্রীরা এঁর পূজা করেন— যা প্রকটভাবে উর্বরতা তান্ত্রিক ভাবনার প্রতিফলন। চতুর্থত, উত্তম ঠাকুরের বিভিন্ন গানে উত্তম ঠাকুরের সঙ্গে কখনো কখনো শিব এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কৃষ্ণ একীভূত হয়ে গেছেন এবং বলাবাহুল্য প্রেমিক কৃষ্ণের সঙ্গে বসন্তোৎসবের এক গভীর ভাবানুষঙ্গ বিদ্যমান।

তথাপি নির্মোহ দৃষ্টিতে বিচার করলে, বসন্তরায় যে মুখ্যত ব্যাধিরই দেবতা তা অস্পষ্ট থাকে না। এ বিষয়ে যে যুক্তিগুলি উপস্থাপিত হতে পারে তা হল·

প্রথমত, বসন্তকালেই মহামারী রূপে যে রোগ প্রাদুর্ভূত হয়, সে রোগের নাম বসন্ত,— যা কালের নাম দ্বারাই চিহ্নিত। ফলে বসন্তকালের দেবতা যদি বসন্তরাজ

বা বসন্তরায় হন, তবে একইভাবে বসন্তরোগের দেবতা বা বসন্ত রোগের নিয়ন্ত্রক দেবতা বসন্তরাজ বা বসন্তরায় হবেন না, তা মানা যায় না।

দ্বিতীয়ত, বসনরার সুকান্তিময়, সুপুরুষ মূর্তি নিঃসন্দেহে আদি মূর্তি নয়। কারণ এই ব্রতে পিটুলি নির্মিত যুগল মূর্তিতে ভূষাকালি দিয়ে স্ফোটক চিহ্ন এঁকে দেওয়া হয়[১৭] যা বসন্তরোগের দেবতার ক্ষেত্রেই স্বাভাবিক। নিঃসন্দেহে এই স্ফোটক চিহ্ন সম্বলিত পিটুলি মূর্তি বসন্তরায়ের আদি মূর্তি, পরবর্তীকালে উত্তমঠাকুরের ভাবাদর্শে বা অন্য কোনো কারণে মানুষ বসনরার সুকান্তিময় মূর্তি কল্পনা করেছে। এক্ষেত্রে রায়মঙ্গলের কবির চেষ্টাও হয়ত উল্লেখযোগ্য ছিল। শীতলামঙ্গলের বসন্তরায় যে সুন্দর মূর্তির অধিকারী তা হয়ত কবি কল্পনারই ফলশ্রুতি। এবং শীতলামঙ্গলের দৌলতে ক্রমে এই মূর্তিই জনমানসে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে। এক্ষেত্রে তাঁর রায়মঙ্গলের দক্ষিণরায় মূর্তির কথাও স্মরণযোগ্য।

তৃতীয়ত, বৃহত্তর বা গোষ্ঠীস্বার্থে, যেমন গবাদি পশু রক্ষা, রোগ-ব্যাধি থেকে পরিত্রাণলাভ— ইত্যাদি ক্ষেত্রে পালনীয় ব্রতের অনুষ্ঠানে মাঙ্গন বা মাগন চাওয়া একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বসনরার ব্রতেও মাগন চাওয়া হয়। ফলে বোঝা যায় যে এটি আর যাই হোক, বসন্তোৎসব নয়।

চতুর্থত, দেবী শীতলার সঙ্গে বসন্ত রায়ের যোগাযোগের কারণ ও ক্রমে শীতলার প্রাধান্য সম্পর্কে গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু যা বলেছেন তা স্মরণযোগ্য :

'মনে হয় শীতলার আবির্ভাবে বসন্ত রায়ের প্রভাব ম্লান হয়েছে। যেহেতু শীতলা হিন্দুদের কুলভুক্ত হয়েছেন, বসন্ত রায় তা হতে পারেননি। শীতলা যে আর্য হিন্দু দেবী তা নয়, মনীষীদের কেউ কেউ বলেন, 'শীতলা' শব্দটি অনার্য। শীতলার মূর্তি পরিকল্পনার মধ্যে অনার্য ছাপ সুস্পষ্ট। শীতলার প্রণামে আছে,— "নমামি শীতলাং দেবী রাসভাস্থাং দিগম্বরীম্।" বসন্ত রায়ের আহ্বান মন্ত্রেও আছে,— "দিগম্বর চারুবিশাল নেত্রং...।" অনুমান করা যেতে পারে উভয়েই আদিম যুগের কল্পিত ভয়ের ও বিপদ ত্রাণের দেবতা। একই কল্পনা প্রসূত ও স্বাজাত্য কারণে এদের মিলন ঘটেছে, আত্মীয়তা হয়েছে। মাতৃ উপাসকদের প্রাধান্যকালে শীতলার প্রাধান্য হয়েছে, বসন্ত রায়ের প্রতিপত্তি হ্রাস পেয়েছে।"[১৮]

পঞ্চমত, কৃষ্ণরাম দাসের 'শীতলামঙ্গলে' বর্ণিত বসন্তরায়ের অধিষ্ঠানভূমি যে খাড়ি, সেই খাড়ি অঞ্চলেই রাজা প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত রাজা বসন্ত রায় অধিপতি ছিলেন, যিনি দেবভক্ত ছিলেন এবং বহু দেব বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে ইতিহাস কথিত।

বসন্তরায়ের প্রকৃত নাম জানকী বল্লভ। তাঁর পিতা গুণানন্দ মজুমদার। দায়ুদ খাঁর সিংহাসন প্রাপ্তির কিছু পরে যশোর রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় (১৬৭৪)। সে যাই হোক, তাঁর পিতা সুলেমান কররা বিভিন্ন রাজনৈতিক কারণে ও সম্রাট আকবরের সঙ্গে দুঃসাহসিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার অনিবার্য ফল স্বরূপ বন্ধু ও বয়স্য শ্রীহরি ও তার খুল্লতাত ভ্রাতা জানকী- বল্লভের উপর সমস্ত সম্পদ অর্পণ ক'রে পলায়ন করেন।

অতঃপর শ্রীহরি যশোরে জানকীবল্লভের সহায়তায় বন কেটে উপনিবেশ স্থাপন করেন ও দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হন জানকীবল্লভ। শ্রীহরি ও জানকী বল্লভকে সুলেমানই যথাক্রমে 'বিক্রমাদিত্য' ও 'বসন্ত রায়' উপাধি দান করেছিলেন। কারণ পরে সুলেমান স্বমহিমায় ফিরে এসেছিলেন এবং তাঁদের স্বীয় অমাত্য পদে বরণ করে নেন এবং পূর্বোক্ত উপাধি দান করেন। জানকী বল্লভ ছিলেন তাঁর 'খালিসা' বিভাগের কর্তা ও কোষাধ্যক্ষ। বসন্ত রায় নিজে ছোট বেলা থেকে বৈষ্ণব হলেও তিনি ছিলেন সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ শূন্য বিবিধ মহান গুণের অধিকারী। তিনি বীর, রসজ্ঞ, পণ্ডিত, সঙ্গীত পারদর্শী ও গুণীর সমাদরকারী এবং দেবদ্বিজে তাঁর ভক্তি ছিল অসাধারণ। ('বসন্ত রায় সংজ্ঞাঞ্চ রাজোপাধিং তথৈব চ/ প্রপ্লুয়াৎ স নরশ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদঃ) বহু শিব মন্দির ও অন্যান্য দেবদেবীর মন্দিরও তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন।[১৯]

কাজেই এমন একজন রক্তমাংসের নায়ক যে পরবর্তীকালে লৌকিক দেবতার স্তরে উন্নীত হবেন তা সহজেই অনুমেয়। বাস্তবে হয়েছেও তাই।

উত্তম অর্থে ভালো। উত্তমঠাকুর অর্থাৎ যাকে শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকার করা হচ্ছে। এই ব্রতের প্রধান অঙ্গ উত্তম ঠাকুরকে ফুল দেওয়া। ব্রতচারিণীরা গান 'উত্তমঠাকুর ভালা (ভালো), অমুক কালা (কালো)।' 'অমুক শব্দটির স্থানে নিজ পরিবারের সদস্যদের নাম বসানো হয়। বসনরা ব্রত যে তারিখে অনুষ্ঠিত হবে তার এক পক্ষকাল আগে থেকেই উত্তমঠাকুর কেন্দ্রিক অনুষ্ঠান চলে। এই অনুষ্ঠান মূলত উর্বরতান্ত্রিক অনুষ্ঠান, বসন্তোৎসবের সঙ্গেও সম্পৃক্ত। তাই কৃষ্ণ প্রসঙ্গও এখানে এসেছে। বসনরা ব্রতের সঙ্গে এই উত্তমঠাকুরকেন্দ্রিক বিপরীত স্বভাব-ধর্মের অনুষ্ঠান সংযুক্ত হওয়ার যে কারণ তা অনিবার্যতঃই লোকসমাজের যাদুবিদ্যা ও সর্বপ্রাণবাদ সংক্রান্ত বিশ্বাসের প্রতিফলন তা বলাই বাহুল্য।

বসন্তরায় উত্তমঠাকুর কেন্দ্রিক গানগুলি লক্ষ্য করার মত। বিশেষ ক'রে বসন্তরায় ও চৈতা রাজকন্যার বিবাহ সংক্রান্ত গানগুলির কাব্যধর্মিতা উল্লেখযোগ্য। গ্রাম বাংলার সাধারণ নিরক্ষর রমণীরা বিনা শিক্ষায় যেভাবে গানগুলি গান তা এক কথায় অনবদ্য। যেমন :

> 'বসনরা বিয়া করে চৈতা রাজার কন্যা রে।
> বিয়া করলা বসনরা, বিধান পাইলা কি?
> হাতী পাইলাম ঘোড়া পাইলাম,
> আরো পাইলাম কন্যা রে।'... ইত্যাদি।

বাঁধনা পরবের গান

এক বিশেষ গো পূজার অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে যে গান গীত হয় তাই-ই বাঁধনা পরবের গান। এখানে গো-মহিষের জন্মকথা কীর্তন করা হয়। কীর্তিত হয় গো-মাহাত্ম্যও। নৃত্য বাদ্য (মাদল) সহযোগে এই গান গাওয়া হয়। গরু বা মহিষ নাচানো এই পুজোর অঙ্গ। একটি খুঁটিতে গরু বা মোষকে বেঁধে অস্ত্র দিয়ে খুঁচিয়ে তাকে

মেরে ফেলা হ'ত। এখন কাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে তাকে উন্মত্ত করে ছেড়ে দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানে গীত হয় এমন একটি গান :

'জাগ মা, ভগবতী, জাগ মা লক্ষ্মী,
জগতে আমবস্যা রাইত
জাগে কা পতিপদ (প্রতিপদ)
দেবে গা মাইলাম
পাঁচ গুঁতা দশ ধেনু গাই আজিকার দিয়ে
জাগি সতী লেবে, জাগোত আমবস্যা রাইত
সিংহ হে লিবে, বরদা ফুল হরি তেল
মুখেত লিয়ে কাটা ঘাস।
আজি বরদা তোদেরই পরবরে।
দেহ দেহ দেহ লক্ষ্মী,
লাখ ভরি শিশরি বাড়ুক লাখে লাখে
আর যে আসিবে বন্দনা পরব রে।

রাঢ় অঞ্চলের পশ্চিম সীমান্তবর্তী স্থানে— মূলত পুরুলিয়ায় কালী পূজার পরের দিন রাত থেকে (কার্তিকী অমাবস্যায়) এই উৎসবের শুরু। "খোঁটায় বাঁধার ব্যাপার থেকে 'বন্ধন' এবং বন্ধন থেকে 'বাঁধনা' পরব নাম হয়েছে।"[২০] 'বাধনা' থেকে অল্পপ্রাণিত উচ্চারণে 'বাদনা'। এই অনুষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য গরু ও কাড়া (মহিষ)কে সিঁদুর দিয়ে বরণ করা, এদের সিং সিঁদুর রঞ্জিত করা, এবং সদ্য কাটা ধানের মুকুট (মোড়) পরিয়ে দেওয়া। সেই সঙ্গে মাঙ্গন চাওয়া ও মাদলের তালে তালে উদ্দাম নৃত্যের মধ্য দিয়ে গরু-মহিষকে উত্তেজিত করাও লক্ষণীয় দিক।

গো-বরণ, সিঁদুর রঞ্জন, মোড় পরানো— ইত্যাদি বিষয়গুলিতে বলাবাহুল্য উর্বরাতন্ত্র ও কৃষি উৎসবের ছাপ সুস্পষ্ট। কেননা কৃষির সঙ্গে গো-মহিষের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে, প্রথমত, কৃষিপ্রধান বাংলাদেশে কেবলমাত্র এই অঞ্চলেই এই পরব কেন সৃষ্টি হয়েছে এবং দ্বিতীয়ত, এক সময় এই উৎসব এত নৃশংস ছিল কেন?

এর উত্তরে আমরা বলব, প্রথম অবস্থায় বাঁধনা পরব কৃষি উৎসবের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল না। শুষ্ক উষর পুরুলিয়ার মানুষের কাছে কৃষির চেয়ে পশু পালন গুরুত্বপূর্ণ ছিল প্রাকৃতিক কারণেই। এবং পশুপালনের মধ্যে লাভজনক গো-মহিষ পালনই অধিকতর শ্রেয়ঃ ছিল। তাই বাঁধনার গান এখনো মূলত গো-মহিষকেন্দ্রিক এবং এতে গোরুর উৎপত্তির ইতিহাস, গো-স্তব, গো-স্তুতি ইত্যাদিই বিশেষভাবে প্রাধান্য পায়। দ্বিতীয়ত, গোয়ালা বা আহিররাই এই পরবে বিশেষভাবে অংশগ্রহণ করে এবং মূলত তারাই নতুন বস্ত্র পরিধান করে। তৃতীয়ত, কোনো উৎসব তখনই ব্যাপ্তি ও স্থায়িত্ব লাভ করে যখন ব্যষ্টির পরিবর্তে সমষ্টি সেই উৎসবে অংশগ্রহণ করে। বাঁধনা পরবে অংশগ্রহণকারী আহিরদের সংখ্যা গরিষ্ঠতাই এই উৎসবকে

টিকিয়ে রেখেছে। ঐ অঞ্চলে গো-মহিষ পালনই প্রধান জীবিকা ছিল। পরে কৃষির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই উৎসবে কৃষি উৎসবের বৈশিষ্ট্যও একীভূত হয়েছে।

আর ঐ নিষ্ঠুব অনুষ্ঠানটির অর্থাৎ গরুতে-মহিষে লড়াই বা খোঁটায় বাঁধা গরু কিংবা কাড়াকে খুঁচিয়ে মারার অনুষ্ঠানটির সূচনা হয়েছে ধলভূমের রাজার নিষ্ঠুর বদান্যতায়— যেখানে আদিবাসী সমাজের সংগুপ্ত আদিম মানসিকতার সমর্থন অতি সহজে মিলেছিল। "ধলভূমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রঙ্কিণী কালীর মন্দিরের সামনে প্রত্যেক বছর কালীপুজোর সময় বাঁধন পরবের এই অনুষ্ঠান হ'ত। ধলভূমেব রাজা, তাঁর পুরোহিত এবং স্থানীয় ভূমিজ সাঁওতাল মুণ্ডা ও অন্যান্য আদিজনেরা এই অনুষ্ঠানে মহানন্দে যোগ দিত।"[২১] ক্রমে নগবায়নেব ফলে ও হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের স্পর্শে বর্তমানে উৎসবে ঐ নিষ্ঠুর দিকটি বিলীন হলেও— গরু জাগানো বা খুঁচিয়ে গরুকে মত্ত করে তোলাব বিষয়টি কিঞ্চিৎ থেকেই গিয়েছে।

বাঁধনা পরবকে কেন্দ্র ক'রে যে অনানুষ্ঠানিক ও আনুষ্ঠানিক লোকসঙ্গীতের বিপুল ভাণ্ডার গড়ে উঠেছে তা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বিষরীর গান বা বিষহরির গান বা বিষোহোরার গান

কুচবিহার-জলপাইগুড়ি অঞ্চলের এই গান আসলে মনসামঙ্গলেরই লৌকিক রূপ। মনসামঙ্গলের মতই শ্রাবণ মাস ধ'বে বা শ্রাবণ সংক্রান্তিতে মনসার এই মাহাত্ম্যকীর্তন মূলক গান গীত হয়। একটি বিষোহোরার গানের অংশ :

ডান্টা ডাখালী তামাম দিয়া চালি,
মোনের তিকে বুড়া গেইল দূর তীরথে চলি।
বুঝায় অবুঝায নাগাইল জের পেটা জের পেটি
কাঁহ মাথাত বামধিল মাইয়াব পাটানী।

বাস্তু পূজার গান

"বাস্তু এবং কৃষিভূমিব অধিষ্ঠাতা দেবতাকে প্রসন্ন কবিবার জন্য পৌষ মাসে (post-harvest) বাস্তু দেবতার পূ◌ঃ হয়। সেই উপলক্ষেও মেয়েলী সঙ্গীত শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাই বাস্তু পূজার গান"[২২]

ব্রতের গান

ব্রতের গান পার্বণ বা আনুষ্ঠানিক আচারমূলক সঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত হলেও ব্রতের গানে কিছু বিশেষত্ব আছে। পার্বণী সঙ্গীতের মত ব্রতের গানও সাধারণভাবে (মন্ত্র হিসেবে নয়) গীত হয়। পার্বণী-সঙ্গীতের মতই একসঙ্গে এই গানের 'সার্বিক' এবং 'বিশেষ' চরিত্র। কিন্তু বৈসাদৃশ্য আছে। কারণ ব্রত আর পার্বণ এক নয়। ব্রত সাধারণত মহিলাদের দ্বারাই উদ্‌যাপিত হয়, এবং বিশেষ কোনো বাসনা সিদ্ধ করতেই ব্রত

পালন করা হয়। পক্ষান্তরে বিভিন্ন পার্বণ সামাজিক সংস্কারের বশবর্তী হয়ে পালিত হয়, বিশেষ কোনো কামনা-বাসনার চেয়ে সার্বিক মঙ্গল সাধনাই পার্বণ উদ্‌যাপনের লক্ষ্য এবং কেবলমাত্র মহিলারাই পার্বণে অংশগ্রহণ করেন তা নয়, পুরুষেরাও মুখ্য ভূমিকা পালন করতে পারেন। (কোনো কোনো পার্বণ মহিলা বর্জিত।) এছাড়া ব্রত নির্দিষ্ট সময় ধরে— এমনকি সারা জীবন ধরে পালন করার বাধ্য-বাধকতা থাকতে পারে, পার্বণের ক্ষেত্রে সাধারণত তা দেখা যায় না। সুতরাং ব্রতের একটা স্বকীয় চবিত্র বা বৈশিষ্ট্য আছে। ব্রতের অনুষ্ঠানে বা তার পূর্বে বা পরে অনুষ্ঠান বা অনুষ্ঠান নিরপেক্ষভাবে, যে গান মহিলাদের দ্বারা গীত হয়— তাই ব্রতের গান। ব্রতের গানও সংক্ষিপ্ত। এবং এর একটি নিজস্ব সুর আছে।

বাংলা লোকসাহিত্যেব ভাণ্ডারটিকে যে প্রকরণগুলি ঋদ্ধ করেছে তার মধ্যে অন্যতম হল ব্রত। ভারতবর্ষের অতি প্রাচীন লৌকিক ধর্মধারা এই ব্রতের মধ্যেই এখনো জীবিত। ব্রাত্যজন বলে আর্যরা অনার্য ভারতবাসীকে হীন চোখে দেখেছিল মনুসংহিতা ও অন্যত্র সে প্রমাণ আছে। আর্যরা এদেশের নারীদের বিবাহ করতে বাধ্য হয় কারণ যাযাবর আর্যরা এদেশে আসার সময় সঙ্গে যথেষ্ট সংখ্যক নারীদের নিয়ে আসতে পারেনি। আবার আর্যকে বিবাহ করতে বাধ্য হয়েও অনার্য নারী তার সংস্কৃতি ও ধর্মকেও বিসর্জন দিতে পারেনি। ফলে ব্রত সেই নারীদের জীবনচর্যার সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে যুগ যুগ ধরে টিঁকে আছে। তাই মঙ্গলকাব্যের কাহিনীতে (যা কিনা ব্রত কথারই শিষ্ট রূপ) শেষ পর্যন্ত পুরুষেরা আর্য অহঙ্কাব পরিত্যাগ করে, অন্তত বাঁ হাতেও দেবীকে ফুল ছুঁড়ে পূজা দিয়েছে।

ব্রত অনুষ্ঠান বা পূজা মানুষের— মূলত নারীর জাগতিক বা ঐহিক কামনা-বাসনা যাতে চরিতার্থ হতে পারে, সেই আকাঙ্ক্ষাতেই পালিত হয়। ব্রতের আনুষ্ঠানিক বা ক্রিয়াত্মক রূপেব মধ্যে আমরা যা দেখি এবং যে যে উপচার ব্যবহৃত হতে দেখি তাতে প্রধানত মাতৃতন্ত্র ও উর্বরাতন্ত্রই বিভিন্ন আলপনা যাদু বিশ্বাস, বৃক্ষপূজা টোটেম পূজা ইত্যাদির সংমিশ্রণে প্রকাশ লাভ করেছে।

অধিকাংশ ব্রতের সঙ্গে ব্রতকথা সংযুক্ত থাকে। বিশেষ বিশেষ ব্রত পালন করলে কি সুফল পাওযা যায়— সেই বক্তব্যই ব্রতকথা প্রত্যক্ষভাবে বহন করে। কিন্তু পর্যবেক্ষকের দৃষ্টি নিয়ে দেখলে, দেখা যাবে হাজার হাজাব বছর বছর ধরে অযুত পথ পরিক্রমায় ইতিহাসের বহুবিধ ঘাত-প্রতিঘাত থেকে ছিটকে পড়া সংস্কৃতির স্বর্ণকণা ব্রতকথাগুলিতে মিশে আছে। আবার বিভিন্ন রূপকথা-পশুকথা-উপকথা অথবা মিথ-কিংবদন্তী— সব মিলিয়ে ব্রতকথাগুলি লোকসাহিত্যের ভাণ্ডাবটিকে বৈভবশালী করে তুলেছে।

যাইহোক এছাড়া আরো বহু লোকদেবতা যেমন পাঁচুঠাকুর, বাসলী, ঢেলাইচণ্ডী, রঙ্কিনী, সিনিদেবী ইত্যাদি লোকজীবনের সঙ্গে বিশেষভাবেই ওতপ্রোত হয়ে আছেন। এইসব দেব-দেবীদের নিয়ে বিভিন্ন ছড়া গান ইত্যাদি রচিত হয়েছে স্বভাবতই। কিন্তু দুর্গা-কালী, লক্ষ্মী, বিষ্ণু এমন সব দেবতা যারা ব্রাহ্মণ্য সংস্কারে ও বৈদিক ঐতিহ্যে

লালিত, তাঁরাও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আর্যেতর ও লৌকিক সংস্কার দ্বারা গ্রস্ত। শিবের মত কতিপয় দেবতা ব্রাহ্মণ্য ও লৌকিক— দু'প্রকার ঐতিহ্যেই নিজেকে বিভাজিত করেছেন। আবার কোনো কোনো দেবতা— বিশেষত লক্ষ্মী, বৈদিক ও ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্য বাহিত হয়েও বাংলার বৃহত্তর লোকসমাজে লৌকিক ঐতিহ্য নিয়েই বিরাজিতা। এবং এই কারণেই বাংলা লোকসাহিত্যে লক্ষ্মীর প্রসঙ্গ বারংবার আসে। বহুল প্রচলিত এই দেবীর নৃতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটটি লক্ষ্য করার মত।

'লক্ষ্মী' নামটি ঋগ্বেদে একবার মাত্র পাওয়া যায় এবং তা সৌন্দর্য বোঝাতেই ব্যবহৃত। শ্রীকুমারের (১৬শ শতক) 'শিল্পরত্ন' গ্রন্থ বা বিভিন্ন মূর্তি থেকে দেখা যায় ষোড়শ শতকেও তিনি বিদ্যা, জ্ঞান ও সৌন্দর্যের দেবী বলে পূজিতা। বেদে সম্পদ অর্থাৎ ফসল কিংবা নদীর উর্বরা তটভূমির দেবী ছিলেন সরস্বতী। সরস্বতী শ্রী ও লক্ষ্মী, আবার বিষ্ণুপত্নী। শ্রী ও লক্ষ্মী,— সৌভাগ্য ও সৌন্দর্যের এই দেবীরা ক্রমে ক্রমে একীভূতা হয়ে সরস্বতীর সঙ্গে যেন গুণ ও বৈশিষ্ট্যসমূহ ভাগ ক'রে নিয়েছেন।

পুরাণে লক্ষ্মী মহর্ষি ভৃগু ও তৎপত্নী খ্যাতির কন্যা। আবার কখনো তিনি শিব-দুর্গার কন্যা। তিনি কখনো বিষ্ণু, কখনো কার্তিক, কখনো গণেশের পত্নী। তিনি সমুদ্র থেকে উত্থিতা; আবার বামনপুরাণে দেখা যায় বিষ্ণুই তাঁকে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর বিভিন্ন রূপ, বিভিন্ন নাম। রমা, কমলা, গজলক্ষ্মী, মহালক্ষ্মী, সিদ্ধলক্ষ্মী— ইত্যাদি বিভিন্ন নামে ও রূপে তিনি আরাধ্যা। দেবীর রূপ বিভিন্ন হ'লেও সব সময়ে তিনি পদ্মাসনা পদ্মহস্তা।

পুরাণ ও তন্ত্রে লক্ষ্মী ও সরস্বতী ছাড়াও বিষ্ণুর আর এক পত্নীর উল্লেখ আছে, তিনি বসুন্ধরা বা বসুধারা— অর্থাৎ পৃথিবী। ক্রমে বসুধারা ও লক্ষ্মী একীভূতা হন। ধান্যমঞ্জরী ও রত্নঘটধারিণী বসুধারা আসলে কৃষির দেবতা। ধান প্রধান কৃষিসম্পদ হওয়ায় লক্ষ্মীর হাতে এল ধানের মঞ্জরী; লক্ষ্মী হলেন ধান্যাধিষ্ঠাত্রী কৃষিদেবী। কৃষিপ্রধান দেশে কৃষিই হ'ল ঐশ্বর্য। সুতরাং এইভাবে লক্ষ্মী হয়ে উঠলেন ঐশ্বর্য ও সম্পদের দেবী।

লক্ষ্মী কৃষিদেবতায় রূপান্তরিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক কারণেই বৈদিক সংস্কার অপেক্ষা লৌকিক সংস্কারই তাঁর মধ্যে প্রবল হ'তে থাকে। বৃহত্তর কৃষক সমাজ ও নারীদের দ্বারা তিনি পূজিতা হ'তে আরম্ভ করেন। উল্লেখ্য ব্রাহ্মণ্য ধর্ম সংস্কার বা পূজার্চনায় নারীদের ভূমিকা ছিল না বললেই চলে। বৈদিক যুগের পরে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর সেই মর্যাদা ও ভূমিকা না থাকলেও, অন্ত্যজ শ্রেণীতে বা নিম্নবর্ণীয় বৃহত্তর লোকসমাজে নারীর অধিকার এবং জীবিকাক্ষেত্রে স্বচ্ছন্দ বিচরণ ছিল— তা কারোরই অবিদিত নয়।

আর সমাজ-সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের সাধারণ নিয়মেই পৃথিবীর যে কোনো কৃষিদেবীই লৌকিক ঐতিহ্যমণ্ডিতা হ'তে বাধ্য এবং এই ফসলের (এখানে ধানের) দেবীর সঙ্গে উর্বরাতন্ত্রের যোগও অনিবার্য। ফলে লক্ষ্মীর ক্ষেত্রে, সৃষ্টি হয় বিভিন্ন ব্রতানুষ্ঠান। লক্ষ্মীর কৃপা প্রার্থনা করার জন্য 'ষট্পঞ্চমী ব্রত' যথেষ্টই প্রাচীন— যা

পর পর ছ'বছর ধ'রে করতে হয়। বাংলাদেশে প্রতি বৃহস্পতিবারে লক্ষ্মীব্রত উদ্‌যাপিত হয়; গীত হয় লক্ষ্মীর পাঁচালি। লক্ষ্মীর ব্রতে আলপনায় যা যা আঁকা হয় তার মধ্যে অনেকগুলিই অনার্য লৌকিক ধর্মানুষ্ঠানের সংকেত বহন ক'রে।

আমরা পূর্বেই বলেছি লক্ষ্মীর সঙ্গে সঙ্গে পদ্ম সব সময়েই উপস্থিত। ভারতবর্ষের বিভিন্ন যুগের প্রাচীন মুদ্রাতে লক্ষ্মীর যে মূর্তি অঙ্কিত বা খোদিত আছে, সেখানেও লক্ষ্মীর সঙ্গে পদ্মের উপস্থিতি লক্ষ্য করার মত। তাইজন্য লক্ষ্মী পদ্মালয়া বা পদ্মা নামেও পরিচিতা। এ প্রসঙ্গে পদ্মের সঙ্গে মনসার মত কোনো কোনো দেবীর কথাও স্মরণযোগ্য; মনসাও 'পদ্মা' নামে পরিচিতা। সুতরাং বলাবাহুল্য যে 'পদ্ম' বিশেষ একটা প্রতীক। এর তাৎপর্য নির্ণয় করতে গিয়ে কেউ কেউ পৌরাণিক ও ঔপনিষদিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলেছেন যে পদ্ম হ'ল আকাশ, সমুদ্র, পৃথিবী ও সূর্য ইত্যাদির প্রতীক।[২২] কিন্তু সৃষ্টির সঙ্গে পদ্মের সম্পর্ক আছে। অগ্নি, ব্রহ্মা ইত্যাদি দেবতারা পদ্ম থেকে সৃষ্ট। মৎস্যপুরাণে আছে যে ব্রহ্মা পদ্মের উপরে বসে ঋষি, দেব ও মানব সৃষ্টি করেছেন। লক্ষ্মীও পদ্মসম্ভবা। আবার লক্ষ্মী হলেন প্রকৃতি। বিষ্ণু সূর্য বা শক্তি। তাহলে পুরুষ-প্রকৃতির তত্ত্বে লক্ষ্মীর পদ্মকে সঙ্গতভাবেই প্রকৃতি বা সৃষ্টির প্রতীক বলে ধরা যেতে পারে।

এছাড়া বেদ ও পুরাণে অনেক দেবদেবীই পদ্মযোনী বা পদ্মনাভ। যেমন অগ্নি পদ্মনাভ। কিন্তু পদ্ম, সহস্রদল, অষ্টদল, পদ্মচক্র, পদ্মযোনী— ইত্যাদি শব্দগুলি তন্ত্রধর্মের সঙ্গে ওতপ্রোত। মহাসুখ বা সৃষ্টির সঙ্গে পদ্মের যোগ গভীর। অন্যদিকে উর্বরতা-কেন্দ্রিক অনুষ্ঠানেও পদ্মপ্রতীক প্রায় সবসময়েই উপস্থিত।[২৩]

বেদের সময় লক্ষ্মী যখন কেবলমাত্র সৌন্দর্যের দেবী, তখন লক্ষ্মী বা তাঁর কৃপা মানুষ যাজ্ঞা করেছে বটে, কিন্তু শ্রী ও লক্ষ্মীর সঙ্গে পুষ্টি, কীর্তি, ঋণমুক্তি ও বহু সন্তানও কামনা করেছে। নারায়ণ-উপনিষদে আছে :

''শ্রিয়ং চ লক্ষ্মীং পুষ্টিং কীর্তিং চানৃণ্যতাং বহুপুত্রতাম্' (৬৩/৩)। উল্লেখ্য পৌরাণিক বা তৎপূর্ববর্তী যুগে মানুষের শতপুত্রের কামনা ছিল ঐকান্তিক। গোষ্ঠীজীবনে মানুষ অধিক সন্তান প্রত্যাশী ছিল। সুতরাং প্রাগুক্ত প্রত্যেকটি চাহিদা পূরণার্থে মানুষ দেবতা সৃষ্টি করেছে আর ক্রমে ক্রমে আর্য-অনার্যের সাংস্কৃতিক সংঘাতে এই সমস্ত দেবদেবীরা অনেকেই অন্যান্য দেব-দেবীর সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছেন। তাই লক্ষ্মী, শ্রী ও বসুন্ধরার সঙ্গে অন্বিতা হয়ে শেষ পর্যন্ত ফসল বা ধান্যের দেবীতে রূপান্তরিতা। এমনকি আদিতে লক্ষ্মীর যে সব বাহন ছিল, যেমন—হরিণ, ময়ূর, কূর্ম, হংস—সেগুলিও ত্যাগ করে অর্বাচীনকালে প্যাঁচাকেই বাহন হিসেবে পাকাপাকিভাবে স্বীকার করে নিলেন। সম্ভবত প্যাঁচা কোনো বৃহত্তর লোকগোষ্ঠীর কুলপ্রতীক ছিল কিংবা প্যাঁচা শস্য অনিষ্টকারী ইঁদুরের শত্রু ব'লে ধান্য রক্ষক হিসেবে লক্ষ্মীর বাহন হিসেবে থেকে গেল।[২৪]

অর্বাচীনকালে লক্ষ্মী স্থায়ীভাবে ধান্যের দেবীতে রূপান্তরিতা এবং আমাদের কৃষিপ্রধান দেশে তাই তিনি সম্পদেরও দেবী। যেহেতু কৃষি বা ধানের দেবী তাই

লক্ষ্মীর সঙ্গে উর্বরাতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহের মেলবন্ধন সহজেই ঘটল। সন্তান হোক আর ফসল হোক লোকগোষ্ঠীর কাছে উৎপাদনশীলতা বা প্রজনন-ই বড় কথা—যা উর্বরাতান্ত্রিক বিভিন্ন ক্রিয়াচার ও প্রতীক ব্যবহারের মধ্যে প্রকটিত।

আমরা আগেই বলেছি যে, ভারতবর্ষে আর্যদের ধর্মাচার নয়, সাংস্কৃতিক বিমিশ্রণ হেতু লৌকিক অনার্য ধর্ম-সংস্কারই শেষপর্যন্ত জয়ী হয়েছে। বেদের লক্ষ্মীও তার ব্যতিক্রম নন। বস্তুত বাংলার লোকসমাজে তাঁর পূজাচারে অনার্য সংস্কারই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাই আর্যদের ঘৃণিত অনার্য ব্রাত্যজনের ব্রতের মধ্যে; ব্রতের আলপনায় ব্যবহৃত উর্বরাতান্ত্রিক প্রতীক-সংকেতের মধ্যে—এককথায় কৃষিপ্রধান বাংলার বৃহত্তর লোকগোষ্ঠীর মধ্যে তিনি প্রবলভাবেই অস্তিত্ব সম্পন্না। প্রতি বৃহস্পতিবারের ব্রতানুষ্ঠান, আওনি-বাওনি, ভাদু টুসু—ইত্যাদি বিভিন্ন পরবের মধ্যে লৌকিক ঐতিহ্যমণ্ডিতা লক্ষ্মীকেই কম-বেশী খুঁজে পাওয়া যায়।

এর পাশাপাশি বাংলাদেশে অলক্ষ্মীর পুজো হয়। অবনীন্দ্রনাথ বলেছেনঃ "এই অলক্ষ্মীই হলেন অন্যব্রতদের লক্ষ্মী বা শস্যদেবতা। শাস্ত্র নিজেদের মা-লক্ষ্মীকে এই প্রাচীন লক্ষ্মীর স্থানে বসিয়ে অলক্ষ্মী নাম দিয়ে কুরূপা কুৎসিতা বলে এঁকে ছেঁড়া চুলে ও ঘরের আবর্জনার সঙ্গে বিদায় দিতে চাইলেন।[২৫] কিন্তু এটা মনে করা কঠিন যে, লোকগোষ্ঠীর নিজেদের দেবতাকে এভাবে বিদায় ক'রে তার স্থলে ব্রাহ্মণ্য সংস্কার-পুষ্ট দেবতাকে বসাবে। আমাদের ধারণা, সৌভাগ্য সম্পদের দেবী হিসেবে লক্ষ্মীকে যেমন বরণ করা হয়েছে তেমন বিপরীতক্রমে দুর্ভাগ্য অপনোদনের জন্যই অলক্ষ্মীর দেবী কল্পিত হয়েছে। এখানে লোকগোষ্ঠীর কাছে সহায়ক হয়েছে তাদের যাদুবিশ্বাস। যাদুবিশ্বাস ভিত্তিক ধ্যান-ধারণার বশবর্তী হয়ে দুর্ভাগ্য ও অ-মঙ্গলকে অলক্ষ্মীর মূর্তিতে কল্পনা ক'রে মানুষ তাকে জীবন থেকে বিতাড়িত করতে প্রয়াসী হয়েছে। অলক্ষ্মীর মূর্তি নির্মাণ ও তাঁর পূজাচারের বৈশিষ্ট্য লোকসমাজের যাদুভিত্তিক সংস্কারকেই স্মরণ করায়। দুর্ভাগ্যের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য অলক্ষ্মী-তোষণা ও তুষ্ট করে তাকে গৃহের বাইরে রেখে আসা খুবই স্বাভাবিক, যেমন বসন্ত রোগের দেবী শীতলাকেও পুজো ক'রে তাকে গৃহের বাইরে গ্রামের দূরবর্তী প্রান্তে কোনো গাছতলায় রেখে আসা হয়। বিশ্বাস এই যে দেবীর সঙ্গে অশুভও দূরীভূত হয়।

মৈমনসিংহ গীতিকার 'কাজল রেখা' পালায় লক্ষ্মীকোজাগর পূর্ণিমার রাত্রে মন্ত্রীর কথামত সূঁচ রাজা নকলরাণী ও কাজলরেখাকে পরীক্ষা করার জন্য আলপনা আঁকতে অনুরোধ করল। নকলরাণী আঁকল কাকের ঠ্যাং, বকের পায়ের ছাপ, সরষে রাখার পাত্র, ধানের ছড়া ইত্যাদি। কাজলরেখা যা যা আঁকে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য লক্ষ্মীর পদচিহ্ন, ধান, শিব, রক্ষাকালী, 'ডরাই ডাকুনী', 'জয়া-বিষহরী, বনদেবী আর 'পদ্মপত্রে আঁকে কন্যা লক্ষ্মী-নারায়ণ' বা ইন্দ্র, যম্ন দুর্গা ইত্যাদি দেবদেবী।

অন্ত্যজ সমাজ বা বৃহত্তর লোকসমাজে পালিতা নকল রাণীর প্রাগুক্ত ব্রতের আলপনায় কাকের ঠ্যাং, বকের পায়ের দাগ—ইত্যাদি আসলে সদর্থক যাদু ক্রিয়া ব্যতীত আর কী হতে পারে? এর সমর্থনে বলতে পারিঃ 'ব্রতের আলপনার বিসর্পিল

এবং ভাঙা-ভাঙা ছাপ-ছাপ রেখাগুলির আদি উৎস যে সেই শিকার কেন্দ্রিক জীবনচর্যারই সূত্রবাহী তাতে বিশেষ সংশয়ের অবকাশ থাকে না।' নদীর ধারে কাদার উপর পাখির পায়ের ছাপ শিকারের উদ্দেশ্যেই মানুষকে লক্ষ্য করতে হয়েছে। আবার সমালোচকের মতে, এই সমস্ত চিহ্ন শুভচিহ্ন বলে গণ্য হ'ত কেননা, গোলা উপচে শস্য পড়লে পাখিরা উড়ে এসে সেগুলি খুঁটে খুঁটে খায়।[২৬] পক্ষান্তরে কাজলরেখার আলপনার বিষয় লক্ষ্য করলে, তার মধ্যে যে আর্য-অনার্য সংস্কারের মেলবন্ধন ঘটেছে তা বলা যায়। নতুবা লৌকিক দেব-দেবীর সঙ্গে নারায়ণ ইন্দ্র— ইত্যাদি দেবতারা তার আলপনায় উপস্থিত হতেন না। এইভাবে লক্ষ্মী বাংলার বৃহত্তর লোকজীবনে নিজস্ব দেবতা হয়ে উঠেছেন। আর এই হেতু বাংলা লোকসাহিত্যের বিভিন্ন প্রকরণে তাঁর স্বচ্ছন্দ ও অনিবার্য উপস্থিতি।

লোকধর্ম নিরপেক্ষ লোকসাহিত্য, ধর্ম ও দেব-দেবী প্রসঙ্গ :

এবারে লোক ধর্ম বা ধর্ম নিবপেক্ষ বাংলা লোকসাহিত্যেব মধ্যেও লোকধর্ম ও সেই প্রসঙ্গ কি ভাবে ছড়িয়ে আছে তা লক্ষ্য করা যেতে পারে। প্রথমে লোকসঙ্গীতের কথাই ধরা যাক :

অ। পুরুষ—ওহে, প্রিয়ে, তুমি হইবে বৈষ্ণবী,
মিছে হায় বালা, হবি গৃহত্যাগী,
নবদ্বীপে যাবি, কত শিষ্য পাবি,
কত গরবে বসিবি ওলো রাই।।...[২৭]

(লৌকিক পাঁচালী)

—এতে বৈষ্ণব ধর্ম প্রসঙ্গ। এইভাবে এই গানটিতেই হরি, কৃষ্ণ, মহাদেব, নারদ প্রভৃতি প্রসঙ্গ এসেছে।

আ। 'লবের দিন পূজিত হল, ষষ্ঠী পূজা নিত হল পূজা করলেন নারায়ণ।'

'নারদ বলে, গিরিধর, শিব নিন্দা করোনা বারংবার...'
—ষষ্ঠী, নারায়ণ, নারদ ও শিব প্রসঙ্গ। (বালার্কি)

ই। 'একদিন সত্য পীর মনেতে ভাবিয়া।
সিন্ধু রাজার দেশে আমি পূজা নিব গিয়া।।

দেড় টাকার সিন্নি দোব একমন হইয়া।

(পটুয়ার গান)

—সত্যপীর ও সিন্নির প্রসঙ্গ।

ঈ। '..........আশ্বিনে অম্বিকা পূজা আনন্দিত মনে
অবশ্য আসিবেন কৃষ্ণ অষ্টমীর দিনে
কার্তিকে কালিয়ার রূপ ধরেছিলেন হরি
আয়ানের ভয়ে কৃষ্ণ কালী পূজা করি।'

বা—

(মাগো) কার্তিক মাসে কার্তিক পূজা কর কারে লইয়া,
তোমার কন্যার দিন যে যায় কান্দিয়া কান্দিয়া।'

(বারমাস্যা)

উ। 'সখি দ্যাখ দ্যাখ বেলা হল গগনে
সখি, চল যাই গঙ্গা বরণে।

আমি ভরব জল করব পূজা দিব চরণে
সখি, চল্ যাই গঙ্গা বরণে।'

(বিবাহের গান)

বিয়ের আগে বর-কনের কল্যাণ কামনায় বিভিন্ন লৌকিক দেব-দেবীর পুজো করা হয়, ফরিদপুরে এ ক্ষেত্রে গঙ্গাদেবীর পুজো করা হয়। ধর্ম-নিরপেক্ষ এমন অজস্র গানে প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে ধর্ম অনুষঙ্গের উপস্থিতি; কাজেই আরো দৃষ্টান্ত উপস্থিত করার প্রয়োজন আছে ব'লে মনে হয় না। শুধু লোক-সঙ্গীত নয়, ছড়া ধাঁধা, প্রবাদ, বিভিন্ন লোককথা ইত্যাদি লোকসাহিত্যের অন্যান্য আঙ্গিকগুলিতেও ধর্ম-অনুষঙ্গ ও দেব-দেবীর প্রসঙ্গ এমন ভাবে বারংবার এসেছে। এবার সেই আলোচনায় প্রবিষ্ট হওয়া যাক।

ধাঁধা-প্রবাদ-ছড়া ও লৌকিক ধর্ম :

আমরা দেখেছি লৌকিক ধর্মের সঙ্গে বিভিন্ন লোকসঙ্গীতের সম্পর্ক ওতপ্রোত; কেননা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই সমস্ত দেব-দেবীর বন্দনা করতে গিয়ে গানগুলির সৃষ্টি হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবার এই সমস্ত পূজানুষ্ঠানকে কেন্দ্র ক'রে মানুষ তার সুখ-দুঃখ প্রকাশের অবকাশ পেয়েছে এবং গান রচনা করেছে— যেগুলি বস্তুত ধর্মনিরপেক্ষ বটে, তথাপি পরোক্ষভাবে ঐ সমস্ত অনুষ্ঠানই গানগুলির উৎস। মনসা, বনদুর্গা, শিব, ইতু, ঘেঁটু, শীতলা, ওলাইচণ্ডী, বনবিবি, দক্ষিণরায়—ইত্যাদি বিভিন্ন লৌকিক দেব-দেবী কিংবা গাজন, চড়ক, বাঁধনাপরব, বাস্তুপুজো, বিভিন্ন ব্রতানুষ্ঠান বা এই জাতীয় পালা-পার্বণকে কেন্দ্র ক'রে প্রত্যক্ষভাবে যেমন বহু ধর্মকেন্দ্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ লোকসঙ্গীতের সৃষ্টি হয়েছে, তেমন বিবাহেরগান, পটুয়ারগান, বারমাস্যা, বালার্কি— ইত্যাদি ধর্মনিরপেক্ষ ব্যবহারিক অনুষ্ঠানের গানেও লৌকিক দেব-দেবীর প্রসঙ্গ স্বচ্ছন্দে উপস্থিত হয়েছে—পূর্বে আমরা তার কতিপয় দৃষ্টান্ত দিয়েছি। এছাড়া বিভিন্ন প্রেমসঙ্গীত— যেমন ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি, বিভিন্ন শস্য ও উর্বরাতান্ত্রিক অনুষ্ঠানের সঙ্গীত (যেমন ভাদু-টুসুর গান) পীর-দরবেশ কৃষ্ণ কেন্দ্রিক জাগ্‌গান, জাগরণ গান— লোকসঙ্গীতের এমন বিভিন্ন দিকেই

আমরা লৌকিক দেব-দেবীর উল্লেখ পাব।

লৌকিক ধর্ম তথা পুজো-পার্বণ যেমন লোকসঙ্গীতের একটা বিপুল ভাণ্ডার সৃষ্টি করেছে, প্রবাদ-প্রবচন ও ধাঁধার ক্ষেত্রে তা বলা যায় না। তথাপি বিভিন্ন লৌকিক দেব-দেবীকে নিয়ে ধাঁধা রচিত হয়েছে বা কোনো কোনো প্রবাদ-প্রবচনে এই সমস্ত দেব-দেবীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য উপজীব্য হয়েছে। কিংবা প্রসঙ্গত এঁদের উল্লেখ পাওয়া গেছে যা নেহাৎ কম নয়। বস্তুত ধাঁধা প্রবাদের উৎসগত দিকটির সঙ্গে মানুষের অবসর বিনোদন, কবিত্ব ও ব্যবহারিক প্রয়োজনের অন্বয়ই প্রধান— সেখানে দেব-দেবীদের স্থান সংকুলান হয় না। তৎসত্ত্বেও এই সমস্ত লৌকিক দেব-দেবী বা ধর্ম অনুষঙ্গ বহু ধাঁধা প্রবাদে খুব সহজ ভাবেই এসেছে। যেমন:

প্রবাদ প্রবচনে ধর্ম প্রসঙ্গ ও ধর্ম-অনুষঙ্গ :

বৈষ্ণব প্রসঙ্গ :

তিলক কাটলেই বৈষ্ণব হয় না।
দু'দিনের বৈষ্ণবী ভাতেরে কয় পরসাদ।
মালা ঘোরালেই বৈষ্ণব হয় না।

কৃষ্ণ প্রসঙ্গ :

কষ্ট ছাড়া কেষ্ট মেলে না।
শ্যাম রাখি কি কুল রাখি।
বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ, তর্কে বহু দূর।
ইষ্ট যেই কৃষ্ণ সেই, দুয়ে কিছু ভেদ নাই।

মনসা প্রসঙ্গ :

ঢাকের দায় মনসা বিকায়।
একে মা মনসা, তায় ধুনোর গন্ধ।

শিব প্রসঙ্গ :

ধান ভানতে শিবের গীত।
শিবের খোঁজ নেই, গাজনের ঘটা।
শিব গড়তে বানর গড়া।
মায়াযুক্ত জীব, মায়ামুক্ত শিব।
বিপদে শিবের গোঁড়া, সম্পদে শিবতো নোড়া।

ব্রত প্রসঙ্গ :

বড় দেবতা কলা পায় না, সুবচনীর কুতকুতি।
মূল দেবতার পূজা নাই, সুবচনীর ঘটা।
সকলে যদি ব্রত করে নৈবেদ্য খাবে কে?
সকল ব্রত করলে যশী, বাকি আছে ভীম একাদশী।

চণ্ডী প্রসঙ্গ :

হাঁড়ি-ঝি চণ্ডীর আজ্ঞা।
চার কড়ার চাটাই নেই, চণ্ডীমণ্ডপে বসা।

লক্ষ্মী প্রসঙ্গ :

হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা।
গৃহিনী লক্ষ্মীরূপিনী, বাম হ'লে কাল ভুজঙ্গিনী।
আচারে লক্ষ্মী বিচারে পণ্ডিত।
জাগরণে লক্ষ্মীর কৃপা, নিদ্রায় লক্ষ্মী হন বিরূপা।
আসেন লক্ষ্মী দোলায় চড়ে, কুলার বায়ে বালাই ওড়ে।

তুলসী প্রসঙ্গ :

তুলসীগাছে কুকুর মুতে, তবু পূজা হয় জগতে।
তুলসী তলায় দিয়ে বাতি, পুরানো পাপী হলেন সতী।
যেখানে তুলসীবন, সেখানে বৃন্দাবন।
তুলসী বনের বাঘ।

পীর প্রসঙ্গ .

নামাজ রোজার ঠনঠনি, রাত দিন করে পীরের সিন্নি।
পীরের কাছে মামদোবাজী।
তোমার পীর সিন্নি খেয়েছে।
যার নাই পীর তার নাই শির।
একে নবা সত্যপীর, পরকে তরাবেন কি, নিজেই অস্থির!

ধর্ম-কর্ম :

দেখাদেখি ধর্ম, শিখাশিখি কর্ম।
ধর্মের কল বাতাসে নড়ে।
যে করে ধর্ম, তার হয় কর্ম।
যে করবে ধরম করম তার মাথাতেই বাঁশ মারণ।
ধর্মের ঢাকে কাঠি দেওয়া।

দেবতা :

তেত্রিশ কোটি দেবতা।
দেবতা বুঝে নৈবেদ্য।
পুজলে দেবতা ছাড়লে ভূত।
রোগ হলে দেবতার দোহাই।

ধর্ম সংক্রান্ত অন্যান্য প্রসঙ্গ :

ঘণ্টা বাজিয়ে দুর্গোৎসব, ইতুপূজায় ঢাক।
উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ।
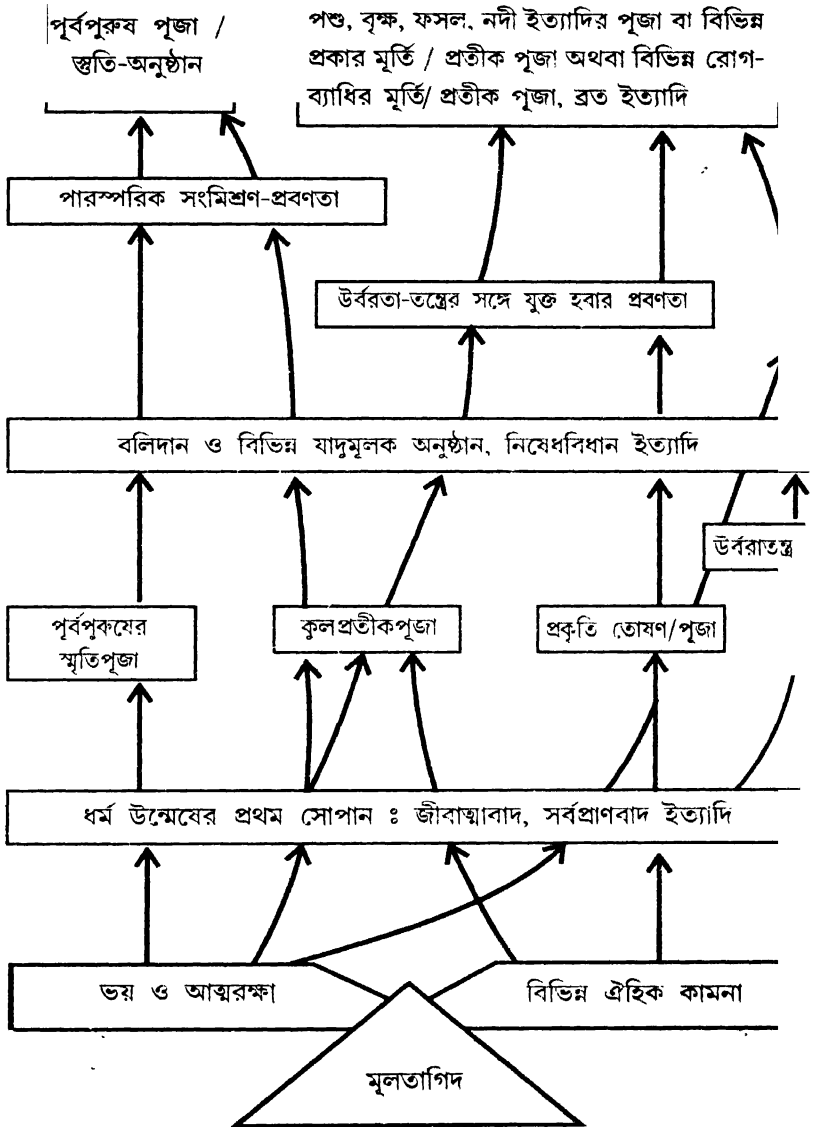
সাধারণভাবে দেব-দেবীর উৎস, বিকাশ ও পরিণতি
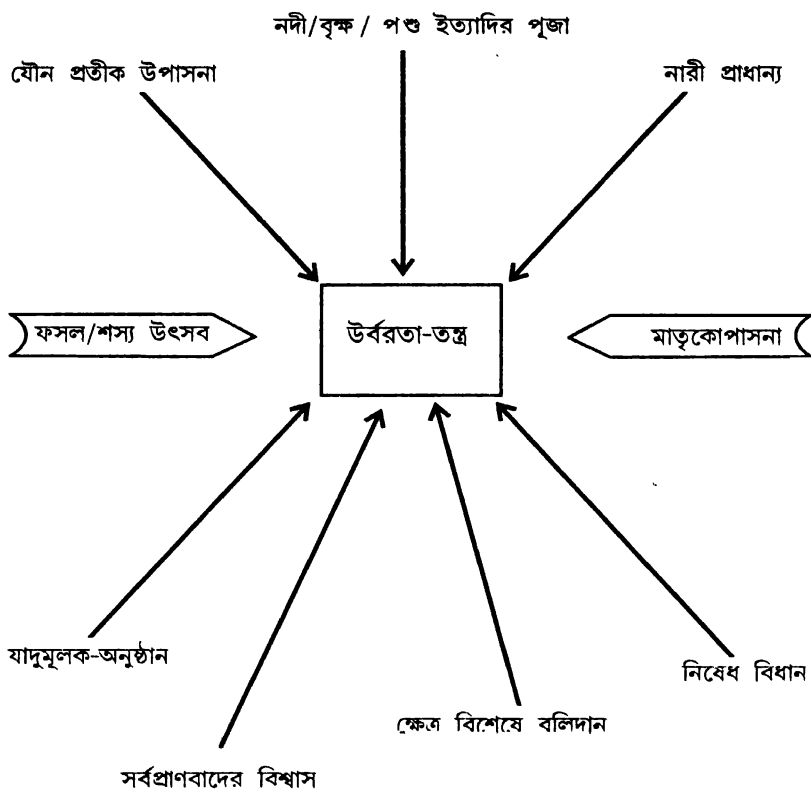
মূলধারা ঃ
সহায়ক ধারা ঃ ⟶

উর্বরতা-তন্ত্র ঃ বিচিত্র ঐতিহ্যের সমন্বয়

অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট।
ভক্তিহীন ভজন, লবনহীন ব্যঞ্জন।
বার মাসে তের পার্বণ।
হিন্দুদের দুগ্‌গা পুজো, উপরে চিকন-চাকন, ভিতরে খড়ের বুজো।
জগন্নাথ দেখতে পুঁই মাচা দেখা।
সকল নোড়াই যদি শালগ্রাম হয়, তবে হলুদ বাটি কিসে?
মানি তো শালগ্রাম, না মানিতো নুড়ি।

আমরা অন্যত্র আলোচনা করেছি যে, শুধু অবসর বিনোদন নয়, ধাঁধার আনুষ্ঠানিক বা আচরণগত মূল্যও যথেষ্ট। প্রাচীনকাল থেকেই পৃথিবীর বিভিন্ন ব্যবহারিক জীবনে ধাঁধা বিশেষ গুরুত্ব পেয়ে এসেছে। যাদুমূলক ক্রিয়াচারের ক্ষেত্রেও ধাঁধার অপরিহার্যতার বিষয়টি বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। এখনো বাংলার বিভিন্ন ধর্মীয় আচারমূলক অনুষ্ঠানে যেমন মনসার আচার অনুষ্ঠানে, শিবের গাজনের অনুষ্ঠানে, পৌষপার্বণের অনুষ্ঠানে, কোনো কোনো ব্রতকথা ও ব্রতের অনুষ্ঠানে ধাঁধার উপস্থিতি অনিবার্য। বিবাহ বা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুষ্ঠানের মত এখানেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রশ্নোত্তর-মূলক ধাঁধার ব্যবহার আছে। যেমন শিবের গাজনে সন্ন্যাসীরা প্রশ্নোত্তর-মূলক যেসমস্ত ধাঁধা বলেন, তার একটি দৃষ্টান্ত :

বাঁধন : শুন হে সন্ন্যাসী তোমরা আমার বচন।
নারায়ণের কথা কিছু করি জিজ্ঞাসন।।
কোন্ সময়ে নারায়ণের তিনখানি পা হল।
এই কথাটি দশের মাঝে প্রকাশ করে বল।।

কাটন : শিব নামে ডঙ্কা মেরে শিব নাম গাই।
শিবের নাম স্মরে তোমার জবাব দিয়া যাই।
বলিরে ছলিতে হরি হইলেন বামন।
তিনপদ ভূমি চান প্রভু বলির সদন।।
দানে মত্ত বলি রাজা দেন ভূমি দান।
তিন পা ধরেন হরি রাখিতে দেবের মান।।
সত্য যুগের কথা ইহা কহিলাম নিশ্চয়।
সংক্ষেপেতে কহিলাম শুন পথিক ভাই।। ইত্যাদি।

আবার অন্যান্য বিষয়কে উপজীব্য ক'রে রচিত ধাঁধার মধ্যেও দেব প্রসঙ্গ দুর্লভ নয় :

১. একটুখানি জলে / কালী ঠাকুর দোলে। (উত্তর : শেওলা)
২. থপ থপ থপিয়ে যায় / লক্ষ্মী প্রদীপ জ্বেলে যায়,
জোড় কুলো পাছুরে যায় / জোড় শঙ্খ বাজিয়ে যায়
ঢোঁড় সাপ খেলিয়ে যায়। (উত্তর : হাতী)
৩. শিব নয় শিঙ্গী বাজে / বাঘ নয় মানুষ খেকো। ইত্যাদি

(উত্তর : মশা)

ধাঁধায় দেবদেবী বা ধর্ম প্রসঙ্গ :

শিব :

ভূত নয় ভূত সাথে করেন ভ্রমণ।
কখনো যোগীবেশ কখনো ব্রাহ্মণ।।

শালগ্রাম-শিলা :

হস্তপদ নাহি দেহ কুষ্মাণ্ড আকারী।
পৈতা কেহ নাহি দেয় তবু পৈতাধারী।।
চন্দনে চর্চিত কৃষ্ণ অঙ্গ পুষ্পময়।
মহারাজা নয় কিন্তু সিংহাসনে রয়।।
ভক্ষ্যপানি নাহি চায় তবু খাদ্য দেয়।
আশিস না করে কারে প্রণমিলে তায়।।

শিব, সাপ ও বলদ :

একের গমনে তিনের গমন।
ছয় পদ উনিশ নয়ন।।
বল সে হয় কোন জন।
তার সাথে কে বা দু'জন।।

কানাই :

তিনটি বর্ণে নামটি তাহার / তারে সবে দেবতা কয়।
প্রথম দুই বর্ণে এক চক্ষু / শেষ দুয়ে শূন্য বোঝায়।।

তুলসীগাছ :

বাগানেতে অনেক গাছ / ফুল ফোটে তার বার মাস
ফুলটি লাগে না কাজে / পাতাটি লাগে ভালো কাজে।
শাপ দিলেন ভগবান, / জল পায় বারমাস।।[২৮]

বাংলা ছড়া ও ধর্মপ্রসঙ্গ :

আমরা জানি যে, লোকসাহিত্যের বিভিন্ন প্রকরণের মধ্যে ছড়া এমনই একটি আঙ্গিক যেখানে সামগ্রিকভাবে একটি জাতির জীবনাচরণের প্রায় সব দিকগুলির প্রতিফলন ঘটে। একটি জাতির শিল্পীসত্তা ও তার কবিমন, লুপ্ত ইতিহাস, জীবনসংগ্রাম, সমাজ-ভাবনা ও পারিবারিক সম্পর্ক এবং তার সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, ধর্মজীবন— এমন গোটা জীবনটিই কেবল ছড়ার মধ্যে থেকে আমরা খুঁজে নিতে

পারি। আর এই কারণেই সমাজ-সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানীর কাছে ছড়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

বক্ষ্যমাণ অংশে আমরা দেখব বাঙালীর বিভিন্ন লৌকিক দেব-দেবী, ধর্মভাবনা, ও ধর্মানুষঙ্গ কীভাবে ছড়ার মধ্যে বিধৃত আছে। যেহেতু অবরোহী পদ্ধতি আমাদের অবলম্বন, তাই আমাদের পর্যালোচনা আসলে বিপরীত দিক থেকে। অর্থাৎ বলতে পারি, বাংলা লৌকিক ছড়ার একটি বৃহত্তর অংশের উপাদান অনিবার্যতই বাঙালীর ঐ দেব-দেবী এবং এই অনুষঙ্গেই বিপুল পরিমাণ বাংলা লৌকিক ছড়া সৃষ্টি হয়েছে। বাংলা ছড়ার এই উপাদানগুলি নিম্নরূপ :

দেব-দেবী প্রসঙ্গ :

শিব :

বাংলা ছড়ায় শিবের বহুল উপস্থিতি। প্রথমেই তিন কন্যা সংক্রান্ত ছড়াগুলির কথা উল্লেখ করতে হয়, যেখানে শিব দেবতা নন মানুষ, কখনো শিব সদাগরঃ

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান,
শিব ঠাকুরের বিয়ে হ'ল তিন কন্যে দান।..[১২]

কিংবা—

এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা তার মাইদ্দে চর,
সেইখানেতে বস্যা আছেন শিব সদাগর।
শিব গ্যালেন শ্বশুরবাড়ী বইস্‌তে দিলো পিড়া,
জলপান করিতে দিলো শালিধানের চিড়া।...

কিন্তু নিম্নলিখিত ছড়ায় যে শিবের উল্লেখ, তিনি মহাদেব· গাজনের শিবঃ

আদা কাটি কুচুর কুচুর রক্ত পড়ে ধারে।
শিবঠাকুরের কোটনা কাটি, মহাদেবের ঘরে।
মহাদেব, মহাদেব, এবার বড় খরা,
আর বচ্ছর নাল বুনাবো শ্যাওড়া গাছতলা।।

আবার শিশুর নৃত্যের ছড়াতেও স্বতঃস্ফূর্তভাবে শিব ও অন্যান্য দেবতার উল্লেখ :

'শিব নাচে ব্রহ্মা নাচে আর নাচে ইন্দ্র।
গোকুলে গোয়ালা নাচে পাইয়ে গোবিন্দ।।"

কখনো আসে শিবের গাজনের প্রসঙ্গ :

'আমরা দুটি ভাই, / শিবের গাজন গাই।
একটি করে পয়সা পেলে, / দক্ষিণে চলে যাই;' ..

ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর বাংলার লোকসাহিত্য (২য় খণ্ড) গ্রন্থে মৈমনসিংহ জেলায় পৌষমাসে ব্যাঘ্রদেবতা 'বাঘাই' বা 'বাঘাইর বয়াত' এর পুজোর কথা বলেছেন। এই পুজো উপলক্ষে রাখাল বালকেরা যে ছড়া কাটে, তার অংশবিশেষ :

লৌকিক দেবদেবী/ উৎসব-অনুষ্ঠান		মূল উৎস		বিকাশ/মিশ্রণ		পরিণতি
বেশিরভাগ ব্রত ও ব্রতানুষ্ঠান	→	যাদু + উর্বরাতন্ত্র	→	x	→	x
মনসা	→	প্রকৃতিপূজা + কুলকেতুর পূজা	→	উর্বরাতন্ত্র	→	মিশ্র
বনদুর্গা	→	প্রকৃতিপূজা	→	কুলকেতুর পূজা	→	উর্বরাতন্ত্র
হোলিউৎসব	→	উর্বরাতন্ত্র	→	x	→	x
গাজন	→	উর্বরাতন্ত্র	→	x	→	x
শিব	→	উর্বরাতন্ত্র	→	x	→	x
শীতলা	→	প্রকৃতিপূজা	→	উর্বরাতন্ত্র	→	মিশ্র
বসন্তরায়	→	প্রকৃতিপূজা	→	উর্বরাতন্ত্র	→	মিশ্র
বনবিবি	→	প্রকৃতিপূজা	→	x	→	x
ঢেলাইচণ্ডী	→	প্রকৃতিপূজা	→	x	→	x
ভাদু	→	শস্যউৎসব	→	উর্বরাতন্ত্র	→	মিশ্র
টুসু	→	শস্যউৎসব	→	উর্বরাতন্ত্র	→	মিশ্র
অম্বুবাচীর অনষ্ঠান	→	উর্বরাতন্ত্র	→	x		x

কতিপয় লৌকিক দেবদেবীর উৎস, বিকাশ ও পরিণতি

"... আমিত মাগিয়া খাই।
'বাঘাইর বয়াত' গাই।।
বাঘাই গেছে নাগাইপুর।
আমার বাড়ি মথুরাপুর।।"

ইনি আবার কোথাও কোথাও কলুই ঠাকুর বা কুলমাণিক; তাঁকে নিয়েও বহু ছড়া আছে। যেমন— "আলুর পাতার ঠালুর ঠুলুর, দাঁত মড়াইতাম ছাই, / আঁত্তি আইরে ঘোড়া আইরে কুল মাণিকের ভাই।"

লক্ষ্মীপ্রসঙ্গ :

পৌষমাসে লক্ষ্মীর নামে মাগন সংগ্রহ করতে গিয়ে মুসলমান বালকেরা যে ছড়া কাটে তাতে হিন্দুর লক্ষ্মী শিব ইত্যাদির উল্লেখ—

'কাল তুলসী কাল তুলসী, চিরল চিরল পার,
ধান দাও ধান দাও লক্ষ্মীর হার।
ধান দিতে সিকি নড়ে, ঝুরঝুরিয়ে টাকা পড়ে।
এক টাকা পাইরে; বেনের বাড়ী যাইরে।
বেনের বাড়ী ঘুঘুর বাসা, তা দেখতে লাল্‌তে বাসা।
বল ভাই শিব, এক কাঠা চাল দশটা বড়ি নিব।'

পৌষ সংক্রান্তির মাগনের ছড়া :

"আইয়োরে ভাই অরুণে। / লক্ষ্মীদেবীর চরণে।।
লক্ষ্মীদেবী দিলান্ বর। / ধান কড়িটি বাইর কর।। ..."

বিবাহের অধিবাসের ছড়াতেও লক্ষ্মীর উপস্থিতি—

"... দাদার আছে ভাইয়া বলদ আমার আছে গাই।
দুই বোনে যুক্তি করে লক্ষ্মীপুর যাই।
লক্ষ্মী দিল ধান দূর্বা, মালি দিল ফুল।
এমন খোঁপা বেঁধে দেবো হাজার টাকা মূল।।"

ঘুমপাড়ানি ছড়াতেও লক্ষ্মী-নারায়ণের সাক্ষাৎ পেতে অসুবিধে হয় না—

"আয় ঘুম যায় ঘুম বর্গী এ'ল দেশে।
চড়াই পাখী ধান খেয়েছে খাজনা দিব কিসে।।
কিসের মাসি কিসের পিসি কিসের বৃন্দাবন।
মরা গাছে ফুল ফুটেছে লক্ষ্মী নারায়ণ।।..."

জঙ্গলীপীর :

ময়মনসিংহের জঙ্গলীপীর হলেন জঙ্গলের অধিপতি; বনবিবি ইত্যাদি লৌকিক

দেবতার মত তিনি আসলে sylvan god। তাঁকে নিয়েও ছড়া রচিত হয়—

'ছত্তর ছত্তর জংলী পীরের ছেলে আইল বাড়ীর ভিতর,
জংলী পীরের ছেলে দেখ্যা যেবা করে হেলা,
তার দুইটি চোখ খায় ঠিক দুপাইরা বেলা।...'

ধর্মঠাকুর :

ধর্মঠাকুরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন নাম। বাঁকুড়ার জাড়াগ্রামে তিনি কালুরায় বলে পূজিত হন। ছেলেভুলানো ছড়ায় তিনি স্বচ্ছন্দে উপস্থিত হয়েছেন—

'হাঁসা ঘোড়া জামা জোড়া উত্তম পাগুড়ি।
জাড় গাঁয়েব কালুরায় দিগুড়েতে বাড়ী।

ষষ্ঠীঠাকুর :

ষষ্ঠীর কৃপায় সন্তান জন্মলাভ করে; সন্তানের মঙ্গল-অমঙ্গল তাঁর আশীর্বাদের উপরেই নির্ভরশীল বলে লোকসমাজের বিশ্বাস। রবীন্দ্রনাথ সংগৃহীত নিম্নোদ্ধৃত ঘুমপাড়ানি ছড়ায ঘুমন্ত শিশুটিই যেন ষষ্ঠীঠাকুর :

'ঘুমতা ঘুমায় ঘুমতা ঘুমায় গাছের বাকলা।
ষষ্ঠীতলায় ঘুম যায় মস্ত হাতি ঘোড়া।।
ছাই গাদায় ঘুম যায় খেঁকি কুকুর।
খাট পালঙে ঘুম যায় ষষ্ঠীঠাকুব।।
আমাব কোলে ঘুম যায় খোকামণি।।

মেলেনী ঠাকুরাণী/ঘণ্টাকর্ণ, ঘাঁটু বা ঘেঁটু·

এঁরা খোস-পাঁচড়া ইত্যাদি রোগের দেবতা। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে এই জাতীয় রোগ প্রাদুর্ভূত হ'লে এঁদের পুজোতে মন্ত্র হিসেবে ছড়া আবৃত্তি হয়—

'হাত চুলকায় পা চুলকায় চুলকায সব গা।
চুলকাতে চুলকাতে মেলেনী ভাটু পাড়ায় যা।।
ভাটু থেকে এসে মেলেনী উজান করলেন থানা।
নব লোকের পূজার সময় পট পটানির মানা।।
মা মেলেনী পূজরে।' — (মুর্শিদাবাদ)

ঘাঁটুর ছড়ার অংশবিশেষ—

'.চৈত্র মাসের চতুর্দশী।
ঘাঁটুর কপালে চন্দন ঘষি।।
ঘষতে ঘষতে পড়ল ফোঁটা।
একা ঘাঁটুর সাত বেটা।।' (নদীয়া)

গোরক্ষনাথ ঃ

এই দেবতা নাথগুরু গোরক্ষনাথ নন। ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট, ঢাকা প্রভৃতি অঞ্চলে গো-জাতির রক্ষক হিসেবে এই দেবতা পূজিত হন। একুশ দিন পর নবপ্রসূত

গাভীর দুগ্ধ প্রথম দোহন ক'রে, সেই দুধ দ্বারা নির্মিত নাড়ু পুজোর নৈবেদ্য। সকলে গোরক্ষনাথেব পুজো উপলক্ষে সমবেতভাবে যেসব ছড়া আবৃত্তি করে নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটি তারই একটি দৃষ্টান্ত—[৩০]

'আইলেন গোরক্ষনাথ। ... হেঁচ্চ (সকলে)
বইলেন ঘাটে।
চরণ ধুইলাইন্ ঘটের জলে।
কও সকলে শ্যামসুন্দর।
রণা রণা ফুলকা রণা।
ফুলের কড়ি।'...

পৌষ মাসের সংক্রান্তিতে হালের দেবতা 'হালইর' এবং বাস্তুদেবতার পূজানুষ্ঠান হয়। এইসব দেবতাদের নিয়েও ছড়া কাটা হয়—

'শামুক খোলা শামুক খোলা — হালই
আমরা কয়টি ঝিপুত পোলা — হালই
জাড়েতে কষ্ট পাই — হালই
দেও ধান নিয়ে যাই — হালই

অথবা বাস্তুদেব—

'ও গিরী, ও গিরী (গিরী<গৃহকর্ত্রী)
বার করে দাও সোনার পিঁড়ি
সোনার পিঁড়িতে বসবে কে ?
বাস্তু ঠাকুর এসেছে।...'

—এমন বিভিন্ন লৌকিক দেব-দেবীকে উপজীব্য ক'রে বহু বাংলা লৌকিক ছড়ার সৃষ্টি হয়েছে অথবা প্রাসঙ্গিকভাবে এমনকি প্রসঙ্গ বহির্ভূত হয়েও বিভিন্ন লৌকিক দেব-দেবী ছড়ার মধ্যে নিজের জায়গাটি ক'রে নিয়েছেন। আর দৃষ্টান্ত না বাড়িয়ে এবারে আমরা 'ব্রত' প্রসঙ্গে আসি।

'কৃষি ও উর্বরাতন্ত্র' শীর্ষক পরিচ্ছেদে আমরা বলেছি যে ব্রত অনুষ্ঠান শুধু পূজানুষ্ঠান নয়— উর্বরাতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা ও মূলত অনুকৃতিমূলক যাদুর মিশ্র রূপ মাত্র। বিভিন্ন লৌকিক দেব-দেবী, যেমন ইতু, ওলাইচণ্ডী, ঘণ্টাকর্ণ কুলুইঠাকুর, মনসা, বনবিবি, রালদুর্গা, —এমন বহু দেব-দেবীকে কেন্দ্র ক'রে যেমন ব্রতানুষ্ঠানগুলির সৃষ্টি হয়েছে তেমন প্রত্যক্ষভাবে বিভিন্ন ফসল বা শস্য উৎসবকে কেন্দ্র ক'রে ভাদুলীব্রত, তুঁষতুষলীব্রত ইত্যাদির সৃষ্টি। কিংবা অন্য ঐহিক প্রয়োজনে, যেমন বৃষ্টি আবাহনমূলক 'বসুধারা' ব্রত বা দীর্ঘ ও স্বচ্ছন্দ জীবনের জন্য ভাইফোঁটার ব্রত, যমপুকুর ব্রত— ইত্যাদি বিচিত্র ব্রতের সৃষ্টি হয়েছে। এমনকি হিন্দুর পবিত্র 'তুলসী' গাছকে নিয়েও 'তুলসীব্রত' গ্রাম বাংলায় উদ্‌যাপিত হয়। সুতরাং বৃহত্তর দৃষ্টিকোণ থেকে ব্রতকে বাঙালীর ধর্মীয় জীবনের সঙ্গে অন্বিত করে দেখতেই হয়; ব্রত নিঃসন্দেহে বাঙালীর

লৌকিক ধর্ম সাধনার অঙ্গ। মনসা ছাড়া প্রায় সব ব্রতের অনুষ্ঠানে ছড়া, মন্ত্র হিসেবে আবৃত্তি হয়। ব্রতের দেব-দেবীকে উদ্দেশ ক'রে ছড়াগুলি আবৃত্তি হ'লেও এগুলির মধ্যে বাঙালীর,— বিশেষত বাঙালী নারীর সুখ-দুঃখ হাসি-কান্না বা তাদের বিভিন্ন আশা-আকাঙ্ক্ষার কথাই ব্যক্ত হয়। কখনো আবার এই সমস্ত ছড়ায় দেবতাদের নামগন্ধও থাকে না; দেব-নিরপেক্ষ সেই সব ছড়া সমাজ ও ব্যক্তি জীবনের প্রতিচ্ছবি। এগুলির মধ্যে তাদের বিভিন্ন আকাঙক্ষাই প্রকটিত হয়। তাই এই সমস্ত ছড়া বাংলা লোকসাহিত্যের অমূল্য ঐশ্বর্য। দেব-দেবী নিরপেক্ষ এই প্রকার ব্রতের ছড়া প্রসঙ্গে তাই সমালোচকের মন্তব্য হ'ল এই যে, 'অনেক ছেলেভুলানো ছড়া' ব্রতের ছড়া থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। উল্লেখ্য, অসংলগ্নতা থাকলেও বেশিরভাগ ছেলেভুলানো ছড়াও মানুষের আশা-আকাঙক্ষা বা আনন্দ-বেদনার প্রচ্ছন্ন প্রকাশে অনবদ্য।[৩১] এবার দু'একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা যাক :

(ক) দেব-দেবীকে উদ্দেশ ক'রে ব্রতের ছড়া :

মঙ্গলচণ্ডী :

"সোনার মঙ্গলচণ্ডী রূপোর বালা,
কেন মা মঙ্গলচণ্ডী এত বেলা?
হাস্‌তে খেল্‌তে পাটের শাড়ী পরতে,
সোনার দোলায় দুল্‌তে শাঁখা শাড়ী পরতে।..."

মাঘমণ্ডল (সূর্যদেব) :

'উঠ উঠ সূর্য ঠাকুর ঝিকি মিকি দিয়া,
না উঠিতে পারি আমি শিশির লাইগা।
শিশিরের পঞ্চবাটী শিয়রে থুইয়া,
সূর্য উঠবেন কোনখান দিয়া?...'

কুলদেবতার প্রতি : (সেঁজুতিব্রত)

"আতা পাতা কুল দেবতা,
সিঁথেয় সিঁদুর পায়ে আল্‌তা।
নাট মন্দির বাঙ্গলা যোড়া,
দোরে হাতী বাইরে ঘোড়া,
দাসদাসী গো-মহিষী গির্দে আশে পাশে,
রূপ যৌবনে সদাই সুখী স্বামী ভালবাসে।..."

ইতুপূজা (ব্রত) :

'ইতু ইতু ব্রাহ্মণ।
তুমি ইতু নারায়ণ।।
তোমার শিরে ঢালি জল।
অন্তিমকালে দিও থল।।...' ইত্যাদি।

(খ) দেব-দেবী নিরপেক্ষ ব্রতের ছড়া :
অগ্রহায়ণ মাসে শিব ও সূর্যের সমীকৃত মিশ্র দেবতা উপাসনার চিহ্ন আছে সেঁজুতি ব্রতে। কুমারী জীবনের আকাঙক্ষা এর ছড়ায় প্রকাশিত। এই ব্রতে দেবতা-প্রসঙ্গহীন বহু ছড়া আছে। নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটি লক্ষ্য করার মত—

"ময়না ময়না ময়না। / সতীন যেন হয় না।।
হাতা হাতা হাতা। / খাই সতীনের মাথা।।
বেড়ি বেড়ি বেড়ি। / সতীন মাগী চেড়ী।।
পাখী পাখী পাখী। / সতীন মাগী মরতে যাচ্ছে,
ছাতে উঠে দেখি।। ..." ইত্যাদি।

ইতুর ব্রত :

'ঝুমঝুমাঝুম বাদ্য বাজে,
সাজিয়ে কনে নতুন সাজে;
মা বাপে দেন বরের করে কতই মনের সাধে।
মা-বাপ কামনা করেন
ভালো ঘরে ভালো বরে দিবেন ব'লে ঝি—
কপাল যদি মন্দ হয় মা বাপে তায় করবেন কি ?

মাঘমণ্ডলের ব্রত :

"হাতীও পাইলাম, ঘোড়াও পাইলাম, — আর বামুনের ঝি।
খাট পাইলাম, জাজীম পাইলাম, — আর বামুনের ঝি!
লেপ পাইলাম, তোষক পাইলাম — আর বামুনের ঝি!"

সুতরাং উপর্যুক্ত আলোচনায় বোঝা গেল যে, বাংলার বিভিন্ন লৌকিক দেব-দেবী কীভাবে বাংলা ছড়াগুলির অন্যতম উৎস হয়ে উঠেছে; আমরা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে কতিপয় দৃষ্টান্ত দিলাম মাত্র, কিন্তু এ পর্যন্ত সংগৃহীত বাংলা ছড়ার অমূল্য ভাণ্ডারটি সহস্রাধিক ছড়ার মধ্যে তা নেহাৎ অকিঞ্চিৎকর।

লৌকিক দেব-দেবী ও গীতিকা :

মৈমনসিংহ গীতিকার পালাগুলি লোকসাহিত্যের অতুলনীয় সম্পদ। নদীনালা খাল-বিল ও বনাঞ্চল অধ্যুষিত দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার লোকজীবনের স্পন্দন গীতিকাগুলিতে অনুরণিত হয়ে চলেছে— কান পাতলে এখনো সেই জীবনের অস্তিত্ব যেন অনুভব করা যায়। মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যগুলি লৌকিক ব্রত-পাঁচালির জঠর থেকে যথেষ্ট পরিশীলিত হ'য়ে জন্মলাভ করেছিল; পুরাণ ও শিষ্ট সংস্কৃত সাহিত্যের স্পর্শে লোকজীবনের সেই আঘ্রাণ তাই এখানে খুঁজে পাওয়া সহজ নয়। এছাড়া ট্রাডিশনাল রীতি-নীতির বন্ধনে, বিভিন্ন কবির ক্রমাগত প্রচেষ্টায় মঙ্গলকাব্যগুলির পরিশীলিত ও

শিষ্ট হ'য়ে ওঠার প্রয়াস ও প্রযত্নই ছিল সমধিক। দ্বিতীয়ত, মঙ্গলকাব্যগুলির কেন্দ্রবিন্দুতে আছে ধর্ম ও দেবতা। আর্য ও অনার্য সংস্কারের সংঘাতে কীভাবে অনার্য দেব-দেবী লোক-গোষ্ঠীর ব্যবহারিক জীবন থেকে ক্রমে বাঁধান মন্দিরের রত্নখচিত সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, মঙ্গলকাব্যগুলি বস্তুত সেই বিবর্তনের দলিল। পক্ষান্তরে গীতিকাগুলিতে তার কোনো সুযোগই নেই। কারণ প্রেম, তজ্জনিত ব্যর্থতা, নারীর কৃচ্ছ্র সাধনা ও ত্যাগ— কেবল এই মানবীয় বৃত্তি ও অনুভূতিই গীতিকাগুলির উপজীব্য। যে সময় কবিরা এগুলি 'রচনা' করেছেন, সম্ভবত তার বহুপূর্ব থেকেই লোকজীবনে তার কাহিনী গড়ে উঠেছিল। তার সমর্থন পাওয়া যায় ড. সুকুমার সেনের কথায় :

"এই গীতিকার (মহুয়া) গায়ক-মুখে যথাশ্রুত একটি খাঁটি সংস্করণ ময়মনসিংহ জেলার মশোয়া গ্রাম-নিবাসী পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ ১৩২২ সালে সংগ্রহ করেছিলেন। তাহা 'বাদ্যানীর গান' (অর্থাৎ বেদেনীর গান) নামে ১৩৫১ সালে (১৯৪৪) প্রকাশিত হইয়াছিল"। ঐ সংগ্রাহকের নিবেদন থেকে জানা যায় মহুয়া আসলে 'মেওয়া'; হোমরা বাদ্যা হ'ল 'উন্দরা বাদ্যা'। আর "গান যে সব গাওয়া হইত তাহা দুই-চাব ছত্রেব বেশি নয়। সেগুলি বাঁধা গানও নয়, অভিনেতারা উপস্থিতমত রচনা করিয়া গাহিত।"[৩২] সুতরাং বলা যায়, তাৎক্ষণিকভাবে গানগুলি রচিত হ'লেও গীতিকার ভিন্ন ভিন্ন কাহিনীগুলি আগেই সৃজিত হয়েছিল এবং ঐ কাহিনী-কাঠামোকে ভিত্তি ক'রেই তাৎক্ষণিকভাবে লোককবিরা গীতিকার পালাগুলি পরিবেশন করতেন।

কিন্তু লক্ষ্য করা বিষয়, গীতিকার ক্ষেত্রে মঙ্গলকাব্যের মত কোনো ট্র্যাডিশনাল ফর্ম গড়ে ওঠেনি, বা একই বিষয় নিয়ে কয়েকশ' বছর ধ'রে বিভিন্ন কবি 'পুথি' রচনারও চেষ্টা করেননি। এর ফলে গীতিকায় লোকজীবনেব ঘ্রাণ পূর্ণমাত্রায় বজায় আছে;— আধুনিক ভাষার প্রভাব পড়া সত্ত্বেও।

এ সম্পর্কে দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন : 'নানা দিক দিয়া এই সকল পল্লীগাথায় খাঁটি বাঙালী জীবনের অফুরন্ত সুধা, অচিন্তিতপূর্ব মাধুর্য্য ঝরিয়া পড়িতেছে। ইহা স্বর্গ হইতে আহৃত অমৃতভাণ্ডার নহে, ইহা আমাদের দেশের আমগাছের মৌচাক, এজন্য এই খাঁটি মধুর আস্বাদ আমাদের নিকট এত ভাল লাগিয়েছে।"[৩৩]

গীতিকাগুলি সম্পর্কে দীনেশচন্দ্র একটু বেশি উচ্ছ্বসিত ব'লে অনেক মনে করলেও তাঁর এই মন্তব্য যে কতটা যথার্থ তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

গীতিকা সম্পর্কে আমাদের এই সংক্ষিপ্ত ভূমিকার উদ্দেশ্য একটিই, তা হ'ল গীতিকার কাল্পনিক ও অলীক রূপকথাধর্মী বর্ণনার বাইরে যে বাস্তব জীবনের ছবি আঁকা হয়েছে, তা একান্তভাবেই বাস্তব ও বিশ্বস্ত। তাই গীতিকার কাজী বা জমিদারের লোভ লালসা যেমন সত্য, যেমন সত্য মধ্যযুগীয় শাস্তির নৃশংস দৃষ্টান্ত, তেমন বিপদাপন্ন মানুষের বিভিন্ন লৌকিক দেব-দেবীর আশ্রয় নেওয়ার ঘটনাও সমানভাবে সত্য। গীতিকার চরিত্রগুলির মতই সে সময় লোকগোষ্ঠী এই সব 'লৌকিক' দেবদেবীর স্মরণ নিত। গীতিকার দেবদেবীদের তাই মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীর মত ভয় দেখিয়ে,

অলীক গল্পকাহিনীর মাধ্যমে নিজ ক্ষমতা প্রদর্শন ক'রে ভক্তি আদায় করতে হয় না। এখানে মানুষের জীবন ও সংস্কৃতির সঙ্গে লক্ষ্মী, শীতলা, সত্যপীর, শিব, দুর্গা, বিষহরি, বনদুর্গা, চণ্ডী, ষষ্ঠী— এমন সব দেব-দেবীরা অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ; মানুষের জীবনচর্যার মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত ও অনিবার্যভাবেই তাঁরা এসেছেন। যার ফলে, এই সমস্ত জীবন-সম্পৃক্ত দেব-দেবীর কথা ছাড়া, শুধুমাত্র ভৌগোলিক পরিচয় বা বিভিন্ন রীতি-নীতি ও আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই গীতিকার চরিত্রগুলির সমাজ-সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ স্পষ্টতা লাভ করে না। সুতরাং গীতিকার উৎসগত দিকটির সঙ্গে লোকদেবতা বা লৌকিক পূজা-ধর্ম ইত্যাদির কোনো সম্পর্ক না থাকলেও প্রাগুক্ত কারণেই তাঁরা আলোচনার যোগ্য।

যেমন 'চন্দ্রাবতী' গীতিকাটির কথাই ধরা যাক। সে প্রত্যহ পুজোর ফুল তোলে। এবং ফুল তুলতে গিয়েই তার জয়ানন্দের সঙ্গে পরিচয় ও প্রেম। চন্দ্রার পিতা বংশীবদন শিবপুজো করেন। অতএব শিবপুজোর জন্যই চন্দ্রার পুষ্পচয়ন। আবার অনূঢ়া কন্যা 'শিবের' মত পতি লাভের প্রত্যাশায় শিবপুজো করে— উদযাপন করে শিবরাত্রি ব্রত। তাই প্রাসঙ্গিকভাবেই বলা হয়েছে :

> ''হাতেতে ফুলের সাজি কন্যা চন্দ্রাবতী।
> পুষ্প তুলিতে যায় পোয়াইয়া রাতি।
> আগে তুলে রক্তজবা শিবেরে পূজিতে।
> পরে তুলে মালতীফুল মালা না গাঁথিতে।।''

অতঃপর বংশীবদন ''ভাল ঘরে ভাল বরে কন্যার হউক বিয়া'' —এই প্রার্থনা জানিয়ে শিব পুজো করে। পালার এই অংশটির নামও 'বংশীর শিবপূজা, কন্যার জন্য বরকামনা'। বলা বাহুল্য এই শিব লৌকিক শিব এবং এই লৌকিক দেবতা পালাটির ঘটনাগতিকে কম-বেশি নিয়ন্ত্রণ করেছে। শেষ পর্যন্ত এই জয়ানন্দ অন্য নারীতে আসক্ত হ'লে আহত ও অভিমানী চন্দ্রা তার জীবন শিবের পায়েই অর্পণ করে :

> 'জন্মে না করিব বিয়া রইব আইবর।।
> শিবপূজা করি আমি শিবপদে মতি।'

আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সত্যপীরকে শিরনি দেয়। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে এই সার্বজনিক লৌকিক দেবতার পাঁচালি রচনা ক'রে কঙ্ক দেশে-বিদেশে পাঠায়। আলোচ্য কঙ্ক ও লীলা গীতিকায় 'সত্যপীরের পাঁচালী' শীর্ষক অংশে বলা হয়েছে :

> ''হিন্দু আর মোসলমানে, সত্যপীরে উভে মানে,
> পাঁচালীর হৈল সমাদর।।
> যেই পূজে সত্যপীরে, কঙ্কের পাঁচালী পড়ে
> দেশে দেশে কঙ্কের গুণ গায়।

কঙ্কের এই গুণপনার জন্য 'তাকে জাতিতে তোলা হ'ল,— ''আছিল চণ্ডাল কঙ্ক হইল ব্রাহ্মণ।''

শালগ্রাম শিলা নারায়ণ হিসেবে পূজিত হন। লক্ষণগত দিক থেকে শিলাপুজো নিঃসন্দেহে অনার্য সংস্কৃতির দৃষ্টান্ত। পরে আর্যীভবনের ফলে নারায়ণের সঙ্গে তিনি সম্পৃক্ত হন। হিন্দুর এই বিশিষ্ট দেবতা, অন্যান্য দেবতার পুজোতেও পৃথকভাবে পূজিত হন। গৃহত্যাগের পূর্বে কঙ্ক লীলাকে তাঁর নিত্যসেবার কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এই ব'লে : ''গৃহের দেবতা রইল রে লীলা শালগ্রাম-শিলা। / শুদ্ধ মনে পূজা তারে করিও তিন বেলা।।/ দেবের পূজা রে লীলা হেলা না করিও।/সর্ব্বনাশ ঘটিবে তবে নিশ্চয় জানিও।।''

শীতলা বসন্ত রোগের দেবী হিসেবে পূজিতা হন। এই লৌকিক দেবী খুবই জাগ্রতা। 'সুভাষণ রীতি'র জন্য বসন্ত রোগকে 'মায়ের দয়া' বলা হয়। আলোচ্য পালায় পণ্ডিত গর্গের স্ত্রী গায়ত্রীকে কঙ্ক-জননী হিসেবে পেলেও, এই রোগে গায়ত্রী জননীর মৃত্যু হয়। এখানে কিন্তু এই রোগ 'মায়ের দয়া' নয়, প্রাগুক্ত লৌকিক দেবীর নামেই নির্দেশিত হয় : 'গায়ত্রী জননী মৈল শীতলা রোগেতে।/ কঙ্কের কপাল মন্দ কয় রঘুসুতে।'

কৃষিনির্ভর বাংলাদেশে লক্ষ্মী উল্লেখযোগ্য দেবী এবং আদতে যে তিনি লৌকিক অনার্যদেবী তা আলোচিত হয়েছে। সুতরাং বিভিন্ন প্রসঙ্গে, বিভিন্নভাবে লোকসাহিত্যে লক্ষ্মীর উল্লেখ অনিবার্য। গীতিকাতেও বিভিন্ন স্থানে লক্ষ্মীর উল্লেখ লক্ষণীয়। যেমন, 'কাজলরেখা'য় ধনেশ্বর সদাগর প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : 'এক কইন্যা এক পুত্র ছিল সাধুর ঘরে।/ ধনী আজ হইল সাধু মা লক্ষ্মীর বরে।।' 'কমলা' পালায় 'আরম্ভণ' অংশে এই পালা গাওয়ার আগে সভার উদ্দেশে বলা হয়েছে : 'সাইলের ভাত খাইতে খাইতে মুখে হৈল রুচি।/মা লক্ষ্মীর নিয়ড়ে রাখ্য ধান এক খুচি।।' প্রায় প্রত্যেকটি গীতিকার বন্দনা অংশে অন্যান্য দেবদেবীর সঙ্গে লক্ষ্মীও ধন সম্পদের দেবী হিসেবে বন্দিতা হয়েছেন। যেমন 'মলুয়া'র বন্দনা অংশে আছে 'ধন সম্পদ মিলে লক্ষ্মীরে পূজিলে'। 'কাজলরেখায়' শুকপাখি সাধুর উদ্দেশ বলেছে যে, সে যেন ক্রন্দন না করে, আর 'ধনরত্নে ভইরা লক্ষ্মী দিবাইন তোমার নাও।।' আবার সূচ রাজপুত্রের প্রাসাদে আলপনা অঙ্কনের পরীক্ষায় কাজলরেখা 'উত্তম সাইলের চাউল' বেটে যে আলপনা আঁকল তা বাংলার লৌকিক ব্রতের আলপনা ব্যতীত আর কী হতে পারে! বিভিন্ন লৌকিক দেব-দেবীর সঙ্গে লক্ষ্মীর, এমনকি লক্ষ্মীর গৃহাভিমুখী পদচিহ্নও বাদ যায়নি :

'জোরা টাইল আঁকে কন্যা আর ধানছড়া!
মাঝে মাঝে আঁকে কন্যা গিরলক্ষ্মীর পারা।।'

আচার-ব্যবহারেই নয়, ধর্মমতী কাজলরেখার এই আলিম্পন রচনা, লক্ষ্মীশ্রীমণ্ডিত বাঙালী নারীর চিরন্তন বৈশিষ্ট্য ও স্নিগ্ধ সৌন্দর্যের অনির্বচনীয় রূপটিকেই প্রকাশ করে।

প্রসঙ্গত, 'বাতাডুগলে'র কথায় আসা যাক। আমরা অন্য প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি যে এটি ধান্য পূজার সঙ্গে উর্বরতা-তান্ত্রিক ধ্যানধারণার এক সমন্বিত রূপ, — যার মধ্যে লক্ষ্মীর বিষয়টিও আরোপিত। সুতরাং আরো বিশেষিত দৃষ্টিকোণ থেকে

একে ধান্য-উপাসনা বা লক্ষ্মী-উপাসনা বলাই যুক্তিযুক্ত (যেহেতু ধান্য উপাসনা পরিণতিতে লক্ষ্মী উপাসনার মধ্যেই লীন হয়েছে)। এতে 'প্রথম দিন ধান কাটিবার সময় কৃষকেরা পাঁচটি বাতা-গাছের ডুগল (অগ্রভাগ) লইয়া ক্ষেত্রে যায়, তাহা সিন্দুর প্রভৃতি মাঙ্গলিক দ্রব্যে অনুলিপ্ত হয়। এই বাতার পাঁচটি 'ডুগলের' সঙ্গে পাঁচটি ধান্যের ছড়া বাঁধা হয়, তাহাই কৃষকেরা লক্ষ্মীর আসন মনে করিয়া ঘরের কোণে বিশিষ্টস্থলে তুলিয়া রাখে''[৩৪]। 'মলুয়া' গীতিকায় জলপ্লাবন ও দুর্ভিক্ষে বিনোদের 'ঘরে নাই সে লক্ষ্মীর দানা লক্ষ্মীপূজার তরে।।' তবু মায়ের আদেশে ধান কাটার জন্য সে ক্ষেত্রে যায় :

''পাঞ্চ গাছি বাতার ডুগল হাতেতে লইয়া।
মাঠের মাঝে যায় বিনোদ বারমাসী গাইয়া।।
আশ্বিন্যা পানিতে দেখে মাঠে নাইক ধান।
এরে দেখ্যা চান্দ বিনোদের কান্দিল পরাণ।।''

'মনসা' গ্রামবাংলার অত্যন্ত জাগ্রত দেবতা। সুতরাং গীতিকার বিভিন্ন স্থানেই মনসার কথা আছে। 'কমলা' পালায় কমলার 'বারমাসী'তে আছে :

''কিসের ঢাক কিসের ঢোল কিসের বাদ্য বাজে।
শায়ান্যা সংক্রান্তে রাজ্য মনসারে পূজে।।''

'দেওয়ান ভাবনা' গীতিকায় বাবা ও ভাইকে দেওয়ান ভাবনা ধ'রে নিয়ে গেলে নিঃসঙ্গ সুনাই তাদের পথ চেয়ে বসে থাকে। আর বিভিন্ন মাসের উল্লেখে 'বারমাসী' রচনা করে। এই প্রসঙ্গেই সে বলে :

''শায়ন মাসেতে দূতী পূজিলা মনসা।
সেইতে না পূরিলগো আমার মনের আশা।।''

আমরা দেখেছি মনসা শুধু সর্পের দেবতাই নন, বিভিন্ন লৌকিক দেবীর মত পবিশেষে তাঁর উর্বরতা-ভাবনা বা উর্বরাতন্ত্রের সঙ্গেও সংযোগ ঘটেছে। তাই মনসাকে তুষ্ট ক'রে সন্তান লাভও সম্ভব। 'দস্যু কেনারামের পালা'য় অপুত্রক খেলারাম ও যশোধারার 'মুখ নাহি দেখে লোকে আটখুর বলিয়া'। এমতাবস্থায় অনাহারে মৃত্যুর সংকল্প ক'রে বন্ধ ঘরে নিরম্বু উপবাসের তৃতীয় দিনে যশোধারা স্বপ্নে মনসার দ্বারা আদিষ্ট হল যে, সে যেন আষাঢ় মাসে ঘট স্থাপন করে শ্রাবণ সংক্রান্তির দিনে মনসার পূজো দেয়। সেইমত পুজো করলে যশোধারার পুত্রলাভ হয় : ''চন্দ্রাবতী কয় শুনগো অপুত্রার ঘরে। / সুন্দর ছাওয়াল হৈল মনসার বরে।''

আমরা পূর্বেও বনদুর্গার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছি। মৈমনসিংহ গীতিকার উৎস ও বিকাশ যে ভৌগোলিক পটভূমিতে, সেই অরণ্যসংকুল বঙ্গভূমিতে বনদুর্গার অপরিহার্যতা কম নয়। সুতরাং গীতিকাগুলিতে বারংবার বনদুর্গার নাম উচ্চারিত হয়েছে।

'কমলা' পালায় চিকন গোয়ালিনী কমলাকে বলে : ''বিয়া যদি হইত তোমার বনদুর্গার বরে। / ভাল দৈ আন্যা দিতাম তোমার নাগরে।'' মিথ্যা কলঙ্ক রটানো হলে

কমলা বনদুর্গার উপর ভরসা রেখে মাতুলালয় ত্যাগ করে : 'বনদুর্গা স্মরি কন্যা পন্থে মেলা করে।' অথবা সবকিছুই যেন দেবীর ইচ্ছেতেই সংঘটিত : 'যা করেন বনদুর্গা মনে মনে আছে।' 'বারমাসী' বর্ণনা করতে গিয়েও সে অন্যান্য দেব-দেবীর সঙ্গে বনদুর্গাকে সাক্ষী মানে : 'বনের সাক্ষী বনদুর্গা সদায় পূজা করি।' এমনকি তার বিবাহের সময় 'বিধিমত হইল কত দেবতাপূজা। / বনদুর্গা একচূরা খেলা কীর্ত্তন।।'' 'চন্দ্রাবতী' পালাতেও চন্দ্রাবতীর বিবাহেব সময় 'একে একে কৈল পূজা যত দেব আর। / শ্যামাপূজা, একাচূড়া বনদুর্গা মার।।'' ইত্যাদি।

এছাড়া চণ্ডী, ষষ্ঠী প্রভৃতি আরো বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য লৌকিক দেব-দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে দু'একটি দৃষ্টান্ত না দিলেই নয়। যেমন, কমলার 'বারমাসী'তে কমলা ও তার মাতা অসহায় অবস্থায় চণ্ডীর দুয়ারে প্রার্থনা করে, যাতে ধৃত পিতা-পুত্রের সংকট মোচন হয় : 'মায় গিয়া ধন্না দিলাম চণ্ডীর দুয়ারে।' কখনো সন্তানের সংকট মুক্তির জন্য 'মায়ে করে ষষ্ঠীপূজা পুতের লাগিয়া।' তুলসীগাছ হিন্দুদের পূজ্য। এই তুলসী গাছের কথাও বাদ যায়নি। বিভিন্ন পালার বন্দনায় তার কথা তো আছেই (যেমন 'মলুয়া' পালায় : 'বৃক্ষের মধ্যে বন্দিয়া গাই আদ্যের তুলসী।) গীতিকার কাহিনী বৃত্তের মধ্যেও তার উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন, 'চন্দ্রাবতী' গীতিকায় আত্মগ্লানিতে নিষ্পিষ্ট জয়ানন্দ বলেছে·

'তুলসী ছাড়িযা আমি পূজিলাম সেওবা।
আপনি মাথায় লইলাম দুঃখের পসরা।।'

—জয়ানন্দের এই স্বীকারোক্তির মধ্যে যে কাতরতা, পংক্তিদ্বয়ের মধ্যে তার অসাধাবণ কাব্যগুণসম্পন্ন প্রকাশ নিঃসন্দেহে,— এমনকি পংক্তিদু'টি বহুলাংশেই প্রবাদ-প্রতিমও বটে, কিন্তু তা সম্ভব হয়েছে তুলসীর ধর্মীয় সংস্কারের জন্যই।

পরিশেষে 'কাজলরেখা' গীতিকা থেকে, কাজলরেখার আলপনা অঙ্কনের চিত্র কিছুটা উদ্ধার ক'রে আলোচনা শেষ করা যাক—

'শিব-দুর্গা আঁকে কন্যা কৈলাস ভবন।
পদ্মপত্রে আঁকে কন্যা লক্ষ্মী-নারায়ণ।।
হংসরথে আঁকে কন্যা জয়া-বিষহরী।
ডরাই ডাকুনী আঁকে কন্যা সিদ্ধ বিদ্যাধরী।।
বনদেবী আঁকে কন্যা সেওরার বনে।
রক্ষাকালী আঁকে কন্যা রাখিতে ভুবনে।।'...

—দেখা যাচ্ছে ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের ছায়াপাত ঘটলেও এই দেবতারা বাংলাদেশে কাজলরেখাদের চারপাশেই বিদ্যমান আছেন; 'উত্তম সাইলের' চালবাটার পিটুলির আঘ্রাণে তাঁরাও যেন আশ্বস্ত হচ্ছেন; আর আমরাও দেবতাদের গা থেকে যেন বাংলাদেশের নিজস্ব মাটির গন্ধটুকু সালি ধানের সঙ্গে অনুভব করতে পারছি—সেখানে আমাদের ভালোবাসার কাজলরেখাও বেঁচে থাকে।[৩৫]

চতুর্থ অধ্যায়

বিবাহ

বর্তমানে প্রত্যেক নৃবিজ্ঞানী এবং সমাজতাত্ত্বিক স্বীকার করেন যে আদিম মানুষ এমনকি— গরিলা, বনমানুষও সাধারণত জোড় বেঁধে জীবন-যাপন করে এবং এই প্রবৃত্তির কারণে সৃষ্ট পরিবার সভ্য মানুষের সামাজিক অনুশাসনের ফল নয়। অবশ্য সমাজ-সাংস্কৃতিক-নৃবিজ্ঞানের (Socio-Culturai Anthropology) আলোকে বিশ্লেষণ করলে প্রাগুক্ত পরিবারকে 'পরিবার' বিবেচনা করা যায় না, কেননা এখানে 'বিবাহ' বিষয়টি অনুপস্থিত। আসলে বক্তব্য হল, প্রাক-সমাজজীবনে বিচ্ছিন্ন দল বা গোষ্ঠীজীবনে বর্বর মানব-মানবী স্বতঃস্ফূর্তভাবে জৈবিক নিয়মের বশবর্তী হয়েই জোড় বেঁধে বসবাস করত;— তা না হলে সন্তান লালন-পালন কবা অসম্ভব হয়ে পড়ত, কারণ মানব শিশুর লালনের জন্য দীর্ঘসময় অপরিহার্য। ওয়েস্টারমার্ক প্রমুখ নৃতাত্ত্বিক ও সমাজ-বিজ্ঞানীরা তাই মনে করেন যে, এইভাবেই একদিন মানুষ সমাজ গঠনের পরে বিবাহ প্রথার উদ্ভব ঘটায়; যদিও বিবাহ প্রথার উদ্ভবের আগেই পরিবারের অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু ঐ পরিবাবকে 'দল' বলাই শ্রেয়ঃ, কেননা নৃবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে 'পরিবার' হ'ল 'বিবাহের'ই অনিবার্য ফলশ্রুতি এবং তা 'সমাজ'-এর প্রেক্ষাপটেই অস্তিত্বপূর্ণ ও অর্থবহ।

সাধারণভাবে বিবাহ বলতে বোঝায় এক বা একাধিক পুরুষ ও এক বা একাধিক নারীর একত্র সহবাস করা, ও পারস্পরিক যৌন সম্পর্ক স্থাপন করার সামাজিক অনুমোদন। এ প্রসঙ্গে ড. ওটেস্টারমার্ক যা বলেছেন— তা সর্বজনগ্রাহ্য। তিনি বলেছেন যে, বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্বীকৃত এক বা একাধিক পুরুষের সঙ্গে এক বা একাধিক নারীর সমাজ-স্বীকৃত মিলন, যাব মাধ্যমে মিলিত স্ত্রী-পুরুষ ও তাদের সন্তান-সন্ততির মধ্যে পারস্পরিক কর্তব্য ও অধিকারের বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত হয়।[১] যুগ যুগ ধরে বিবাহ নামক প্রথাটি বিভিন্ন সমাজ-সাংস্কৃতিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে একটি জটিল সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় রূপ লাভ করেছে, সেই সঙ্গে বিভিন্ন সামাজিক কর্মধারার অঙ্গীকার হয়ে দেখা দিয়েছে। যার ফলে বিবাহ সমাজ ব্যবস্থা ও স্বচ্ছন্দ সমাজ-প্রবাহের সঙ্গে ওতপ্রোত।

অথর্ববেদে (৩/২৯/৬/) স্পষ্টই বলা হয়েছে যে বিবাহ সম্পর্কের মূল ভিত্তি হচ্ছে 'কাম'-। কিন্তু সমাজবদ্ধ জীব বলেই 'বিবাহ' সম্পর্কটি তার কাছে জরুরী। সন্তান উৎপাদন, সন্তান প্রতিপালন সমাজ গঠন—সব ক্ষেত্রেই 'বিবাহ' একটি অন্যতম বন্ধন। মানুষ পশুর মতন বাঁচতে চায় না বলেই নারীপুরুষের একটি পারস্পরিক সুদৃঢ় বন্ধন আবশ্যক। তাই সামাজিক কল্যাণের প্রয়োজনীয়তায় 'বিবাহ' মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করতে

পারে। টাইলর তাই বলেছেন। "Mankind can never have lived as a mere struggling crowd, each for himself society is always made up at families or households bound together by kindly ties, controlled by rules of marriage and the duties of parent and child. Yet the forms of these rules and duties have been very various."[২]

বিবাহ বিধি পদ্ধতি ও প্রকার যত বিচিত্রই হোক না কেন, সকলেই দুটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন,—তা হল সমাজ স্বীকৃত সন্তান উৎপাদন এবং নারী-পুরুষের সম্পর্কের স্থায়ীত্ব। জনৈক সমাজ বিজ্ঞানীর ভাষায় বলতে পারি . The essential thing about marriage is that it is a stable relationsiip in which a man and a woman are socially permitted, without less of standing in the community, to have children.[৩]

কোন কোন সমাজ বিজ্ঞানী অবশ্য মনে করেন যে রাষ্ট্র তার নিজের স্বার্থে বিবাহ বিষয়টিকে সৃষ্টি করেছে কেননা বিবাহের ফলে উদ্ভূত পরিবার হল রাষ্ট্রের একক, বহু পরিবারের সমষ্টি হল রাষ্ট্র। তাই রাষ্ট্র মানুষের ব্যক্তিগত বিবাহ মিলনে উৎসাহী এমন কি একে নিয়ন্ত্রণ করার কর্তব্য নিজে স্বীকার ক'রে নেয় : Marriage is a legalized union between man and woman entered into with a definite purpose of raising a family It is because of this purpose that is interested in the union and takes upon itself the duty of regulation it.[৪] সুতরাং এই আলোচনা থেকে বোঝা যায়

বিবাহের কেন্দ্রভূমিতে রয়েছে (১) নির্দিষ্ট নরনারীর মিলনে সমাজ-স্বীকৃতি, (২) সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান— যা মূলত ধর্মীয় ও যাদুমূলক অনুষ্ঠানেই পরিপুষ্ট, (৩) পরিবারের নির্দিষ্ট— প্রায় বাধ্যতামূলক কিছু দায়-দায়িত্ব, প্রথমত, যা পরিবারের মধ্যে সীমায়িত, দ্বিতীয়ত, যা বৃহত্তর সমাজ-পরিবেশের কাছে বিদ্যমান।

যেহেতু বিবাহ হ'ল মানুষের জৈবিক ও সাংস্কৃতিক আচরণের একটি জটিল ক্রিয়াচার তাই বিবাহ-অনুষ্ঠানের মধ্যে বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাস বা ধর্মাচরণ এবং ঐন্দ্রজালিক বিশ্বাস-সংস্কার একটি বৃহৎ অংশ বা স্থান অধিকার করে থাকে। ফলে কোথাও কোথাও বিবাহ তার মূল জায়গা থেকে (অর্থাৎ নির্দিষ্ট নরনারীর যৌন স্বীকৃতি) সরে আসে। যেমন আফ্রিকার নুয়ের (Nuer) আদিবাসীদের মধ্যে মহিলার সঙ্গে মহিলার বিবাহ সংঘটিত হয়, অনেক সমাজে গাছ বা কোনো জড় পদার্থের সঙ্গে মহিলার বিবাহ দেওয়া হয়। ফ্রেজারের 'গোল্ডেন বাও' গ্রন্থে এমন বহু দৃষ্টান্ত আছে। আমাদের দেশে রাজবংশী সমাজে বটের সঙ্গে পাকুড় গাছের বিবাহ দেওয়া হয়। ফলে সেই দিক থেকে 'বিবাহ' নামক সংস্কারটির সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। কেউ কেউ তাই বলেছেন, 'One of the undefined ideas we have been using so far is 'marriage.'[৫]

সুতরাং এই আলোচনা থেকে আমরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি, তা হল

এই যে, আধুনিক আইনগত বিবাহ ছাড়া যাবতীয় সামাজিক বিবাহ অনুষ্ঠান বস্তুত সামাজিক মানুষের দীর্ঘ ঐতিহ্য, কৃষ্টি, সংস্কার, ধর্মবিশ্বাস, প্রথা এবং নৈতিক ভাবনার এক জটিল, গভীর, মৌলিক ও স্থায়ী সংমিশ্রণ। সুতরাং বিভিন্ন ক্ষেত্রের মত লোকসাহিত্যে এর অবশ্যম্ভাবী প্রতিফলন যথেষ্ট এবং তা বিশেষভাবে অনুসন্ধান-যোগ্য। আমরা বাংলা লোকসাহিত্যে বিবাহানুষ্ঠানের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য, বিশ্বাস, সংস্কার বা রীতি-নীতি ইত্যাদি কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তার অনুসন্ধান করব। তবে তার আগে বিবাহ-সংক্রান্ত আরো কয়েকটি বিষয়— যেমন, বিবাহ-বিধি, বিবাহ-প্রকার ইত্যাদি বিষয়গুলি সম্পর্কেও সম্যকভাবে অবহিত হব, কেননা এগুলিও বিবাহ অনুষ্ঠানের ভিন্নতা ও বিশেষত্ব আনয়ন করে।

বিবাহ-বিধি : (Law of marriage)

বিবাহ-বিধি হল পুরুষের স্ত্রী এবং মহিলার স্বামী নির্বাচনের ধারা বা রীতি। এই বিধি অনুযায়ী স্থির হয় ব্যক্তির নিজের দল বা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত কাউকে বিবাহ করা অসঙ্গত ও অপরাধজনক না বহির্ভূত কাউকে গ্রহণ করা সঙ্গত। এই বিধি অনুযায়ী বিবাহ দু'প্রকারের— অন্তর্বিবাহ (endogamy) ও বহির্বিবাহ (exogamy)। অন্তর্বিবাহ হল ব্যক্তি তার নিজের গোষ্ঠী বা দলের কাউকে বিবাহ করে। যেমন সাঁওতালরা সাঁওতাল দলের মধ্যে বা হিন্দুরা হিন্দু গোষ্ঠীর মধ্যেই বিবাহ করে। সাধারণত এক্ষেত্রে দেখা যায় বিভিন্ন উপজাতি বা ধর্মীয় সম্প্রদায় স্ব স্ব উপজাতি বা ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিবাহ করে। পক্ষান্তরে বহির্বিবাহ হল কোনো মহিলা বা পুরুষ যখন তার নিজের দল বা গোষ্ঠীর বাইরে থেকে স্বামী বা স্ত্রী নির্বাচন করে। যেমন কোনো হিন্দু যদি কোনো খ্রীশ্চানকে বিবাহ করে তবে অবশ্যই তা বহির্বিবাহ। কিন্তু কার্যত বহির্বিবাহ বলতে বোঝায় একই গোষ্ঠী বা দলের কেউ যখন সেই দলেরই তার নিজের টোটেম বা গোত্র ভিন্ন অন্য কোনো টোটেম বা গোত্রের কাউকে বিবাহ করে। ফলে সাধারণত বহির্বিবাহ ও অন্তর্বিবাহ বিধি একই সঙ্গে কার্যকরী হয়। যেমন কোনো সাঁওতাল পুরুষ বা রমণী সাঁওতাল গোষ্ঠীর মধ্য থেকেই পাত্র-পাত্রী নির্বাচন করে। কিন্তু সেই পুরুষ বা রমণীর যদি 'হাঁসদা' টোটেম হয়, তবে 'হাঁসদা' ছাড়া অন্য কোনো টোটেমের (১২টি টোটেম) অধিকারী স্ত্রী বা পুরুষের সঙ্গে তার পরিণয় বন্ধন সম্ভব। অনুরূপ হিন্দুর বিবাহ হিন্দুদের মধ্যেই হয়— এমনকি কায়স্থ জাতির পুরুষ বা কন্যা তার স্ব-জাতের মধ্যে থেকেই পাত্র-পাত্রী নির্বাচন করে কিন্তু ঐ ভাবি বর ও কনের গোত্র নিশ্চিতভাবেই পৃথক হবে। (বর্তমানে অবশ্য বহু অন্যান্য সংস্কারের মত এই প্রকার বিবাহ-সংস্কার বা নিয়ম-কানুন আধুনিকতার সঙ্গে বিলুপ্ত হচ্ছে। কিন্তু লোকসাহিত্যের আলোচনায় আমরা সনাতন নিয়ম-কানুনগুলিকেই স্মরণে রাখব।)

ভারতবর্ষে সমজাতি (caste) বা সম-গোষ্ঠীর স্ত্রী-পুরুষের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া ছিল স্বাভাবিক ও সঙ্গত। পুরুষতান্ত্রিক ভারতবর্ষে কখনো কখনো এর ব্যতিক্রমও ঘটত। উচ্চ বংশজাত পুরুষ নিম্নবংশীয় কন্যাকে স্ত্রী রূপে বরণ করত এবং এই

'অনুলোম' বিবাহ সমাজ-স্বীকৃত ছিল। কিন্তু এর বিপরীত অর্থাৎ নিম্নবংশীয় পুরুষের উচ্চবংশীয় কন্যা গ্রহণ— যাকে এককথায় 'প্রতিলোম' বিবাহ বলা হয়, তা ছিল নিন্দনীয়— যদিও সমাজে তার প্রচলন ছিল। অনুলোম বিবাহে কন্যা স্বাভাবিকভাবে উচ্চ বংশে প্রতিষ্ঠিত হত— তাদের সন্তানরাও সেই বংশজাত ব'লে স্বীকৃত হত। কিন্তু প্রতিলোম বিবাহে দম্পতির সন্তান সাধারণত পিতার বংশে প্রতিষ্ঠা পেত না— আরো নিম্নস্তরে স্থান পেত। বস্তুত জাত (caste) প্রথার বিচিত্রতায় প্রতিলোম বিবাহের মত বহির্বিবাহের অবদানই সমধিক। যেমন পিতা শূদ্র ও মাতা ক্ষত্রিয় হলে পুত্র হয় চর্মকার, বা পিতা শূদ্র ও মাতা ব্রাহ্মণ হলে পুত্র চণ্ডাল। এইভাবেই তিলি, কর্মকার, তেলি, নাপিত, বাগদি, গন্ধবণিক —এমন বহু জাতির উৎপত্তি।[৬]

বিবাহ বিধির মত বিবাহ প্রকারও একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়, যা ভারতীয় বিশেষত হিন্দু সমাজ সংস্কৃতির গতিপ্রবাহকে জটিল ক'রে তুলেছে। বিবাহ প্রকার (types of marriage) প্রধানত দ্বিবিধ— (১) এক বিবাহ (monogamy), (২) বহু বিবাহ (polygamy)। একজন পুরুষ কেবলমাত্র একজন স্ত্রীলোককে বিবাহ করলে হয় এক বিবাহ। একজনের মৃত্যু না হলে— বা কোনো আইনগত কারণে দম্পতি পৃথক না হলে কেউ দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে পারে না। আন্দামানী, সাঁওতাল, ওঁরাও, মুণ্ডা এবং হিন্দু — ইত্যাদির মধ্যে তা দেখা যায়। বহু বিবাহে একজন পুরুষ বা স্ত্রী যথাক্রমে একাধিক স্ত্রী বা পুরুষকে বা একাধিক পুরুষ একাধিক স্ত্রীকে বিবাহ করে। সেই দিক থেকে বহু বিবাহের তিনটি প্রধান ধারা : বহুপত্নীমূলক (polygamy) অর্থাৎ একজন পুরুষ একাধিক মহিলাকে বিবাহ করে। বহু দেশে এই রীতি। ভারতে মুসলমান সমাজে এখনো তা প্রচলিত। হিন্দু কুলীন ব্রাহ্মণও বহু বিবাহ করত। প্রাচীন রাজা-মহারাজা, বহু পত্নীমূলক বিবাহ করতেন। রামায়ণ মহাভারতেও তার অজস্র দৃষ্টান্ত। বিশেষত 'পুত্রার্থে ক্রীয়তে ভার্যা' এই মত অনুযায়ী হিন্দু পুরুষেরা স্ত্রী বন্ধ্যা হলে বারংবার বিবাহ করত। নাগা সর্দাররা সামাজিক প্রতিষ্ঠার জন্য একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করতেন।

যৌথ বিবাহে (group marriage)-এ একদল পুরুষ ও একদল নারী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। আবার বহুপতিমূলক (polyandry) বিবাহ দু'ভাবে হয়— স্বভ্রাতৃত্বমূলক (fraternal/adelphic) — যেখানে কয়েক ভাই মিলে একজন মহিলাকে বিবাহ করে। টোডা খাসা ইত্যাদি উপজাতিদের মধ্যে তা দেখা যায়। মহাভারতের দ্রৌপদীর বিবাহ এর অন্যতম উদাহরণ। অভ্রাতৃত্বমূলক (non-fraternal) বিবাহে স্বামীর ভাই নয়— সমাজের ভিন্ন ভিন্ন পুরুষ।

পৃথিবীর প্রতিটি সমাজে আত্মীয় বিবাহ প্রচলিত। যাকে অন্যভাবে বলা হয় বাঞ্ছনীয় বিবাহ (preferential marriage)। এই প্রকার বিবাহ মোটামুটি চার ধরনের হয়ে থাকে :

(ক) মামাতো-পিসতুতো ভাইবোনে বিবাহ (cross-cousin marriage)

(খ) খুড়তুতো-জ্যেঠতুতো বা মাসতুতো ভাইবোনে বিবাহ (parallel cousin

marriage)

(গ) দেবর, ভাসুর বরণ (Levirate)

(ঘ) শ্যালিকা বরণ (Sororate)

কোনো কোনো অদিবাসী সমাজে উপর্যুক্ত দ্বিতীয়টি ছাড়া ঐ তিন প্রকার বিবাহ রীতি দেখা যায়। দ্বিতীয়টি কেবল মুসলমান সমাজে সীমায়িত। তৃতীয় এবং চতুর্থ রীতিটি হিন্দুদের মধ্যে দুর্লক্ষ্য ছিল না।

বিভিন্ন সমাজে স্ত্রী বরণেও কয়েকটি পদ্ধতি আছে। আদিবাসী সমাজে এখনো অনেক পদ্ধতি বিদ্যমান থাকলেও আদিবাসী নয়, এমন সমাজেও লুপ্ত পদ্ধতির কিছু অনুষঙ্গ বিবাহানুষ্ঠানে দেখা যায়— কখনো ক্রিয়া-কর্মে, কখনো প্রতীকে। ভারতবর্ষে স্ত্রীবরণের পদ্ধতিগুলির মধ্যে কয়েকটি পদ্ধতির উল্লেখ করা গেল :

১। রাক্ষস বিবাহ (marriage by capture)

২। শক্তি পরীক্ষার দ্বারা বিবাহ (marriage by trial)

৩। কন্যাপণের দ্বারা বিবাহ (marriage by purchase)

৪। বিনিময় বিবাহ (marriage by exchange)

৫। শ্রমদানে বিবাহ (marriage by service)

৬। প্রজাপত্য বিবাহ (marriage by negotiation)

৭। গান্ধর্ব বিবাহ (marriage by elopement)

৮। অনাহূত বিবাহ (marriage by intrusion)

৯। অবেক্ষাধীন বিবাহ (probationary marriage)

—উপর্যুক্ত পদ্ধতিগুলির কোনো কোনোটি প্রয়োজনে যথাসময়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা যাবে।

বিবাহ যেহেতু একটি গুরুত্বপূর্ণ সার্বিক সামাজিক অনুষ্ঠান, তাই লোকসাহিত্যে তার গভীর প্রতিফলন। লোকসাহিত্যের একটা বড় অংশ যেমন বিবাহ-অনুষ্ঠান ও তৎসংক্রান্ত বিষয়কে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয়েছে, তেমনি বিবাহ ও বিবাহ-সংক্রান্ত বিষয়-নিরপেক্ষ লোকসাহিত্যেও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই বিষয়টির ছায়াপাত ঘটেছে। কিন্তু সেই আলোচনায় প্রবিষ্ট হওয়ার আগে, সংক্ষেপে আমরা দেখে নিতে পারি যে, আমাদের দেশে প্রাগুক্ত কোন বিবাহ পদ্ধতিগুলি সম্মান-জনক কিংবা কোনগুলি দূষণীয় ছিল। এবং সেই সঙ্গে দেখব কোন পদ্ধতিগুলিই বা সমাজে প্রচলিত ছিল।

যাজ্ঞবল্ক্য ও মনুস্মৃতি অনুযায়ী বৈদিক ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ ও প্রজাপত্য ছাড়া আর বাকি চারটি অবৈদিক বিবাহ পদ্ধতি অর্থাৎ আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ হীন বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। শেযোক্ত চারটি বিবাহ পদ্ধতি অনার্যদের মধ্যে প্রচলিত ছিল,— এখনও আদিবাসী সমাজে এই পদ্ধতিগুলি লক্ষ্য করা যায়। মহাভারতের ঘটনাগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, মহাভারতের যুগেও গান্ধর্ব, আসুর ও রাক্ষস বিবাহ যথেষ্ট প্রচলিত ছিল, ক্ষত্রিয়ের কাছে এই জাতীয় বিবাহ পদ্ধতি বীরত্ব সূচক ও আদরণীয়

বলে পরিচিত হয়েছিল। দুষ্মন্ত-শকুন্তলা, শান্তনু-গঙ্গা, ভীম-হিড়িম্বা. অর্জুন-উলুপী ও চিত্রাঙ্গদা —ইত্যাদির বিবাহগুলি গান্ধর্ব মতে প্রণয় ও মালা বদল করে সংঘটিত হয়েছে। স্বয়ম্বর সভায় প্রতিদ্বন্দ্বীদের পরাজিত করে বিবাহ যা আসলে 'রাক্ষস' বা শক্তি পরীক্ষার দ্বারা বিবাহ, তার মর্যাদা ও প্রচলন মহাভারত এমনকি রামায়ণেও যথেষ্ট লক্ষ্য করা যায়। ক্ষত্রিয় পুরুষের কাছে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে বা বলপূর্বক কন্যা লুণ্ঠন ক'রে বিবাহ বা রাক্ষস বিবাহ বিন্দুমাত্র দূষণীয় নয়, বরং আদর্শ ছিল। যেমন কৃষ্ণ রুক্মিণীকে লুণ্ঠন ক'রে বিবাহ করেন, অর্জুন সুভদ্রাকে একইভাবে বিবাহ করেন, দুর্যোধনের জন্য চিত্রাঙ্গদাকে কর্ণ লুণ্ঠন ক'রে আনেন। আবার 'আসুর' বিবাহের দৃষ্টান্তও এ যুগে বিরল নয়। কন্যাপণ দিয়ে এই বিবাহ সংঘটিত হয়। ভৃগুমুনির পুত্র রিচিক গাধীর কন্যাকে পাবার জন্য হাজার অশ্বপণ, গলিব যযাতির কন্যা মাধবীর জন্য চার হাজার অশ্বপণ দেন। আর বহুপত্নীমূলক বিবাহ তো প্রবলভাবেই বিদ্যমান ছিল। কৃষ্ণের ষোড়শ গোপিনী তো প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়েছে। রাজা সোমকেরই একশত স্ত্রী ছিল। পক্ষান্তরে বহুপতি বিবাহের সাক্ষাৎ তুলনামূলকভাবে কমই পাওয়া যায়। এছাড়া, এ যুগে অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহ অবৈধ ছিল না তাও লক্ষ্য করা যায়। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়, শূদ্র বা নিম্নবর্ণের কন্যা স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করেছে, শূদ্র বা নিষাদ জাতির পুরুষ অবাধে ক্ষত্রিয় বা উচ্চবর্ণের কন্যা গ্রহণ করেছে।

মহাভারতের সময়— অর্থাৎ আর্য-অনার্যের সমন্বয়ের যুগে অনার্য এই বিবাহ পদ্ধতিগুলি যে বিশেষভাবেই পালিত হত তা দেখা গেল। আমরা অন্যত্র বলেছি যে আর্য-অনার্য সংঘাত ও সমন্বয়ের মধ্যেও মূলত অনার্য সংস্কৃতিরই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জয় হয়েছে। হিন্দুর ধর্মোপাসনা, ব্রত ইত্যাদিই তার প্রমাণ। এমন কি বিবাহের ক্ষেত্রেও তা লক্ষ্য করা যায়। বিবাহ যদি 'প্রজাপত্য' মতে হয়, তথাপি যাগযজ্ঞ অপেক্ষা এক্ষেত্রেও স্ত্রী আচারের প্রাধান্য অনেক বেশি এবং বস্তুতপক্ষে এই স্ত্রী আচারই মুখ্য ভূমিকা নিয়ে থাকে।

হিন্দু বাঙালীদের মধ্যেও বিবাহে তাই অনার্য পদ্ধতিই বা বিবাহের অনার্য প্রথাগুলিই প্রকটিত হয় প্রবলভাবে। বাংলার অনেক লৌকিক ছড়াতেও তার চিহ্ন সুস্পষ্ট। যেমন নিম্নলিখিত ছড়াটি লক্ষণীয় :

> "আল্তা নুড়ি গাছের গুড়ি জোড়া পুতুলের বিয়ে
> এত টাকা নিলে বাবা দূরে দিলে বিয়ে।।"

—এখানে বাংলার বহু কন্যার ক্রন্দনধ্বনি যেন প্রচ্ছন্ন আছে। 'জোড়া পুতুলের বিয়ে' নামক খেলার অনুষ্ঠানেও তা অব্যক্ত থাকে না। বহু অর্থের বিনিময়ে পিতা কন্যাকে দান করেন, অন্য কথায় কন্যা বিক্রয় করেন। কন্যার যন্ত্রণা অবশ্য দূরে বিবাহ দেওয়ার জন্য। এই ছড়া থেকেই প্রমাণিত হয় বাংলাদেশে এক সময় আসুর বিবাহ নিঃসন্দেহে প্রচলিত ছিল। কন্যা দান অতঃপর পিতামাতার ক্রন্দন, ছড়াটির পরবর্তী কয়েকটি পংক্তিতে সেই কথাই বলা হচ্ছে—

> "এখন কেন কান্ছ বাবা গামছা মুড়ি দিয়ে।।

আগে কাঁদে মা বাপ পাছে কাঁদে পর,
পাড়াপড়শি নিয়ে গেল শ্বশুরদের ঘর।।"

ক্রমে ক্রমে মানুষের জীবন জটিল থেকে জটিলতর হয়ে ওঠে। আধুনিক যুগলক্ষণ পরিস্ফুট হতে থাকলে ক্রমে সমাজে জাতব্যবসা ছেড়ে মানুষ শহরমুখী হয়ে পড়ে।

বাঙালী ছেলেদের বিবাহ দিতে গিয়ে পিতা মাতা বাধ্যতামূলকভাবে যৌতুক গ্রহণ করতে থাকেন যার নামান্তর বরপণ। অবশ্য এর উৎস সেন রাজাদের কৌলীন্য প্রথা সৃষ্টি ও এটি তার অনিবার্য ফল। বিভিন্ন জাত-পাতের সামাজিক সংকীর্ণতা, ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের গোঁড়ামি, অনাচার-অবিচার, গৌরীদান প্রথার পুনঃপ্রবর্তন— ইত্যাদি কারণে কুলীন ব্রাহ্মণেরা রীতিমত বিবাহ-ব্যবসা ফেঁদে বসেছিল, ইতিহাসের পাতায় পাতায় তার সাক্ষ্য আছে। কুলভ্রষ্ট এবং সমাজচ্যুত হওয়ার ভয়ে কুলীন পাত্রের অভাবে দরিদ্র কন্যার পিতা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের হাতেও কন্যা সম্প্রদান করেছে— সঙ্গে অর্থদান তো আছেই। কুলীন ব্রাহ্মণের সংখ্যাল্পতা ও গৌরীদান প্রথার কারণে কন্যার পিতা অতি বৃদ্ধের কাছেও কন্যা সম্প্রদানে বাধ্য হয়েছেন। এমনও ঘটেছে বহু কুলীন ব্রাহ্মণ সারা জীবনে বিবাহের সময়েই তার বহু বালিকা স্ত্রীকে একবার মাত্র কন্যাগৃহেই দেখেছেন। (এ প্রসঙ্গে রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্বস্ব' (১৮৫৪) নাটকটির কথা স্মরণ করা যেতে পারে) সেই সময় থেকে এইভাবে সমাজে বর পণের প্রতিষ্ঠা। বহু ছড়াতে এই বর পণের উল্লেখ। যেমন একটি দৃষ্টান্ত—

"আজ ছেমরীর এদিক ওদিক কাল ছেমরীর বিয়া,
ছেমরীকে নিয়ে যাবে ঢাকের বাড়ি দিয়া।
মা কান্দবেন, মা কান্দবেন ধূলায় লুটিয়ে
বাপ কান্দবেন, বাপ কান্দবেন দরবারে বসিয়ে।
সেই যে বাপ টাকা দিয়াছে পেটরাটি ভরিয়ে,
ভাই কান্দবেন, ভাই কান্দবেন আঁচল ধরিয়ে।
সেই যে ভাই কাপড় দিয়াছেন আলনাটি সাজিয়ে।" (ঢাকা)

'পেটরাটি' ভরে টাকা দেওয়া, আলনা ও কাপড় দেওয়া ইত্যাদির মধ্যেই বরপণের নির্মম সত্যটি বিধৃত। আর একটি দৃষ্টান্ত—

"ও পারেতে কুল গাছটি নৈ ছাগলে খায়,
তার তলা দে আমার খোকন বিয়ে কর্তে যায়।
বিয়ে কর্তে গিয়ে খোকন কি পায় যৌতুক?
হাতে পায়ে হীরের বালা মাথার মুটুক।
শাশুড়ী এসে বলে জামাই কেমন না কালো।
শ্বশুর এসে বলে জামাই ঘর করেছে আলো।"

—উল্লেখ্য খোকনের বিবাহ দিতে গিয়ে অভিভাবকের কাছে সে কি পাচ্ছে এটিই বড় হয়ে ওঠে।

উত্তর বৈদিক যুগে বাল্য বিবাহ প্রচলিত ছিল। তাই বিবাহযোগ্যা বালিকার বিভিন্ন নাম

নির্দিষ্ট হয়েছিল। পরাশরের মতে 'গৌরী' হল আট বছরের বালিকা, ন'বছরের বালিকা 'রোহিনী' দশ বছরের বালিকা হল 'কন্যা' এবং তদূর্ধ্ব হলে 'রজস্বলা'। হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ী দশ বছর বয়সের মধ্যে কন্যা বিবাহ আবশ্যক। মধ্য যুগে কৌলীন্য প্রথার নায়কত্বে আদর্শ হয় 'গৌরী' বিবাহ। বালিকার আট বছর অতিক্রান্ত হলে সহজে কন্যার বিবাহ হত না এবং সমাজ থেকে সেই পরিবারকে পতিত হতে হত। অষ্টাদশ শতকের শাক্তগানে সেই বিষয়টি বিশেষভাবে বলা হয়েছে। অষ্টম বর্ষীয়া বালিকাকে যেভাবেই হোক পিতা-মাতা বিবাহ দিতেন— এমনকি বৃদ্ধ বরের সঙ্গেও। অতঃপর পিতামাতার দুর্বিষহ যন্ত্রণা! শাক্তগানে দেখা যায় গৌরী উমাকে বৃদ্ধ শিবের হাতে অর্পণ ক'রে হিমালয়-মেনকার ক্রন্দন। যা আসলে বাংলার অসংখ্য হতভাগ্য পিতা-মাতার ক্রন্দনেরই প্রতিচ্ছবি। বাংলা ছড়াতে, অধিবাসের দিনেও ক্রীড়ারত বালিকার পরদিনেই শ্বশুরালয়ে গমনের অনিবার্যতা প্রকাশ পেয়েছে—

'আজ ময়নার খেলা ধূলা কাল ময়নার বিয়া,
ময়নারে যে লইয়া যাইব ঢোলক বাজাইয়া।
ময়না যাইব শ্বশুর বাড়ী সঙ্গে যাইবে কে ?
ঘরে আছে হুলো বিড়াল কোমর বেঁধেছে।' —ঢাকা

আবার কখনো বালিকা বোন তারই মত খেলার সঙ্গী পাওয়ার আকাঙক্ষায় দাদাকে বউ আনার জন্য আব্দার করছে—

দাদা গো দাদা শহরে যাও
তিন টাকা করে মাইনে পাও।।
দাদার গলায় তুলসী মালা।
বউ বরণে চন্দ্রকলা।।
হেই দাদা, তোমার পায়ে পড়ি।
বউ এনে দাও খেলা করি।।

বালিকা কন্যাকে পরের ঘরে দিতে গিয়েও, পিতা-মাতার মন দিতে চায় না, দুশ্চিন্তায় যন্ত্রণায় পিতা-মাতার হৃদয় কেঁদে ওঠে—

'আমতলায় ঝামুর ঝুমুর কলাতলায় বিয়ে।
ঐ আস্‌তেছে পাচির বর গামছা মাথায় দিয়ে।।
ও গামছা নেব না,
মাইয়া বিয়া দেব না,
কাচা মাইয়ে দুধির সর,
কেমন করবে পরের ঘর?
পরে এট্‌টা কবে,
ফুলে ফুলে কান্‌বে।
ছইয়ে নাও দেখ্‌বে।
বাবা বলে ডাক্‌বে।'[৭] —খুলনা

বাংলায় হিন্দুদের বিবাহ প্রথার মধ্যে রাক্ষস বিবাহের স্মৃতি অধিকতর স্পষ্ট। এ

থেকে বোঝা যায় বাংলাদেশে রাক্ষস বিবাহের প্রচলন ছিল বেশি। যেহেতু আর্যরা অনেক পরে পূর্বদেশে এসেছিল, তাই তার আগেই অনার্যদের সঙ্গে তাদের সমন্বয় অনেকটাই হয়ে গিয়েছিল। ফলে বাংলায় অনার্য সংস্কৃতি ও আর্য সংস্কৃতির তীব্র সংঘাত ঘটা কঠিন ছিল এবং এর ফলে বাংলায় অনার্য সংস্কৃতি অনেকটাই অবিকৃত থেকে গেছে। বাংলায় বিভিন্ন উপজাতি সমাজের দিকে তাকালে তা এখনো স্পষ্টভাবেই বোঝা যায়। উপজাতি সমাজে প্রচলিত রাক্ষস বিবাহ ও বিভিন্ন প্রথা বাঙালী হিন্দুদের বিবাহ রীতি ও স্ত্রী-আচারের মধ্যে প্রবলভাবে বিদ্যমান। অবশ্য ভারতবর্ষে প্রবেশ করে নারীর সংখ্যাল্পতার জন্য আর্যরাও নারী লুণ্ঠন করেই বিবাহ করত— ঋগবেদ তার সাক্ষ্য। কিন্তু পরবর্তীকালে যাগযজ্ঞ সম্বলিত ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য ও প্রজাপত্য রীতিই তাদের মধ্যে কৌলীন্য পেয়েছিল, আর্য প্রভাবে প্রভাবান্বিত হিন্দু শাস্ত্রগুলিতে তা অস্পষ্ট নেই। পক্ষান্তরে দেশীয় অনার্য গোষ্ঠীর মধ্যে রামায়ণ-মহাভারতের যুগের অনেক পরেও— এমন কি এখনও এই জাতীয় বিবাহবিধি যে প্রচলিত আছে তা দুর্লক্ষ্য নয়। আর আর্যীকৃত হওয়া সত্ত্বেও, ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের দ্বারা সংস্কৃত হলেও হিন্দু বাঙালীর বিবাহ অনুষ্ঠানে ঐ গোষ্ঠী জীবন ও রাক্ষস বিবাহের চিহ্নই অম্লান হয়ে আছে। যেমন কয়েকটি চিহ্ন :

(ক) 'বধূ' বহন ক'রে আনার অর্থ দ্যোতনা পূর্বেই উল্লিখিত হযেছে। কন্যাকে লুণ্ঠন করা হত ব'লে এখনও বৌ (< বধূ) বা বধূ শব্দটির ব্যাপক প্রচলন আছে।

(খ) কন্যা লুণ্ঠন করতে গিয়ে কন্যার ভ্রাতাদের দ্বারা বিশেষভাবে বর ও বরযাত্রীকে আক্রান্ত হতে হত। ফলে এখনও 'শালা' (শ্যালক) হীনবাচক অর্থে বা গালি দিতে ব্যবহৃত হয়।

(গ) বর যে পথে বিবাহ করতে যায়, সেই পথেই ফেরে না। নারী-লুণ্ঠনকারী আত্মরক্ষার্থেই অন্যপথে গোপনে পলায়ন করত। ফলে এটি বর্তমানে প্রথায় রূপান্তরিত হয়েছে।[৭ক]

(ঘ) কন্যাগৃহে প্রবেশকালে বরকে আটকানো (দোর আটকানো) বা বাসরঘরে প্রবেশে বাধাদান, বিভিন্নভাবে বরকে বোকা বানানো বা অপ্রতিভ করার চেষ্টা ইত্যাদিব মধ্যে পাত্র ও পাত্রীপক্ষের সংগ্রামের চিহ্নই ফুটে ওঠে।

(ঙ) বর বিবাহ করতে যায় কন্যাগৃহে, সদলবলে। কিন্তু কন্যা বিবাহ করতে আসে না। বিবাহে যারা বরযাত্রী তারা আসলে বরের গোষ্ঠীর মানুষ, বরের নেতৃত্বে এক যুদ্ধবাহিনী হিসেবে তারা সমবেতভাবে অন্যগোষ্ঠী থেকে বরকে নারী লুণ্ঠন করতে সাহায্য করত। আফ্রিকার ওয়াতাবেতো বা ওয়াটেইটা প্রভৃতি আদিম জাতির মধ্যে পলায়নপর নববধূকে বা কন্যাকে বরের কয়েকজন বন্ধু-বরের সঙ্গেই তাকে গভীর অরণ্য থেকে খুঁজে বা ধরে নিয়ে আসে এবং শ্রমের পুরস্কার স্বরূপ বর কন্যাটির সঙ্গে সহযোগী বন্ধুদের দৈহিক সম্পর্ক স্থাপনের অধিকার প্রদান করে সাময়িকভাবে।[৮] বাংলাদেশে কন্যাযাত্রী প্রথা পরে বরযাত্রীর সাদৃশ্যেই সৃষ্ট হয বলে অনুমান করা হয়।

(চ) গাঁটছড়া বা গ্রন্থিবন্ধন সম্পর্কে পণ্ডিতদের মত হল এই যে কন্যার

ছিন্তাইকারী বর নিজ বস্ত্রে কন্যাকে বেঁধে নিয়ে আসত, তা থেকেই এই প্রথা।[৯]

(ছ) ড. মোমেন চৌধুরী বেশ কিছু তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে জানিয়েছেন, "বরের হাতে জাঁতি, বধূর হাতে নোয়া, সিঁথিতে সিন্দুর এ সবই বিস্মৃত যুগের ছিনতাইকৃত বিবাহের স্মারকচিহ্ন। বরের হাতে জাঁতি হল অস্ত্রের প্রতীক, যে অস্ত্রের সাহায্যে সে অন্য গোত্র থেকে কন্যা ছিনতাই ক'রে আনতো। নববধূব সিঁথির সিন্দুর হলো রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের স্মৃতিচিহ্ন। আর ছিনতাইকৃত কন্যাকে স্বগৃহে এনে লোহার বেড়ি পরিয়ে আটকে রাখার স্মৃতিই বহন করছে বিবাহের পর বধূর হাতের নোয়া।

বিবাহমণ্ডপ বা ছাদনাতলাও একই লক্ষণযুক্ত বলে প্রতীয়মান হয়। গাছের গুঁড়িকেই সাধারণত মণ্ডপ বলে। কন্যা ছিনতাই ক'রে এনে গাছের গুঁড়িতে বেঁধে রাখা হতো। সুতরাং যে গাছের গুঁড়িতে বাঁধা হতো সেই গাছের তলাকেই ছাদনাতলা বলা হয়ে থাকে। এখন গাছের তলায় বিবাহ হয় না; মণ্ডপ বা ছাদনাতলা তৈরী হয় গৃহ প্রাঙ্গণে অথবা প্রশস্ত কক্ষে।"[১০] —এই মত যদি সর্বাংশে সমর্থনযোগ্য নাও হয়, তবু একেবারে সমর্থন না করারও যুক্তি থাকে না।

যাইহোক উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে নিঃসংশয়ে সিদ্ধান্তে আসা যায় যে বাঙালীর বিবাহানুষ্ঠানের অধিকাংশ আচার অনুষ্ঠানে ছিনতাইকৃত বিবাহের বৈশিষ্ট্য নিহিত থাকায় এই বিবাহ নিঃসন্দেহে রাক্ষস বিবাহের অনুরূপ ছিল। শুধু আচার অনুষ্ঠানেই নয়, বাংলার বহু লৌকিক ছড়ার মধ্যেও তার সাক্ষ্য আছে। যেমন দু'একটি দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা যাক :

"আগে যায় রে বারো বেহারা, পিছে যায় রে ডুলি,
দাঁড়াও কাহার ভাই মাকে কিছু বলি
মা বড় নির্বুদ্ধ কেঁদে কেন মর?
আপনি ভাবিয়া দেখ কার ঘর কর।"

ছড়াটি লক্ষ্য করলে দেখা যায় ডুলিতে করে কন্যাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, সামনে বারোজন বেহারা— যেন প্রতিপক্ষের আক্রমণ প্রতিহত করার রীতিমত প্রস্তুতি। ক্রন্দনরতা মাকে শেষবারের মত যেন কন্যার কিছু বলার আকুলতা! সমস্ত চিত্রটির মধ্যে জয়ী বর বাহুবলের দ্বারা কন্যাকে যে নিয়ে যাচ্ছে সেই ভাবটিই স্পষ্ট।

আর একটি ছড়া—

"যাওরে খোকন যাও হস্ত নাইড়া যাও।
তোমার লাইগা সাজাইছে বত্রিশ দাঁড়ের নাও।।
বত্রিশ দাঁড়ের নাওখানি ঝলকে ওঠে পানি।
ধীরে ধীরে যাওরে মাঝি মায়ের কান্দন শুনি।।
মাসি কান্দেন পিসি কান্দেন সকলি কান্দার পর।
পেট পুড়ানী মায়ে কান্দেন বেলা আড়াই পোহর।।
বড় বউ কান্দন করেন আমার দোসর ননদকে নিল হারিয়া।।
ছোট বউ কান্দন করেন চক্ষে তেল দিয়া।

আমার দোসর ননদ কে নিল হরিয়া।।' — ঢাকা

এখানে খোকন আসলে খুকুমণি। বত্রিশ দাঁড়ের দ্রুতগামী নৌকায় কন্যাকে নিয়ে যাওয়ার চিত্র প্রদত্ত হয়েছে। ননদকে নিয়ে যাওয়ায় ভ্রাতৃবধূরা দুঃখিত হয় না— চোখে তেল দিয়ে কাঁদে, কিন্তু তাদের কথায় স্পষ্ট যে 'ননদকে নিল হরিয়া'।

ড. আশরাফ সিদ্দিকী লোকধাঁধা বা ডাকের ছড়ামূলক ধাঁধাগুলিতে প্রাচীন যুগে কন্যাকে অপহরণ করার প্রথার প্রতিফলন লক্ষ্য করেছেন ঃ ডাকের এই ছড়ামূলক ধাঁধাগুলিতে— কন্যাকে প্রাচীন যুগে ছিনিয়ে নেবার যে প্রথা ছিল, যা প্রায় সব আদিম জাতির মধ্যেই প্রচলিত ছিল, তারই 'সারভাইভাল' বলে মনে হয়।"[১১] এমন একটি প্রশ্নোত্তরমূলক ধাঁধা —

"১ম পক্ষ। কি—রে—এ—এ—এ—এ— ,
সূর্য বন্দম তারা বন্দম/ অনাদি আদি বন্দম
বন্দম রসুল পেগাম্বর/ কি—রে—এ—এ—এ—এ—
হানুফা আইলাম বিবি সোনাভানের শহর।
কি—রে—এ—এ—এ—এ—
আইলো বীর হানুফা বসলো খাটে
উঠো বিবি সোনাভান/ সাজাও গুয়া পান
কি—রে—এ—এ—এ—এ—
যদি পান না দাও বিবি তবে/ আইস জঙ্গের ময়দান!

২য় পক্ষ। আঁ—আঁ—আঁ—আঁ—
কি—রে—এ—এ—এ—এ—
কোন বেটা হনুমান তার কেয়ছা গর্দান
তখতের উপর বইসা রইছে আমার সোনাভান।
কি—রে—এ—এ—এ—এ—
হনুমানে গলায় দিবে গজ মুক্তার হার
বেগুন তলার হনুমান তার কেয়ছা অহঙ্কার।"[১২]

বাংলা লোকসাহিত্যে বিবাহ বিষয়ক বহু ছড়ার অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। যেহেতু কন্যাকেই স্বগৃহ ত্যাগ ক'রে শ্বশুরালয়ে যেতে হয়, তাই কন্যা হারানোর যন্ত্রণায়, এই ছড়াগুলির কেন্দ্রবিন্দুতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কন্যা অধিষ্ঠান করেছে। কন্যার বিবাহ, অধিবাস, কন্যাদান, কন্যাবিদায়— ইত্যাদিকে উপজীব্য ক'রে বহু ছড়ার সৃষ্টি। আবার শ্বশুরালয়ে বাবা-মায়ের আদর নেই, সেখানে কন্যার কাজকর্ম কর্তব্য ও কর্তব্যবিচ্যুতিকে কেন্দ্র ক'রে, স্বামীগৃহে কন্যার যন্ত্রণা বিষয়ক বহু ছড়াও রচিত হয়েছে। এমন একটি ছড়ার দৃষ্টান্ত —

"আড়া বনে বাড়া ভানি ঢেঁকি উঠে না,
লাল শাড়ি পর্য্যা থাকি জামাই আইয়ে না।
শিককায় থুইলাম পিঠাখানি তাও পাইলাম না,
কাঁচা কঞ্চির বাড়ি আমার পিঠে কুলায় না।"

পক্ষান্তরে খোকা বা খোকার বিয়ে করতে যাওয়ার ছড়ায় বেদনার চিহ্ন নেই, সেখানে যে খোকনের আনন্দ ও শৌর্যই প্রকাশিত, তা লক্ষ্য করা যায়। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের লোকসাহিত্য, (২য় খণ্ড) গ্রন্থে, 'কন্যা আন' শীর্ষক ছড়াগুলি তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আবার 'জোড় পুতুলের বিয়ে' শীর্ষক ছড়াগুলিতে পুতুলের বিবাহকে কেন্দ্র ক'রে সৃষ্ট ছড়াগুলিতেও বালিকা বধূর আনন্দ বেদনাই প্রকাশিত হয়েছে।

বাংলাদেশে হিন্দুদের মধ্যে বহুপত্নীবরণ প্রচলিত ছিল তার প্রমাণও লোকসাহিত্যে লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন ছড়া প্রবাদ লোককথায় দেখা যায় একাধিক বিবাহের জন্য সতীন সমস্যা উদ্ভূত হয়েছিল এবং তা ছিল খুবই মর্মান্তিক। রূপকথায় কোনো এক রাণী রাজার একটু বেশি প্রিয় হলে, অন্য রাণীরা হিংসার বশবর্তী হয়ে তার বিরুদ্ধে রাজার মন বিষিয়ে দেয়। বহু প্রবাদে 'সতীন কেটে আলতা' পরার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। চণ্ডীমঙ্গলে ফুল্লরা প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবে সুন্দরী চণ্ডীদেবীকে 'বারমাস্যায়' তার বার মাসের দুঃখ যন্ত্রণার কথা বলে দেবীকে বিতাড়িত করার চেষ্টা করেছে। ছড়াতেও সতীনের বিরুদ্ধে বিষোদগার প্রকট। যেমন—

"মাঝখানে তালগাছ কাক ঝুল খায়।
তার পরদিন রসবতী বাপের বাড়ী যায়।
বাবার জন্য কি এনেছো?
লক্ষ টাকার ঘোড়া।
মায়ের জন্য কি এনেছো?
মাথা বাঁধার ধড়া।
ভাইয়ের জন্য কি এনেছো?
দুদ্ খাবার বাটি।
ভাজের জন্য কি এনেছো?
হেঁসেলের ঘটি।
সাত বন্ধু সতীন ঝি সে মায়ের,
তার জন্য কি এনেছো?
পুঁটি মাছের পঁটা।"[১৩]

—লক্ষণীয় সতীন ঝি-এর জন্য রসবতীর বিন্দুমাত্র ঔদার্য নেই, তার জন্য সে চূড়ান্তভাবেই কৃপণা। সতীনকে উপজীব্য করে ধাঁধাও দুর্লভ নয়:

তিনখানা রুটি
ওরা দু মা বেটি
খাবে কিন্তু গোটাগুটি।"

(উত্তর - সতীন দুজন ও এক মেয়ে)

কিংবা—

"নতুন বরকনে বাড়ীতে আসায় ঘর থেকে একজন স্ত্রীলোক বেরিয়ে এসে বরকে নমস্কার করল, কিন্তু কনেকে নমস্কার করল না। ঐ স্ত্রীলোকটি কে?"

(উত্তর - বড় সতীন)

সতীনকে নিয়ে বহু প্রবাদও রচিত হয়েছে। কয়েকটি উল্লেখ করা হ'ল:

১. অশথ কেটে বসত করি;/সতীন কেটে আলতা পরি।

২. এক ছিলাম ঘরের মাঝে মাথার ঠাকুর।
সতীন এল আস্তাকুঁড়ের হলাম কুকুর।

৩. দিন গেল হেলায় ফেলায়,/রাত হল সতীনের জ্বালায়।

৪. আন সতীন তবু সয়,/বোন-সতীন কখনও নয়।

বহু বিবাহের এই বিষময় ফল সৎমাকে কেন্দ্র ক'রেও। তাই প্রবাদে বলা হয়েছে:

১. সৎমার ছেন্দা, পান্তাভাতে ঘি।
মাথাটা মুড়িয়ে এস, তেল-পলাটা দি।

২. সৎমার বাণী,/তল দিয়ে মূল কাটে,/উপরে ঢালে পানি।[১৪]

বিভিন্ন রূপকথায় সৎমার হিংসা ও সৎ ছেলের প্রতি অত্যাচারের কাহিনী আর স্মরণ করিয়ে দেবার প্রয়োজন বোধ হয় নেই। বস্তুত বহুবিবাহের এই বিষময় ফল বাংলার লোকসাহিত্যে এইভাবে চিরসত্য হয়ে থাকবে।

বাংলাদেশে শালী বরণ প্রথাও প্রচলিত ছিল। কুলীন ব্রাহ্মণের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দেবার পর কন্যার কনিষ্ঠা ভগিনীদের দান হিসেবে অর্পণ করা হত। রামায়ণ মহাভারতের যুগেও এ প্রথা প্রচলিত ছিল। যেমন বাসুদেব দেবকী রাজার সাত কন্যাকে বিবাহ করেন। অতদূর যাওয়ার দরকার নেই, বাংলা সাহিত্যেব মধ্যযুগে নাথ সাহিত্যে বা ধর্মমঙ্গল কাব্যেই তার দৃষ্টান্ত আছে। গোপীচন্দ্র বা ময়নামতীর গানে জ্যেষ্ঠা অদুনার সঙ্গে গোপীচন্দ্রের বিবাহ হলে সে দান হিসেবে কনিষ্ঠা পদুনাকে পায়। লাউসেনও বর্ধমান রাজের দুই কন্যা অমলা ও বিমলাকে বিবাহ করে। কাজেই এটা একটা বিশিষ্ট সামাজিক রীতি ছিল। ক্রমে আধুনিক যুগেব সূচনাতেই এবং হিন্দু বিবাহ আইনে বহুবিবাহ বন্ধ হলে আজও জামাইবাবুর সঙ্গে শ্যালিকার ঠাট্টা-রসিকতার সম্পর্কটি বজায় আছে এই কারণেই। সে যাই হোক শ্যালিকা বরণের এই বিষয়টি বাংলার লৌকিক তিন কন্যার ছড়াগুলিতে সাক্ষ্য রেখে গেছে।

সেই বহু প্রচলিত ছড়ার দৃষ্টান্ত:

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান,
শিব ঠাকুরের বিয়ে হল তিন কন্যে দান।
এক কন্যা রাঁধেন বাড়েন এক কন্যে খান,

এক কন্যা গোঁসা করে বাপের বাড়ী যান।
বাপেদের তেল সিঁদুব মালিদের ফুল,
এমন খোঁপা বেঁধে দিব হাজার টাকা মূল।[১৫]

এই শিবঠাকুর যে একজন সাধারণ মানুষ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বিভিন্ন ছড়া ও পাঠান্তরে শিবঠাকুর কখনো কখনো 'শিব সদাগর', বা 'বাবাঠাকুর' নামেও উল্লিখিত হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'ভাবে গতিকে আমার সন্দেহ হইতেছে, শিবঠাকুর ও শিবু সদাগর লোকটি একই হইবেন।'[১৬] শিবঠাকুর অথবা শিবু সদাগর— তিনি যাই হোন না কেন, তিনি এক কন্যাকে বিবাহ করেন, আর দু'কন্যাকে দান হিসেবে পান সেই সামাজিক বিধির কারণেই। কালের পরিবর্তনে আর যাই হোক শালী বরণের ঐতিহাসিক সত্যটি আর এই ছড়ার কল্যাণে বিলুপ্ত হবার নয়। প্রাগুক্ত চার নং প্রবাদটিতে সেই সত্যই বিধৃত আছে।

বিবাহ : লোকসঙ্গীতে তার প্রতিফলন

আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করেছি যে, লোকসঙ্গীতে জীবনের ব্যবহারিক ও বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক দিকগুলির প্রতিফলন সর্বাপেক্ষা বেশি। জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, ধর্মানুষ্ঠান— ইত্যাদি সব ক্ষেত্রেই লোকজীবনের আনন্দ-বেদনা, ইচ্ছে-অনিচ্ছে, বাদ-প্রতিবাদ— কখনো বা বিভিন্ন বিষয় সংক্রান্ত নীতি-নির্দেশ লোকসঙ্গীতের মাধ্যমে প্রকাশ লাভ করে; কেননা লোকসঙ্গীতে মানুষের প্রাণ ও জীবনবোধের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। সুতরাং অন্যান্য বিষয়ের মত লোকসঙ্গীতে মানুষের বিবাহ-সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্যগুলিরও অনিবার্য উপস্থিতি। এক্ষেত্রে আমরা দু'টি দিক থেকেই বিষয়টি লক্ষ্য করব; প্রথমত, বিবাহ ও বিবাহ-অনুষঙ্গকেন্দ্রিক বাংলা লোক-সঙ্গীতগুলিকে পর্যবেক্ষণ করব— যেগুলি মূলত বিবাহের উৎসব অনুষ্ঠান অথবা ঐ সব অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট হয়েছে এবং দ্বিতীয়ত, বিবাহ ও বিবাহঅনুষঙ্গ নিরপেক্ষ বাংলা লোকসঙ্গীত— যেগুলিতে বাংলার বিবাহবিধি ও বিবাহ সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্যসমূহের ছায়াপাত ঘটেছে।

(ক) বিবাহ ও বিবাহ-অনুষঙ্গ কেন্দ্রিক বাংলা লোকসঙ্গীত:

১) পাতানাচের গান :

'পাতানাচের গান' বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষেই হ'তে পারে বটে, তবে এক সময় সম্ভবত 'এই নৃত্যানুষ্ঠানের মধ্য দিয়া জীবনের সখীত্ব পাতানো হইত, অর্থাৎ ভবিষ্যৎ জীবনের সঙ্গী এবং সঙ্গিনী মনোনীত করা হইত বলিয়া ইহার নাম পাতানাচা।'[১৭] সুতরাং এটি একপ্রকার বিবাহ সম্পর্কিত ব্যাপার, এবং এটি বিবাহের প্রাথমিক পর্ব, কেননা সামাজিক মতে জীবনসঙ্গী বা সঙ্গিনী নির্বাচন ও অন্বয়ই অন্য কথায় বিবাহ। বিবাহ সংক্রান্ত পাতা নাচের বিভিন্ন গানগুলি লক্ষ্য করলে উপর্যুক্ত যৌক্তিকতার সারবত্তা প্রমাণ হবে। আমরা দৃষ্টান্ত হিসেবে আংশিক উদ্ধৃত করলাম :

'পাহাড়ে তোর বটে ঘর তাই এসেছি সাঙ্গাবর,
সাঙ্গা হবার বড়োই মনে ছিল সাধ
বেহায়া পুরুষে দাগা দিল।'

উল্লেখ্য, সাঁগা বা সাঙ্গা হ'ল নিম্নবর্ণের হিন্দু সমাজে প্রচলিত বিবাহ; মূলত বিধবার বিবাহ হলেও সধবারাও সাঙ্গা করত। অতএব এটি দ্বিতীয় বিবাহ।

(২) পানখিলের গান : পূর্ব মৈমনসিংহ, পশ্চিম শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা— ইত্যাদি অঞ্চলে হিন্দুদের বিবাহে পানখিল নামক যে ঐন্দ্রজালিক সংস্কার ও আচার আছে, তাকে কেন্দ্র ক'রে এই জাতীয় গান মহিলাদের দ্বারা গীত হয়। যেমন—

পুরবাসিগণ, সুপারি কাট গো নারীগণ।
আইস আইস আইস মিলি— আইসা দাও পান খিলি
যার হস্তে সোনার কাটারী, সে আইসা কাটে সুপারি।

(৩) পাশা খেলার গান : হিন্দু মুসলমান উভয় সমাজেই পাশা খেলা নামক এক প্রাচীন বিবাহ আচার সারা বাংলাব্যাপী পুরুষ সমাজে প্রচলিত। এই অনুষ্ঠানে বর-কনের পাশা খেলার সময় পাশা খেলার গান গীত হয়। যেমন অংশবিশেষ—

পাশা খেলে কে গো, পাশা চালে কে গো,
পাশা খেলে কিশোর আর কিশোরী।
খেলিতে খেলিতে পাশা, হারিলেন শ্রীহরি। ইত্যাদি

(৪) ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট বা মৈমনসিংহের কোনো কোনো অঞ্চলের একটি বিবাহ আচার 'ফল ভাসানো' নামক অনুষ্ঠান। মেয়েরা এই অনুষ্ঠানের সময় যে গান গায় তাই-ই ফল ভাসানোর গীত।

দেখ, প্রভাত সময় ফল ভাসাইতে যায় গো বধূ
ক্ষীর নদীর সাগর
নাগর যে জাগরণ কইর‍্যা উঠিল সুন্দরী,
ফল ভাসানের সময় হল চলে তরাতরি... ইত্যাদি (আংশিক)

(৫) বাসি বিবাহের গান : বাংলায় হিন্দুদের কোনো কোনো জাতির মধ্যে বিবাহের পরদিন সিদুঁর দান সংক্রান্ত একটি অনুষ্ঠান হয় যাকে বাসি বিবাহ বলা হয়। এই স্ত্রী আচারে যে মেয়েলী গান শুনতে পাওয়া যায় তাই বাসি বিয়ের গান। যেমন—

'শ্রীরামচন্দ্রের বাসি বিয়া মিথিলায়।
দেখতে রামের বিয়া স্বর্গপুরের বাসী যারা
গোপনে থেইকে চায়।
যেমন রাম সাজিল কমল আঁখি
তেমনই সীতা বিধুমুখী তরুতলে দাঁড়াইল।'... ইত্যাদি

(৬) বিবাহের গান : যে সমস্ত ব্যবহারিক সঙ্গীত (functional song) বিবাহ অনুষ্ঠানের সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং যা মূলত মহিলাদের দ্বারাই গীত হয় তাই-ই বিবাহের গান। সাধারণত তিনটি ভাগে (আয়োজন, অনুষ্ঠান এবং সমাপন) এই

শ্রেণীর গানগুলি বিভক্ত। একটি বিবাহের গানের নমুনা:

'কেনার বাবা আসেছিল, সম্বন্ধ জুড়িতে,
চারধারে কাঁটার বেড়া মধ্যে খড় ঘর,
খুড়া বিনে কি কি সাজ দিবে গো,
খুড়ির বিনে খুঁজধনে কি কি গয়না সাজাবে গো।
ঐ যে কি কি সাজ দিবে গো।।' (আয়োজন)

(৭) বৌ-বরণের গীত: বর নববধূকে নিজ গৃহে নিয়ে এলে নববধূকে আনুষ্ঠানিকভাবে বরণ করা হয় এবং সেই সময় মহিলাদের দ্বারা এই জাতীয় গান গীত হয়। যেমন একটি গান:

'কালী তারা ধূমাবতী, চরণে চরণে চতুর অতি,
সিংহ পৃষ্ঠে ভগবতী মিথিলাতে আগমন।
বরণ করে বধূগণ, বরণ করে আইয়োগণ।।' ...

(৮) বৌ-নাচের গান: বাংলাদেশের শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা, মৈমনসিংহ এবং আরো কোনো কোনো অঞ্চলে বিবাহকালে স্ত্রী নৃত্যের দ্বারা বরকে বরণ করত। বস্তুত 'নৃত্যগুণ বাঙালী বধূর একদিন সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ বলিয়া গণ্য হইত, বিবাহের সময় বধূর আর কোন গুণেরই বিচার হইত না.'— যাই হোক এই অনুষ্ঠানে গীত মেয়েলী গান হল বৌ-নাচের গান। বিভিন্ন বিষয়ই এই গানের উপজীব্য এবং এর কোনো বিশিষ্টতা না থাকায় দৃষ্টান্ত দেওয়া হ'ল না।

খ) বিবাহ নিরপেক্ষ বাংলা লোকসাহিত্যে বিবাহ সংক্রান্ত বিষয়ের প্রতিফলন: প্রাগুক্ত গানগুলির আনুষ্ঠানিক মূল্য অপরিসীম। বিবাহের বিভিন্ন পর্বে যেমন বাসি বিবাহ, পানখিল— ইত্যাদি পর্ব বা অনুষ্ঠানে গানগুলি গীত হয়। দ্বিতীয়ত, আরো উল্লেখযোগ্য বিষয় হ'ল, বিবাহের এই সমস্ত অনুষ্ঠানেই গানগুলির জন্ম। এবার বিবাহ-নিরপেক্ষ যে গানগুলির উল্লেখ করব সেগুলির উৎস বিবাহানুষ্ঠান না হলেও বিবাহ সংক্রান্ত বিভিন্ন ধ্যান-ধারণার প্রতিফলন এগুলিতে আছে। এছাড়া 'মালাবদল', 'গৌরীদান', 'বিবাহের গান'— ইত্যাদি কিছু গান আমরা উদ্ধৃত করব যেগুলি বিবাহ অনুষ্ঠানেও গীত হয় আবার বিবাহ অনুষ্ঠান ব্যতীত অন্যান্য উৎসব অনুষ্ঠানে অথবা অবসর বিনোদনের সময়েও গীত হয়। অর্থাৎ এই গানগুলির বিবাহ-অনুষ্ঠান নিরপেক্ষ অন্য একটি মূল্য আছে। যাইহোক, এই সমস্ত গানগুলি কীভাবে আমাদের বিবাহ-সংক্রান্ত বিভিন্ন সংস্কার, রীতি-নীতি ও বৈশিষ্ট্য প্রচ্ছন্নভাবে বহন ক'রে চলেছে তা দেখা যাক।

১। 'বলি, ইন্দ্ররাজন কি কারণে গুরু পত্নী করিলে হরণ।

'মামী হরণ করেছি যেমন বলেছে বেশ ইন্দ্ররাজন।

আমি জানাবো হে সেই বিবরণ শুনবে শ্রোতাগণ।।

....

'রাধারাণী তখন মালা আমার গলে দিল,
আমার সাথে বিবাহ ঐখানেতে হলো।
তারপর এখনও যে সাত পাক বাকী আছে,
একে একে সে সব কথা জানাই এ সভাতে।'

(বিবিধ পুরাণ-৬)

গুরুপত্নী বা মামীকে বিবাহ করা আত্মীয়বরণ (preferential marriage) যা হিন্দু-সমাজে অবাঞ্ছনীয়। প্রাগুক্তগানে শিশু বলে কৃষ্ণকে মালা বদল বা সাত পাকের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হয়েছে তার আব্দার শুনে। এইদুটি অনুষ্ঠান হলেই বিবাহ নিষ্পন্ন হয়। বড়দের অনুমতি সাপেক্ষেই ব্যাপারটি ঘটেছে, অতএব কৃষ্ণ নিজের দোষ স্খালনের সুযোগ পেল এবং তার বিবাহ বৈধ বলে স্বীকৃত হল। বিবাহে মালা বদল, শুভদৃষ্টি ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান; এগুলির মাধ্যমে বিবাহ স্বীকৃত হয়। এই নিয়ে বহু বিবাহের গানও আছে। যেমন, মালাবদল সংক্রান্ত গান:

'তুমি সে সুন্দর রাম রে, সীতারে করবা বিয়া,
কি কি গয়না আনছ রাম রে, সীতার লাগিয়া?
এনেছি এনেছি গয়না পেটরাটি ভরিয়া
ধর, সীতে, পর গয়না পেটরাটি খুলিয়া।'...

বা শুভদৃষ্টির সময় —

'ধইরা তোল ধইরা তোল রামের সিংহাসন।
ধইরা তোল সীতারই আসন।
রামের গলে শোলার মালা।
সীতার হস্তে সোনার বালা।
দুই মুখ চারি চোখে হইল দরশন।।
পুরোহিত আসিয়া বলে হইল শুভক্ষণ।।
রাজ হংসের পঞ্চ ডিম্ব ভাঙ্গ গো নিদিয়া।
ধৃতরার সহস্র প্রদীপ ধর গো তুলিয়া।।..:

২। বিবাহের বেশিরভাগ আচারই হল স্ত্রী-আচার অর্থাৎ শাস্ত্র নিরপেক্ষ আচার এবং এই আচারের গুরুত্বই সমধিক। আদিবাসী সমাজেও যাবতীয় বিবাহ আচার ও কর্তব্য কর্ম স্ত্রীদের হাতেই থাকে। পাতানাচের একটি গানে তা স্পষ্ট:

আখ বাড়ীর শেয়াল রাজা বনের রাজা বাঘ রে।
বিয়া ঘরে মেয়ে রাজা সমাস খুঁজে ভাগ রে।।

—'বিয়া ঘরে মেয়ে রাজা', অর্থাৎ বিবাহের আসরে নারীর প্রাধান্যই সর্বাধিক।

৩। বাংলাদেশে গান্ধর্ব (marriage by elopement) অ-সামাজিক। তাই এই বিবাহের সাধারণ রীতি অনুযায়ী প্রেমিক-প্রেমিকা পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করে। গানের মধ্যেও তার বহু দৃষ্টান্ত আছে। নিম্নে বিবাহ নিরপেক্ষ পাতানাচের গানের অংশবিশেষ লক্ষণীয় :

মনে করি আসাম যাব, জোড়া পাংখা খাটাইব
আসাম গেলে বধিবে পরাণ, হে বাঁকা শ্যাম।
ফাঁকি দিয়ে পালালি আসাম হে, বাঁকা শ্যাম।।

— প্রেমিকের সঙ্গে প্রেমিকার আসাম পালিয়ে যাওয়ার মনোবাসনা আর সার্থক হয় না, কারণ 'বাঁকা শ্যাম' বা প্রেমিক তাকে ফাঁকি দেবার জন্যই তাকে ফেলে পলায়ন করে।

বা—

'আপনার খাবো দাবো পরে কথা না শুনিব,
দিদি গো চল, দিদি, কাছাড় পালাবো।।'

৪। হিন্দু সমাজে পুরুষেরা প্রায়শই একাধিক বিবাহ করত। এই বহু পত্নীমূলক বিবাহের (polygamy) ফলে সতীন সমস্যা আসে। গানেও সতীন প্রসঙ্গ :

'বড়কারা আসিল সিনাই রে
সতীন ছাড়া ডুবালি আমায় রে
চাল মিলাতে ভুলাই গেছে
খাজার বাপে আসিল সিনাই রে
সতীন বাদে ডুবালি আমায়
আসতো ভাতে চুরি বান্ধ্যা দেন মিশাইয়ে।।

(পাতানাচ)

একাধিক বিবাহের আরো প্রমাণ, 'রাণীদের' নববধূকে বরণ করার ঘটনায়—

'ধান্য দূর্বা যত রাণী হস্তে উঠাইয়া,
যত ইতি দ্রব্য ছিল দিলাইন আগ্রিযা।'

(পাতানাচ)

— এখানে 'যত রাণী' বলতে কোনো ব্যক্তির একাধিক স্ত্রীদের কথাই বলা হয়েছে।

৫। হিন্দু-সমাজে কুলীন পুরুষ যে একাধিক বিবাহ করত তাই নয়, এমনকি বৃদ্ধ বয়সেও তাদের বিবাহের ইচ্ছা লুপ্ত হত না, অথবা বৃদ্ধ পুরুষও কিশোরীকে বিবাহ করত :

'শাক তুলতে গেলি মীনা তুললি লতা পাতা,
কি শাক তুললি মীনা বুড়ার সঙ্গে দেখা।
ওরে মীনা মইরা গেলো,

এমন সুন্দর মীনা বর হইল বুড়া।

(পাতানাচ)

বা —

'রস্যা বন্ধু গেল ছাড়িয়ে সদা মোর দাগ লগাই।
এমন রসের কালে কার সোয়ামী ঘরত নাই।
ছোড়ো কালে বিয়া দিলরে মা বাপের চোখে ছাই,
আরে রঙ্গুম হাই তুলি রলি কন্ হতীনের ছল্লা পাই।'

(লৌকিক প্রেম সঙ্গীত)

অথবা —

কার্তিক গণেশ দুইটি পুত্র মনের তনয়।
ইহা থুয়ে বুড়া শিব বিয়া করতে যায়।

(বাউল, শিবের গান)

— বলাবাহুল্য এই শিব বস্তুত কুলীন ব্রাহ্মণেরই প্রতিভূ।

৬। কুলীনের ঘরে কন্যাকে আট-দশ বছর বয়সের মধ্যেই কুলীন বংশেই বিবাহ দিতে হত। আমরা আগেই বলেছি আট বছরের কন্যাদানকে বলা হত গৌরীদান। শ্বশুরালয়ে সেই কন্যা স্বাভাবিক প্রবণতা অনুযায়ী দৌড়-ঝাঁপ বা খেলাধুলো করত,— আর শাশুড়ী-ননদীর দ্বারা রীতিমত তিরস্কৃত হত—

'সখীগণ সব নামল জলে, স্নান করে কুতূহলে
মনের আনন্দে করে খেলা
শাশুড়ী ননদীর ভয়, মনে কিছু নাহি হয়,
জল খেলাতে হইয়া মগন।' (বালার্কি)

গৌরীদানের এই চিত্রটি নিম্নলিখিত গানে আরো স্পষ্ট ব'লে এই প্রসঙ্গে উদ্ধার করা গেল :

'চল রঙ্গ দেখি গিয়া, আট বছরের গৌরীরে শঙ্করে করে বিয়া।
পূবমুখে রইছেন শিব গো বাঘ ছাল পরিয়া,'
পশ্চিমমুখী হিমালয় গো গৌরী কোলে লইয়া।
মাইয়া দান কইরা বাপে ফুরাইল দায়,
জ্বালাইয়া তুষের আগুন দিল মায়ের গায়।

(গৌরীদান উপলক্ষে গীত বিবাহের গান)

— গৌরীদান ও মায়ের যন্ত্রণাই এই গানটির উপজীব্য।

৭। শ্বশুরবাড়ি থেকে কন্যা সহজে পিতৃগৃহে আসতে পারত না। ফলে কন্যার যন্ত্রণা কোনো কোনো 'বারমাসী' গানে মর্মস্পর্শীভাবে ব্যক্ত হয়েছে। কখনো পতির সান্নিধ্যের অভাব কথনো পিত্রালয়ের জন্য ব্যাকুলতা দীর্ঘ এই গীতিগুলিতে প্রকাশিত হয়েছে।

পূর্বেই উল্লিখিত, হিন্দু বিবাহে একসময় বর শালীদের 'দান' হিসেবে পেত যা

শ্যালিকাবরণ (sororate) হিসেবে চিহ্নিত। পরে এক বিবাহ প্রচলিত হলে রঙ্গ রসিকতার মধ্যে সেই ইতিহাস সংগুপ্ত থাকে।

৮। শালী-বর সম্পর্ক :

'এসেছে বসেছে ভাবিছ কেনে; কোন রসবতী পড়েছে মনে,
রসবতী যদি পড়েছে মনে রসবতী ছাড়য়্যে এসেছে কেনে,
রসবতী তুমি মনের মতন আমার দিদি কি লয় হে রতন?

(বিবাহের গান)

৯। দেওর-বৌদি :

"আমার বাড়ী যান, হে দেওরা খাইতে দিব পান।
আর শুইতে দিবো শীতল পাটি যৈবন করব দান।"

(প্রেমসঙ্গীত)

উপর্যুক্ত সঙ্গীতটি 'দেবর, ভাসুর বরণ' (levirate) নামক প্রথাটি যে একসময় হিন্দু বিবাহে প্রচলিত ছিল, সেই সাক্ষ্যই দেয়। এখানে 'দেওরা' অর্থাৎ দেবরকে উদ্দেশ করেই একথা বলা হয়েছে।

১০। গোত্রান্তর :

'আপন গোত্র ছাড়ে দিয়ে, মাগো, পরের গোত্রয় দিলে
এমন নিঠুর, মাগো পাষাণে বাঁধিলে মাগো
(আমায়ে ত্যজিলে) . .   (বিবাহ)

একই গোত্রে বা টোটেমে বিবাহ নিষিদ্ধ যা নৃতত্ত্বের ভাষায় 'বহির্বিবাহ' বলে আখ্যায়িত হয়। হিন্দু বিবাহের গোত্রান্তর তাই-ই প্রমাণ করে। গানের মধ্যে গোত্রান্তরের বিষয়টিও তাই অনুপস্থিত থাকেনি— যেহেতু হিন্দুদের মধ্যে বিবাহ গোত্রান্তরেরই নামান্তর।

১১। কন্যাপণ : কন্যাপণ কোনো কোনো হিন্দু বিবাহে একসময় অচ্ছেদ্য ছিল— নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তগুলিই তার প্রমাণ—

ক. 'পরের রমণী দেখে কানাই কেন ভুলো,
নিজ সম্পত্তি বেচে দিয়ে বিবাহ কর।' ...   (বালার্কি)

খ. এক থালি ভাতের জন্যে রে বাপ-মা,
আমাক্ বেচ্যা খালেন— কি ও মাণিক রে ময়না রে। ...

(বিবাহের গান)

গ. 'বাবাজী, এত নিদারুণ টাকা লইছুন অকারণ।
টাকা লইয়া বাপে দূরে দিছুইন বিয়ার কবুল।

মরিয়া যাই গো আমি বাপের গলার জঞ্জাল।

বাবাজী, আমার এত নিদারুণ।'[১৮] —ইত্যাদি। (বিবাহের গান)

—এমন অসংখ্য গানের মধ্যে টাকা নিয়ে বিবাহ দেওয়ার জন্য পিতার প্রতি কন্যার তীব্র অভিমান প্রকাশ পেয়েছে। অভিমানিনী অবুঝ কন্যা তাই অকপটেই বলেছে যে একথালা ভাতের জন্যই যেন বাবা তাকে পরের ঘরে অর্থের বিনিময়ে বিক্রয় করে দিচ্ছে কিংবা কঠিন হৃদয় সম্পন্ন পিতার কাছে কন্যা, নিজেকে জঞ্জাল বলে মনে করেছে। উমা সঙ্গীতে মায়ের যন্ত্রণাই বেশি জায়গা জুড়ে আছে, আর আলোচ্য লোক-সঙ্গীতগুলিতে কন্যার যন্ত্রণাই তাদের জবানীতে বেশি প্রকাশিত হয়েছে। বিবাহের সময় তাদের এই কান্না এই গানগুলিতে যেন এখনো গুমরে ওঠে। অনুভূতির এই অকপট প্রকাশ লোকসঙ্গীতগুলির মধ্যেই বিশেষভাবে লভ্য:

রাজবংশী-গান : তাদের বিবাহ বৈশিষ্ট্য :

উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি অঞ্চলের রাজবংশী সমাজে বিবাহের রীতি-নীতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ধর্মের দিক থেকে এরা হিন্দু। কিন্তু বিবাহের ক্ষেত্রে হিন্দু বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে এই উপজাতিদের মধ্যে অন্যান্য যে বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা যায় তা বহুলাংশেই খাঁটি ভারতীয় ও অনার্য সংস্কৃতির পরিচয়বাহী। বস্তুত বঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতিতে আর্যীভবন যতটা ঘটেছে, রাজবংশী সমাজে ততটা লক্ষ্য করা যায় না। কন্যাপণ, বিধবা-বিবাহ, দেবর-ভাসুর বরণ, বহুপত্নী মূলক বিবাহ, —ইত্যাদি বিভিন্ন বিবাহ-রীতি তাদের সমাজে অনুসৃত হয়। এই অঞ্চলে ব্যবহৃত বাংলার একটি বিশিষ্ট উপভাষায় (পশ্চিম-কামরূপী উপভাষা) তাদের আদি-অকৃত্রিম জীবনযাত্রা ও সমাজ সংস্কারের যে ছবি ফুটে উঠেছে, বাংলা লোক-সাহিত্যের ভাণ্ডারটির বৈভব তাতে যে বেড়েছে সে বিষয়ে কারোরই সন্দিহান হওয়ার কারণ থাকে না।

রাজবংশী সমাজে কন্যাপণ নেওয়ারই রীতি। অর্থাৎ তাদের সমাজে কন্যাপণ দ্বারা বিবাহ (marriage by purchase)ই প্রচলিত। ফলে যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ না হ'লে পুরুষেরা বিবাহ করতে পারে না। কন্যার পিতাও উপযুক্ত পণ না পেলে কন্যা সম্প্রদান করে না। ফলে সময়মত বিবাহ না হলে যুবক-যুবতীর ক্ষোভ ও অভিভাবকেব প্রতি উষ্মা বহু গানে প্রকাশ পেয়েছে। অনেক সময় অর্থ সঙ্গতিহীন পুরুষ, কন্যার গৃহে অবস্থান ক'রে বেশ কয়েক বছরের জন্য বেগার খেটে শ্রমদান ক'রে কন্যা লাভ করে। অনেক উপজাতি সমাজে— যেমন সাঁওতালদের মধ্যেও এই প্রথা বর্তমান। যাইহোক, অবিবাহিত যুবক বা অবিবাহিতা নারীর এই মনোবেদনাকে উপজীব্য ক'রে যে অজস্র গান রচিত হয়েছে তার মধ্যে অনেকগুলি গানে কন্যাপণের প্রসঙ্গ এসেছে। যেমন একটি গানে অবিবাহিত পুরুষ আকুল হয়ে বলছে :

হাউসের (যৌবনের) দিন মোর যা'ছে রে বয়া (বহিয়া);

আর কত দিনে হবে রে বিয়া
উলু-লু দিয়া।।
দাদা, উতরে (উত্তরে) জড়িসুঁ কইন্যা (সম্বন্ধ করা/কন্যা জোড়া)
আশী টাকা পণ দিয়া;
নয়টার গাড়ীত্ যাছোঁ গে দাদা
হেলানি দিয়া।।...''

—আশীটাকা পণ-এর বিনিময়ে দাদা নিজের জন্য কন্যার সম্বন্ধ করেছে, তাই ভাইয়ের আক্ষেপ যে কবে তার বিবাহ হবে।

অনুরূপভাবে কন্যার গানগুলিতেও এই সংবাদ পাওয়া যায়। যেমন—

'ওভাগোনীর অন্তর ঝরেছে গে—
শাংকারিয়ার হড়পা দেখিয়া;
বাপ মড়াটার শোক পড়েছে
না খায় ব্যাচেয়া।
কতয় দিনে পিন্দাবে মোক শাংকা।।'

—অর্থাৎ শাংকারিয়ার হড়পা (শাঁখারীর বাক্স) দেখে অভাগিনীর অন্তর শাঁখা পরার জন্য ক্রন্দন করছে। এখনো বাবা তাকে বেচে খাচ্ছে না (অর্থাৎ পণ নিয়ে বিবাহ দিচ্ছে না—বহু গানেই এই বেচে খাওয়ার কথা আছে, যা বস্তুত বিবাহ দেওয়া বিষয়টিকেই বোঝায়) ব'লে কন্যা বাবাকে 'মড়া' এবং 'শোক-পড়া' বলে তিরস্কার করেছে।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কন্যার পিতা অধিক পণের প্রত্যাশায় বহু সম্বন্ধ ক'রেই চলে। বহু গানে তারও প্রমাণ আছে। দাদার উদ্দেশে কন্যা বলছে—

'দাদা রে,
যৈবন দেখি ছাতি ফাটে মোর।
ওরে মাও কয় ছোটো ছোটো—
দাদা, বেচে' না খায় বাপে;
আজি মাসে মাসে গুয়া কাটে
বেচে' না খায় দাদা—ঢক দ্যাখে।।'

—'মাসে মাসে গুয়া কাটে' বলতে বিবাহ-সম্বন্ধ পাকা করার জন্য তাদের সমাজে দু'পক্ষই পান-সুপারি আদান-প্রদান করে। যুবতী নারীর দুঃখ এই যে মাসে মাসে সম্বন্ধ পাকা হচ্ছে অথচ বিবাহ হচ্ছে না। এর অর্থ, সম্বন্ধ গড়া হচ্ছে এবং ভাঙা হচ্ছে—যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পণকে কেন্দ্র ক'রেই হয়ে থাকে।

অধিক পণের লোভে কোনো কোনো পাষাণ-হৃদয় পিতা বৃদ্ধ বা নাবালক বরের হাতেও নিজ কন্যাকে সম্প্রদান করে—এমন দৃষ্টান্তও বিরল নয়:

'.... ও আই, টাকার লোভত্ বুড়াক দিলেন—
আর মুলুকত্ বর নাই পালেন;'...

কিংবা একই কারণে অপ্রাপ্তবয়স্ক বরের হাতে কন্যাকে সম্প্রদান করা হয়—

"...মন মোর সোদায় ঝরে রে
দেখিয়া পাথার;
বাপো-মায় ব্যাচায়া খাইসে
নাবালক ভাতার।।"

রাজবংশী সমাজে বিধবা-বিবাহ যেমন প্রচলিত আছে তেমনি সধবাও স্বামী ত্যাগ ক'রে পুনরায় বিবাহ করতে পারে। কন্যাপণ, সধবা ও বিধবার বিবাহ বা নারীর উপপতি বরণ— ইত্যাদি বিষয়গুলি বস্তুত মাতৃতান্ত্রিক সমাজের ইঙ্গিতই বহন করে। খাসি, গারো প্রভৃতি মাতৃতান্ত্রিক সমাজের প্রভাব তাদের উপর কম-বেশি পড়তেও পারে।

এই বিধবা বিবাহ মোটামুটি তিন প্রকারের হয়। অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বাধীন কোনো বিধবার ঘরের চালে 'ডাঙ্গ' বা যষ্টি দিয়ে কোনো পুরুষ আঘাত ক'রে সেই গৃহে প্রবেশ ক'রে বিধবাকে অধিকার করে তবে ঐ স্ত্রীকে 'ডাঙ্গুয়া' বা ডেঙ্গাস্ত্রী বলা হয়। দ্বিতীয়ত, কোনো বিধবা যদি স্ব-ইচ্ছায় কোনো পুরুষের গৃহে প্রবেশ করে তবে তাকে 'ঢোকা-স্ত্রী' বলে এবং তৃতীয়ত, পাসুয়াস্ত্রী', "এই বিবাহই বাস্তবিক বিধবা বিবাহ। একবার বিবাহ হইলে পর পশ্চাৎ স্বামী গ্রহণ করাকে পাসুয়া বলে।" 'এছাড়া আছে 'কইন্যাপাত্র' বা ঢেমনাল'—অবিবাহিতা নারী পুরুষের সঙ্গে তার গৃহে গৃহিণী রূপে থাকে। আর কোনো রমণী যদি তার কেশ দু'ভাগে ভাগ ক'রে কাঁধের দিকে ঝুলিয়ে কোনো পুরুষের পায়ে জল ঢালে তবে 'পায়ে জল ঢালা' বিবাহ হয়—যা বস্তুত, 'সিন্দূর ঘষা' বিবাহের অনুরূপ। এই সব বিবাহে সাধারণত অনুষ্ঠান হয় না।[১৯]

'প্রান্ত-উত্তর বঙ্গের লোকসঙ্গীত'-এ ড. নির্মলেন্দু ভৌমিকের সংগৃহীত গানগুলির মধ্যে বহু গানে পুরুষের প্রতি বিধবা নারীর প্রেমার্তি প্রকাশ পেয়েছে। এই গ্রন্থে তিনি কয়েকটি প্রবাদ উপস্থাপন ক'রে দেখিয়েছেন যে রাজবংশী সমাজে বিধবা-বিবাহ সমাজ স্বীকৃত।—লোভ সম্বরণ করা গেল না তাই অন্তত একটি প্রবাদ উল্লেখ করছি: ' পূবিয়া-পছিয়া বায়ে নড়ে ভাতের হাঁড়ী।/একনা মাইয়া পুষি'র না পায়,/আরো চান্দায় আড়ী।।' —অর্থাৎ একটি বউই যে পালন করতে পারে না তার আবার বিধবা-বিবাহের শখ! বিভিন্ন গানে পর-পুরুষের সঙ্গে বিধবার প্রেমের বর্ণনা আছে— সমাজে বিধবার প্রেম নিষিদ্ধ নয় বলেই এই জাতীয় বহু গানের প্রচলন থাকা সম্ভব। যেমন-'ওরে তুই রে বানিয়া বন্ধু রে,/ যুগের চিনা-জানা রে/ আজি খাতির আখেক মোরে।।'

বিধবার উপপতি বা দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণের চিত্রও আছে: '...এতয়ভরি তোর কান্দানী-/নাঙের আগত্ ফুটাংটাং/নাঙ্ না হায় তোর আং সাং-" নাঙের অর্থ হল উপপতি বা দ্বিতীয় পক্ষের স্বামী। অর্থাৎ সেবাযত্ন হচ্ছে না বলে উপপতির এই অনুযোগ প্রকাশ পাচ্ছে যে, নাঙ ঐ (বিধবা) স্ত্রীর অবহেলার পাত্র নয়... ইত্যাদি।

বিধবা-বিবাহ ছাড়া রাজবংশী সমাজে সাধারণভাবে 'গান্ধর্ব' ও 'ব্রাহ্ম বিবাহ' হয়। ব্রাহ্ম বিবাহ লোকাচারসম্মত বিবাহ এবং তা ঘটক-ঘটকিনীর দ্বারা সংঘটিত হয়। চরিত্রগত দিক থেকে একে প্রজাপত্য বিবাহই বলা যায়। এই জাতীয় বিবাহের বিভিন্ন অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র ক'রে বহু গানের সন্ধান পাওয়া যায়— (যেমন বঙ্গের অন্যান্য অধিবাসীদের মধ্যে বিবাহের গান প্রচলিত আছে)। ড. ভৌমিক তাঁর গ্রন্থে 'বিহোর গান' শীর্ষক অধ্যায়ে রাজবংশীদের এই সব বিবাহের গান লিপিবদ্ধ করেছেন, তাঁর সংগ্রহ তিন শ'রও বেশি।

এদের সমাজে প্রচলিত 'গান্ধর্ব বিবাহ' আসলে বাল্য বিবাহ। কোচবিহারের ইতিহাস এ বলা হয়েছে ঃ 'এই বিবাহে পতি কি তাহার পিতা-মাতা চার বৎসর হইতে উর্ধ্ব সংখ্যা বারো বৎসর বয়স্কা এক পাত্রী সাব্যস্ত করে। ইহা দ্বারা বোঝা যাইতে পারে, পাত্রী নিজ বর মনোনীত করিয়া লয় না এবং বর মনোনীত করার বয়সও তাহার হয় না। এই বিবাহে একমাত্র কার্য এই যে বর ও পাত্রীর সম্মুখে এক চালনবাতি রাখে এবং পাত্রীকে নূতন কাপড় ও শঙ্খ পরায় এবং বর-পাত্রী দুই জনে পুষ্পমালা বদল করে। কোন ব্রাহ্মণ পুরোহিতের আবশ্যাক করে না। নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে এই বিবাহ বড় প্রচলিত নাই, কেবল উচ্চ শ্রেণীর লোকেবাই এই নিয়মে বিবাহ করিয়া থাকে।।[২০]

এ প্রসঙ্গে আবদুস সাত্তার জানাচ্ছেন ঃ "বাংলাদেশের একমাত্র রাজবংশী সমাজেই বাল্যবিবাহের প্রচলন এখনো অবশিষ্ট রয়েছে। বিয়ের পর কনে বয়োপ্রাপ্তা না হওয়া পর্যন্ত বাপের বাড়ীতেই অবস্থান করে। কনের প্রথম রজোদর্শনের পর উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মতো 'গৌণ' অথবা 'বিদা' অনুষ্ঠানের পর বর ও কনে স্বামী-স্ত্রী রূপে ঘর-সংসার করবার অধিকার পায়। গৌণ অথবা বিদা তাদের দ্বিতীয়বারের মতো বিবাহ বলে আখ্যায়িত করা হয়।" তিনি আরও জানিয়েছেন যে রাজবংশী সমাজে 'পেটে পেটে বিবাহ' রীতি প্রচলিত আছে। 'অর্থাৎ গর্ভাবস্থায়ই ভবিষ্যৎ পুত্র-কন্যা কল্পনা করে বিবাহ-চুক্তিতে তারা আবদ্ধ হয়। এজন্য ব্রত অনুষ্ঠানও পালন করা হয় যাতে গর্ভজাত সন্তান যথাক্রমে ছেলে এবং মেয়ে রূপে জন্মলাভ করে। এ ধরনেব বিয়েতে ভবিষ্যৎ বর কনের বাবা-মা লেনদেনের চুক্তিতে আবদ্ধ হয় এবং বর ও কনে বয়োপ্রাপ্ত হলে তাদের চুক্তি সম্বলিত সহায় সম্পত্তি অর্পণ করা হয়।"[২১]

উল্লেখ্য, রাজবংশী উপজাতি রঙপুর, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, পার্বত্য চট্টগ্রাম— এমন বিস্তৃত জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে আছে। কিন্তু পশ্চিম-কামরূপী উপভাষায় রচিত রঙপুর —জলপাইগুড়ির এই হিন্দু রাজবংশীদের সংস্কৃতি অন্যান্য অঞ্চলে বসবাসকারী রাজবংশীদের সংস্কৃতি থেকে কিছুটা পৃথক।[২২] তাই এঁদের মধ্যে যেমন বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে, এই বাল্যবিবাহের প্রচলন বোধ হয় তেমন নেই; ফলে বিবাহ বা অন্যান্য গানে তার প্রতিফলনও দুর্লভ।

বাল্যবিবাহের তেমন প্রচলন না থাকলেও এদের সমাজে যে বহুপত্নীমূলক

বিবাহ কম-বেশি প্রচলিত তার প্রমাণ আছে গানে; —যদিও মাত্র কয়েকটি গানেই তার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। যেমন একটি গানের অংশ বিশেষ ঃ

সাধের দুড় বল্ দেখি তোর ঃ
সোতোনীরো বল্‌রে বচন ক্যামন।
—শিঙ্গিমাছ্ বিন্দালে য্যামন;
শুন্ গে দিদি সোতোনিরো বচন।।'

—অর্থাৎ সতিনীর বচন যে শিঙ্গিমাছের কাঁটা বেঁধার মত, সেই কথাই বলা হচ্ছে। কিংবা—

'সতোনিরো আছে কাঁটা/দিলেক আহি মোক দারুন খোঁটা;
বিযে মোর ডংশিয়া (দংশন করে) নিলে দেহা।।'

উপজাতীয় লোকসঙ্গীতের মধ্যে বহু গান আছে যেগুলি পর পুরুষ বা দেবরের উদ্দেশে সধবা বা বিধবা নারীর প্রেম-সম্পর্ক ও প্রেম নিবেদনকে উপজীব্য ক'রে সৃষ্টি হয়েছে। অনেকগুলি গানে বৌদির প্রতি দেবরও প্রেম নিবেদন করেছে। বহু প্রচলিত না হলেও এই সমাজে বড় ভাইয়ের মৃত্যু হ'লে দেবরই বউদিকে বিবাহ করে। বস্তুত, এই গানগুলি প্রমাণ করে একদা এদের মধ্যে দেবর-ভাসুর বরণ (levirate) প্রচলিত ছিল।[২৩]

'ওমোব ভোজী (বৌদি) গে,
তোরে না বাদে সাধের বৈরাগী
ও মোক করালো বৈদেশে।'...[২৪]

—অর্থাৎ বৌদিকে উদ্দেশ ক'রে দেবব বলছে যে, বৌদির জন্যই সে বৈরাগী হয়েছে।

এইভাবে রাজবংশী সমাজের নর-নাবীর বিচিত্র সম্পর্ক ও বিবাহ সংক্রান্ত বিশেষত্ব তাদের গানগুলিতে প্রতিফলিত হয়েছে এবং বিবাহসংক্রান্ত বাংলা লোকসঙ্গীতে ভাষা, সুর ও সামাজিক বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে নিঃসন্দেহে বিচিত্রতা আনয়ন করেছে।

পূর্ববঙ্গ মৈমনসিংহ গীতিকা : বাঙালীর বিবাহবৈশিষ্ট্য :

পূর্ববঙ্গ-মৈমনসিংহ গীতিকাগুলিতে প্রধানত হিন্দুর বিবাহ বিষয়ক বিচিত্র বৈশিষ্ট্য সমূহের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। সতীন সমস্যা ও বহুবিবাহ, গৌরীদান প্রথা, বরপণপ্রথা ইত্যাদি যেমন লক্ষ্য করা যায় তেমন অনুলোম বিবাহ, সগোত্র বিবাহ, বিধবা বিবাহ, কন্যাপণ, রাক্ষস বিবাহ ইত্যাদির সাক্ষাৎও দুর্লভ নয়। এইসব সামাজিক বিধি-বৈশিষ্ট্যের অস্তিত্ব একসময়ে সমাজে যথেষ্টই ছিল— লোকসাহিত্যের অন্যান্য প্রকরণের মত গীতিকাগুলিও সেই সব বৈশিষ্ট্যকে অঙ্গীকৃত করেছে। সংক্ষেপে তার দু'একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত হ'ল :

ক. অনুলোম বিবাহ : অর্থাৎ উচ্চবর্ণের পুরুষ যখন নিম্নবর্ণের স্ত্রী গ্রহণ করে।

'মহুয়া' পালায় উচ্চবংশজাত হওয়া সত্ত্বেও চাঁদ বিনোদ বাদ্যানী মহুয়াকে বিবাহ করে। অনুলোম বিবাহের দৃষ্টান্ত হলেও ব্রাহ্মণের পুত্র এবং 'রাজার ছাওয়াল' চাঁদ মহুয়াকে নিয়ে গৃহত্যাগ করেছিল। তার কথায় : 'জাতি নাশ করলাম কন্যা তোমারে পাইবার তরে।' বস্তুত মহুয়া বেদেনী ও জল অচল— (উচ্চবর্ণ যাদের হাতের জল গ্রহণ করে না) বলেই সমাজ-নিন্দার ভয় এত প্রবল হয়েছিল। কিন্তু জলচল নিম্নবর্ণে ক্ষেত্রে এই সমাজনিন্দার ভয় থাকত না। উল্লেখ্য, এ যুগে কুলীন বংশের সামাজিক মর্যাদা ও কুলীন পাত্রের খুবই মূল্য ছিল। 'চন্দ্রাবতী' পালায় চন্দ্রাবতীর জন্য ঘটক কুলীন পাত্রের সন্ধান দিয়েছে ও তার প্রশস্তি গেয়েছে : 'ঘটক কহিল কথা সুন্ধা গ্রামে ঘর/ চক্রবর্ত্তী বংশে খ্যাতি কুলীনের ঘর।।'

খ. প্রতিলোম বিবাহ : উচ্চবর্ণের কন্যার নিম্ন বর্ণের স্বামী গ্রহণ করার দৃষ্টান্ত সে যুগেও কম ছিল না। যেমন 'রূপবতী' পালায় নবাবের ভয়ে রাজা রাজচন্দ্র তারই নফরের হাতে নিজের সুন্দরী কন্যা রূপবতীকে সম্প্রদান করেন : 'শুভদিন শুভক্ষণ স্থির যে করিল।/ শুভলগ্ন পাইয়া রাজা কন্যা দান দিল।।' শুধু কন্যা নয়, কন্যার সঙ্গে 'যতেক সামগ্রী দিল নাই তার নাম।/ জমিদারী লেখ্যা দিল বাসুনকান্দি গ্রাম।।' কিন্তু প্রতিলোম বিবাহ সমাজে চিরকালই নিন্দিত হয়ে এসেছে। তাই বোধ হয় এই অংশের পাঠান্তরে আছে : 'না গাইল বিয়ার গীত না হইল আচার।/ পুরীতে না দিল কেউ মঙ্গল জোকার।।/ পাড়াপড়শীর কাছে সোহাগ না মাগিল মায়।/ বিয়ার হলদি না মাখিল কন্যার গায়।।' এবং 'না আসিল পুরোহিত কুল আচরণ।/ নিঝুম রাতে করে মায় কন্যা সমর্পণ।।

গ. বহু বিবাহ ও সতীন : পুরুষের একাধিক বিবাহ ছিল সমাজ-স্বীকৃত। 'রূপবতী' পালায় কাঙ্গালীয়া ও জাঙ্গালীয়া দুই ভাই, কিন্তু তিন বিয়ে : দুই ভাইয়ের তিন বিয়া পুত্রকন্যা নাই।' 'মলুয়া'-এ আত্মীয়দের নিষ্ঠুরতায় 'বাইর কামুলী' হয়ে থাকতে চেয়ে 'পঞ্চ ভাইয়েরে মলুয়া কয় মাথায় কিরা দিয়া।/ ভাল দেইখ্যা সোয়ামীরে আগে করাও বিয়া।।' 'মইষাল বন্ধু—সাঁজুতী কন্যাব পালা-তে মইষালের সাঁজুতীর মত সুন্দরী স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও সে মঘুয়ার ভগিনী ময়নাকে বিবাহ করে। এর অনিবার্য ফল হিসেবে আসে সতীন সমস্যা। যেমন 'কাঞ্চনমালা' গীতিকায় কুমার কাঞ্চনমালাকে পেয়ে কুঞ্জমালাকে অবহেলা করতে শুরু করল। যন্ত্রণা-কাতরা অনাদৃতা কুঞ্জমালা তাই বলে :

> 'সতীন আইল ঘরে হইল সর্বনাশ।
> সাপের সঙ্গতি যেন হইল নিরবাস।।
> যে নারীর সতীন ঘরে তার নাই সুখ।
> বিধাতা লেইখ্যাছে তারে জন্মভরা দুখ।।'

ঘ. বাল্যবিবাহ : গৌরীদান বা বাল্যবিবাহও সমাজে প্রচলিত ছিল। যেমন 'দেওয়ান ভাবনা' পালায় সুনাই এগারো বৎসরে পড়লে অনূঢ়া কন্যার বিবাহ

সম্পর্কে জননীর চিরন্তন দুশ্চিন্তা:

"দশ বচ্ছর গিয়া সুনাইগো এগারোতে পড়ে :
কন্যার যৈবন দেখ্যাগো ভাব্যা চিন্তা মরে।।
এতেক সুন্দর কন্যাগো তাহেত যুবতী।
কে বা বিয়া দিব কন্যারগো কেবা করে গতি।।"

'কাঞ্চনমালায়' অপুত্রক ভরাই নগরের সদাগরের স্ত্রী সন্ন্যাসী প্রদত্ত ফল খেয়ে গর্ভবতী হয়। কিন্তু সেই সন্ন্যাসীর নির্দেশ ছিল : 'নবম বছরে কন্যা দিবে গৌরিদান।' 'নীলা' গীতিকায় নীলার শিশুকালে বিবাহ হওয়ার পরে সে তার পতিকে চিনতে পারে না। আরো বিভিন্ন গীতিকায় বাল্যবিবাহের কথা পাওয়া যায়।

ঙ. রাক্ষস বিবাহ (marriage by capture) : বলপ্রয়োগের দ্বারা বিবাহ পৃথিবীতে চিরকালই ছিল। গীতিকাগুলিতেও সেই প্রমাণ আছে। লক্ষ্য করলে দেখা যায় বঙ্গে সাধারণ মানুষেরা হিন্দুই হোন মুসলমান-ই হোন, তাদের মধ্যে সম্প্রীতি ও প্রতিবেশী সুলভ মনোভাব বিদ্যমান ছিল যথেষ্টভাবেই। কিন্তু, নবাব নায়েব —ইত্যাদি চরিত্রগুলি বেশির ভাগই ইন্দ্রিয়পরায়ণ, কামুক ও স্বার্থান্বেষীরূপেই গীতিকায় ফুটে উঠেছে। তারা অনূঢ়া এমনকি বিবাহিতা নারীকে বলপ্রয়োগ ক'রে, লুণ্ঠন ক'রে বা ছলে বলে কৌশলে বিবাহ করতে চেয়েছে। যেমন দেওয়ান-ভাবনায় সুনাইকে দেখে উন্মাদ দেওয়ান ভাবনা বাঘরাকে দিয়ে সুনাই এর বাবা ভাটুক ঠাকুরকে প্রস্তাব করেছে : 'তার কাছে তোমার কন্যা যদি দেওগো সাদী।/ঘরের যত নিকার বিবি সকল হইবে বাঁদী।।' অসম্মত হওয়ায় সোনাইকে লুণ্ঠন করা হ'ল : 'সোনাইরে ধরিয়া লইল দেওয়ান ভাবনার চরে।' এইভাবে নারী লুণ্ঠন সে সময়ে প্রায়শই হ'ত নিঃসন্দেহে। তাই এমন সহজভাবে মানুষ বলতে পারে 'কেবা যাওরে নদী দিয়া বাইয়া পানসী নাও।/ কার ঘরের যুবতী নারী ধইরা লইয়া যাও।।' মুসলমান শাসকের এই চরিত্র গীতিকায় বারংবার প্রতিফলিত হয়েছে। 'মলুয়া' পালায় কাজীর সম্পর্কে বলা হয়েছে : 'ভালো মন্দ নাহি জানে বিচার আচার।/কুলের বধূ বাহির করে অতি দুরাচার।।' এব্যাপারে অবশ্য কোনো কোনো হিন্দুরও আকর্ষণ ছিল। যেমন 'মইষাল বন্ধু-সাঁজুতী কন্যা'র পালায় মঘুয়া মইষাল পত্নী সুন্দরী সাঁজুতীকে দেখে তাকে বিবাহ করার জন্য সাঁজুতীকে চট্টগ্রামে নিজ ভগিনীর কাছে রেখে মইষালকে বাণিজ্য যাত্রায় প্ররোচিত করেছে— যদিও শেষপর্যন্ত সে ব্যর্থকাম হয়েছিল। সুতরাং প্রাচীন রাক্ষসবিবাহ—যা পৃথিবীর সর্বত্রই প্রচলিত ছিল, বঙ্গদেশও তার উর্দ্ধে ছিল না।

চ. অন্যান্য প্রসঙ্গ :

১। সাধারণভাবে প্রজাপাত্য বিবাহে উভয়পক্ষের জাত বর্ণ ইত্যাদি বিচার না ক'রে বিবাহ হত না। 'কাজলরেখা' গীতিকায় কাজলরেখা কুমারকে তাই বলেছে : 'হাড়ি

কি ডোমের কইন্যা নাহিক ঠিকানা।/না জানিয়া বিয়া করতে শাস্ত্রে আছে মানা।।' আবার সগোত্র বিবাহ নিষিদ্ধ। 'দস্যু কেনারামের পালা'-য় যক্ষসেনের কন্যা চন্দ্রকলার সঙ্গে লখীন্দরের বিবাহ হয়নি, কারণ চাঁদ বলেছে যে বিবাহ 'সগোত্রেতে উচিত না হয়।' আবার হিন্দু পুরুষ বা নারী মুসলমানকে বিবাহ করলে তার 'জাত' থাকে না— কিন্তু হিন্দু রমণীকে বিবাহ ক'রে মুসলমানের জাত যায় না। 'চন্দ্রাবতী' পালায় জয়চন্দ্র মুসলমান রমণীকে বিবাহ করায় তার আর হিন্দুত্ব থাকেনি। তাই বলা হয়েছে: 'অনাচার কৈল জামাই অতি দুরাচার।/ যবনী করিয়া বিয়া জাতি কৈল মার।।'

২। সে সময়ে যেমন বরপণ নেওয়ার রীতি ছিল, তেমন ছিল কন্যাপণ। বিবাহের পর মলুয়া যখন শ্বশুরালয়ে গমন করেছে তখন মলুয়াকে বিভিন্ন দানসামগ্রী দেওয়া হয়েছিল :

'ঝাইল পেটেরা দিল সঙ্গেতে করিয়া।
সজ মসলা দিল থলেতে ভরিয়া।।
আরও সঙ্গে দিল মাও চিকনের চাইল।
তৈল সিন্দূর দিল খৈয়াবিন্নির ধান।।'

আবার 'মাণিকতারা ডাকাইত' পালায় সাধুশীল মাণিকতারার সঙ্গে বাসুর বিবাহ দেবার জন্য 'বাসুর কাছে সাধু লইল একশ ট্যাকা পণ।'

৩। হিন্দু সমাজে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত ছিল না। তবে ব্যতিক্রম ছিল নিঃসন্দেহে। প্রাগুক্ত গীতিকাতেই দেখা যায় কানুর মৃত্যুর পর তার বিধবা স্ত্রী পরপুরুষের আশ্রয়ে চলে যায়।

৪। ফুলশয্যার অনুষ্ঠান সাধারণত 'বর'-এর গৃহেই হয়। কিন্তু ব্যতিক্রমও ছিল। 'মলুয়া' পালায় চাঁদবিনোদের সঙ্গে মলুয়ার বিবাহ হয়। বিবাহের পরদিন মলুয়ার গৃহেই কালবাত্রি ও ফুলশয্যা অনুষ্ঠিত হয়, অতঃপর মলুয়া স্বামীর সঙ্গে শ্বশুরালয় গমন করে।

৫। বিবাহের পূর্বে কন্যাসহ তার মাতা ও অন্যান্য নারীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে 'সোহাগ মাগা' ছিল আবশ্যক। কন্যার ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য আশীর্বাদ যাচ্ঞা করার জন্যই এই অনুষ্ঠান। এছাড়া বিবাহের পূর্বে নান্দীমুখের অনুষ্ঠান, পান ফুল দিয়ে কন্যাকে গৃহে বরণ করার প্রথা.— মলুয়া ইত্যাদি কয়েকটি গীতিকায় বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। সে সময়কার বিবাহানুষ্ঠানের বিভিন্ন রীতি-নীতি ও তার খুঁটিনাটির অসাধারণ বর্ণনা লক্ষ্য করার মত। তাই পরিশেষে 'সোহাগ মাগা' অনুষ্ঠানের কিঞ্চিৎ বর্ণনা উপস্থাপন করে এই আলোচনা শেষ করব— যে বর্ণনায় মানুষের যাদুভিত্তিক শ্রদ্ধা বিশ্বাস সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে:

'চিমটিয়া তুলে সবে দুয়ারের মাটী।
সোহাগের দ্রব্য আনি দেয় কুটি কুটি।।
হলদি চাকি চাকি আর তৈল সিন্দূরে।

এরে দিয়া সোহাগ ডালা সাজায় সুবিস্তারে।।
পাছে পাছে গীত গায় পাড়ার যত নারী।
সোহাগ মাগিয়া মায় ফিরে নিল বাড়ী।।
চুরপানি দিল মায় টুপায় ভরিয়া।
ধন মন ছয়াইল যতন করিয়া।।
ধন ছয়াইল মায় ধন পাইবার আশে।
মন ছয়াইল মায় জামাইর অভিলাষে।
নান্দীমুখ আদি মত শুভকার্য শেষে।
শুভলগ্নে হইল পরে বিয়া অবশেষে।। (মালুয়া)

পঞ্চম অধ্যায়

কৃষি ও উর্বরতা-তন্ত্র

এক।। কৃষি ও বাংলা লোকসাহিত্য :

বাংলার পলিগঠিত উর্বর মৃত্তিকা ও মৌসুমী বায়ু নিয়ন্ত্রিত আদর্শ জলবায়ু এদেশকে অর্থাৎ অবিভক্ত বঙ্গকে কৃষি সভ্যতার অন্যতম উৎস হিসেবে গড়ে তুলেছে। ফলে বাংলাদেশের লোকজীবন ও সংস্কৃতি বস্তুত কৃষিনির্ভর। প্রধান শস্য হিসেবে ধান তো বটেই, এছাড়া বিভিন্ন প্রকার ফসল এই মাটিতে সৃষ্টি হয়। অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, বন্যা-- ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপর্যয় প্রায়শই দেখা যায়; ফলে কৃষিজীবী মানুষ বিভিন্ন ঐন্দ্রজালিক উপায়ে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়— যেগুলি বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও প্রথার জন্ম দিয়েছে। ফসল যাতে ভালো ফলে— তার জন্যেও আছে অনুষ্ঠান। আছে বিভিন্ন শস্য উৎসব (harvest festival)। ধান প্রধান শস্য, কাজেই পৃথকভাবে গড়ে উঠেছে ধান্য উপাসনা (paddy cult)। বীজ বপন ও ফসল তোলার ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ ঋতুর ভূমিকা বিশিষ্ট, তাই বিভিন্ন ঋতুতে সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন উৎসব বা আচার অনুষ্ঠান।

ফলে এইসব যাবতীয় আচার-অনুষ্ঠান প্রথা-উৎসবকে কেন্দ্র ক'রে বাংলা লোকসাহিত্যের ভাণ্ডারটি সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। কৃষিজীবী মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ হিসেবে এগুলির মূল্য যেমন অপরিসীম তেমনি বিপরীতক্রমে এগুলি বাংলার সমাজ সাংস্কৃতিক নৃবিদ্যার অপরিহার্য উপাদান।

কৃষি সংক্রান্ত এইসব যাবতীয় বিষয়ই বাংলা লোকসাহিত্যে প্রতিফলিত। আলোচনার সুবিধার্থে এই বিষয়গুলিকে আমরা মোটামুটি ছ'টি ভাগে শ্রেণীবিভক্ত করতে পারি :

১। কৃষিকার্যের উপকরণ।
২। শস্য ও ফসল
৩। আবহাওয়া, ঋতু সম্পৃক্ত অন্যান্য বিষয়।
৪। কৃষি বিষয়ক যাদুক্রিয়া ও অনুষ্ঠান।
৫। ফসল বা শস্য উৎসব।
৬। কৃষি সম্পৃক্ত ধর্ম ও উপাসনা।

১। কৃষিকার্যের উপকরণ :

কৃষিকার্যের উপকরণ বলতে লাঙল, কোদাল, কাস্তে, মই, বলদ ইত্যাদি বিষয়গুলিকেই বোঝানো হচ্ছে; অর্থাৎ যে যে বস্তু ও পশুর দ্বারা কৃষিকার্য করা হয়। এই

উপকরণগুলি লোকসমাজে বহুল পরিচিত হওয়ায়, কারণে-অকারণে লোকসাহিত্যে এগুলির উল্লেখ হয়ে থাকে, অথবা এগুলিকে কেন্দ্র করে ছড়া, ধাঁধা-প্রবাদ ইত্যাদি রচিত হয়ে থাকে। আমরা কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিম্নে উপস্থাপন করলাম :

ছড়া

'পুঁটুরাণীর বিয়ে দেব হট্টমালার দেশে
তারা গাই বলদে চষে।।
তারা সোনায় দাঁত ঘসে।
রুই মাছ পড়ল কত ভারে ভারে আসে।।

—লক্ষণীয় গাই-বলদে চাষ করে, এমন কৃষকের বিপুল সমৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে। কারণ তারা 'সোনায় দাঁত ঘষে'। কৃষিনির্ভর সমাজে পুঁটুরাণীর বিবাহ দান সম্পন্ন কৃষকের ঘরে হলেই তা গৌরবের বিষয়।

খেলার ছড়া হিসেবে প্রচলিত 'ইকির মিকির চাম চিকির'-এর অংশবিশেষে কোদালের উল্লেখ—

'ভাতে পড়ল মাছি / কোদাল দিয়ে চাঁছি।
কোদাল হল ভোঁতা, / খাও শিয়ালের মাথা।'

কন্যা বিদায়ের ছড়াতেও লাঙলের কথা অনুল্লিখিত থাকে না—

'আয় গো আর ছেলে মেয়েরা মেন্দি তুলতে যাই,
মেন্দি ডালার ভার লাগ্যা নাকফুল ছিঁড়্যা যায়।
নাকফুলের উছিলায় বিয়া হইয়া যায়।
মায় কান্দে গো হল্দি ক্ষেতে বইয়া,
বাবায় কান্দে গো লাঙ্গলের খুঁটি ধইরা।
দাদী কান্দে গো গামছা মাথায় দিয়া।। — ঢাকা

বিভিন্ন ধাঁধায় প্রাগুক্ত বিষয়গুলির স্বচ্ছন্দ উপস্থিতি :

১। তয়োয়ালকে ঝিকি মিকি / বনকে বাদার
তিন মাথা দশ পা দেখেছো কি কোথা?

(উত্তর : লাঙলরত কৃষক ও বলদ)

২। 'তিনবর্ণে নাম থাকে কৃষকের ঘরে,
লেজ কাটলে বেঁড়ে ব্যাটা লাথি খেয়ে মরে।
পেট কাটলে ঘৃণা করে দুনিয়ার সবে,
ভেবে চিন্তে বল দেখি কি নাম তার হবে।'

(উত্তর : বলদ)

৩। সারাদিন মাটি খায়,
সন্ধ্যা হলে ঘরে পালায়।

(উত্তর : লাঙল)

৪। দুই তক্তার নায়/ষোলো দাঁড়ে বায়
দুই ধারে দুই মাঝি থাকে/ করে হায় হায়।

(উত্তর : মই)

৫। উর্ধ্ব ঝুটি খোঁড়ে মাটি,
ছয় চোখ তার তিন পাছাটি।

(উত্তর : লাঙল, বলদ ও কৃষক)

৬। কালো কালো ভোমরা, কালো ঘাস খায়,
রাত হইলে ভোমরা কোঠার মধ্যে যায়।

(উত্তর : কাস্তে)

৭। রাজার বাড়ির হাতি
যে পায় সে দেয় এক লাথি।

(উত্তর : ঢেঁকি)

জীবনের বৃহত্তর অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ততম প্রকাশ হিসেবে প্রবাদ লোকসাহিত্যের এক গুরুত্বপূর্ণ আঙ্গিক। কাব্যমূল্যের সঙ্গে এর ব্যবহারিক বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করাব মত। দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত হওয়ায় প্রবাদ-প্রবচনেও প্রাগুক্ত বিষয়গুলির অনায়াস উপস্থিতি :

লাঙল প্রসঙ্গ

১। আপন পুত লাঙলের গাদা, পরের পুত শাহজাদা।
২। এবার ছুকুর ছ'খানা লাঙল।
৩। কদিন বা বইব হাল, আবার লাঙল আর জোয়াল।
৪। বামুন গেল ঘর তো লাঙল তুলে ধর।

মই প্রসঙ্গ

১। হালে পারে না মইয়ে দৌড়ায।
২। পাকা ধানে মই দেওয়া।

কোদাল প্রসঙ্গ

১। উপোস করে ধর্ম, কোদাল পেড়ে কর্ম।
২। কেউ করে দান ধ্যান, কেউ করে হাঁতা।
হাড়ীর কোদালে তার কাটা যায় মাথা।

৩। কেবা জানে গাঁই গুঁই, উদ্‌নারায়ণের ভাই মুই
কোদাল পারি ভাত খাই,
পাহাড় লাগিস্‌ তো লেগে যাই।।
(আঞ্চলিক প্রবাদ; পাহাড় লাগার অর্থ লড়াই লাগা)

৪। মুড়ো কোদালে দীঘি কাটা।

৫। লুভল বামুন কচু খেয়ে, আবার এল কোদাল লয়ে।

কাস্তের উল্লেখ

১। চাচা মরে সেই ভালো, তবু পরের কাস্তে না হারায়।

২। চাষার গদ্দি কাস্তের ঠোক্‌কর।

৩। নিষ্কর্মা চাষার বিশখানা কাস্তে।

বলদের উল্লেখ

১। এমন দেখিনি বাপের বাপে, মেয়ে হয়ে বলদে চাপে।

২। গাই কিনবে দুয়ে, বলদ কিনবে বেয়ে।

৩। চাষার বলদ, চষে খেলেও বয়স যায়, বসে খেলেও বয়স যায়।

৪। ভাগ্যবানের কপালে, বলদ বিয়ায় গোয়ালে।

৫। হালে মাতে বলদ, দুধে মাতে গাই।

২। শস্য ও ফসল

বিভিন্ন ফসল ও শস্যের উল্লেখ অথবা এইসব ফসল বা শস্যকে উপজীব্য ক'রে বিভিন্ন ছড়া ধাঁধা প্রবাদ ইত্যাদি সৃষ্টি হয়েছে। প্রসঙ্গত, বলে নেওয়া ভালো যে লোকসাহিত্যের অন্যান্য প্রকরণেও তার সন্ধান সহজলভ্য। যেমন লোকসঙ্গীত, লোককথা, গীতিকা— ইত্যাদিতে। কিন্তু আমরা মূলত দৃষ্টান্ত হিসেবে ছড়া ধাঁধা প্রবাদকে বেছে নিয়েছি এই কারণে যে, এগুলি লোকসমাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে দৈনন্দিন জীবনচর্যার সমস্ত ক্ষেত্রেই প্রায় ব্যবহৃত হয়। ব্যবহারিক উপযোগিতা থাকায় এগুলির গুরুত্ব অধিক। ফলে দৃষ্টান্ত হিসেবে এগুলির উল্লেখই যুক্তিযুক্ত বলে মনে করা যায়—

ধাঁধা

এমন কোনো ফল, শাক-সব্জি বা শস্য নেই যা নিয়ে ধাঁধা হয়নি। তাই দৃষ্টান্তের বাহুল্য বৃদ্ধি না করে তার মধ্যে থেকে আমরা দু'-একটির মাত্র উল্লেখ করছি—

১। তিন অক্ষরে নাম খাইতে লাগে তিতা,
মাঝের অক্ষর বাদ দিলে খাইতে লাগে মিঠা।
(উত্তর : ক-রলা)

২। শুনেছ নাকি আশ্চর্য কথা,
দুই মাসের কন্যা হয় সন্তানের মাতা।

(উত্তর : আউস ধান)

৩। হারে মট্ মট্ বাকলে কড়ি
তার পাতার হয় তরকারী।

(উত্তর : পাট)

৪। কাল বউয়ের কপালে চিক
জামাই আইলে করে হিত।

(উত্তর : মাসকলাই)

৫। রাঙ্গা বিবি জামা গায়
কাটিলে বিবি দুইখান হয়।

(উত্তর : মুসুরডাল)

৬। ধলা মিয়া হাটে যায়,
নিত্য হাটে চিমটি খায়

(উত্তর : লাউ)

৭। একটুখানি মামা
গা ভর্তি জামা

(উত্তর : পেঁয়াজ)

৮। গাছটি ঝাপুর ঝুপুর, তার তলায় চৈতন্য ঠাকুর।

(উত্তর : বেগুন)

৯। প্যাখম্ তুইল্যা প্যাখনা করে
ঘরে আনলে কাইন্দা মরে।।

(উত্তর : বাঁধাকপি)

১০। ছাগলটা বাঁধা রইলো পাখাটা চরতে গেল

(উত্তর : কুমড়ো ও কুমড়ো গাছ)

ছড়া

ছড়াতেও ফল, শস্য ইত্যাদির উল্লেখ সহজলভ্য :

খেলার ছড়ায় ধানের প্রসঙ্গ :

'আমি গেলাম ওই
খাইয়া আইলাম দই।
কি ধান বুন্‌ছেরে ভাই,
ঝাঁকির জলাই। —মৈমনসিংহ

কন্যার শ্বশুরালয়ে গমন প্রসঙ্গেও ধান চিঁড়ে মুড়কির উল্লেখ—

'পুঁটু যাবে শ্বশুরবাড়ি সঙ্গে যাবে কে।
ঘরে আছে কুনো বেড়াল কোমর বেঁধেছে।।
আম কাঁঠালের বাগান দেব ছায়ায় ছায়ায় যেতে।
চার মিনসে কাহার দেব পালকি বহাতে।।
সরু ধানের চিঁড়ে দেব পথে জল খেতে।
চার মাগী দাসী দেব পায়ে তেল দিতে।।
উড়কি ধানের মুড়কি দেব শাশুড়ী ভুলাতে।।'

খেলার ছড়ায় সিম বেগুনের উল্লেখ—

'আনা আনা আনা,
তত্ত্ব দুধের ফেনা।
সিম গোটা গোটা
বেগুন চটা চটা।
ডান কানে সোনা, ...' ইত্যাদি

আলু কচুর উল্লেখ—

আলুর ছাড়া কচুর ছাড়া।
মামার বিয়া দুপুর ধারা।।
মামীরে নিতে আইস্যে হাড়ে তিনটা মরদ্।
ভারু আ ছিড়ি পৈড়গে মামী জোট্ পুকুর গ্যায় পারত্।।
মামারে পার করাতে লাগে আনা আনা।
মামীরে পার করাতে লাগে কানের সোনা।। ..." ইত্যাদি

—চট্টগ্রাম

কিংবা—

আলু পাতা থালুক্ বেগুন পাতা দই,

সব জামাই খেয়ে গেল মেজ জামাই কই?

বেগুন পটল কুমড়ো ইত্যাদির উল্লেখ—

আমি সওদাগরের ঝি,
আমি কি অমনি রেঁধেছি।
বাড়ীর বেগুন, কাঁচকলা আর পটল ভেজেছি।
চালে আছে চাল কুমড়ো, সিকেয় আছে ঘি,
আমি সওদাগরের ঝি,
আমি কি অমনি রেঁধেছি?

প্রবাদ

নিম্নলিখিত প্রবাদগুলিতে ধানের উল্লেখ —

১। উঠানে ধানের সাড়া, ঘরেতে নবান্ন বাড়া।
২। ওদা ধানের চাল দড়, গোদা পায়ের লাথ দড়।
(ওদা- ভিজা অর্থাৎ আউস ধান)
৩। কত ধানে কত চাল, গিন্নী বিনা আল-থাল।
৪। গরু জরু ধান, না দেখলেই যান।
৫। গুঁতোয় পড়লে আমন ধানে খই ফোটে।

বিভিন্ন ফসলের উল্লেখ —

১। ওরে ভাই কালু।
কারো পাতে মাগুব মাছ, কারো পাতে আলু।
২। কাজেব ঢেঁড়শ।
৩। ভাজে ঝিঙে তো বলে পটল।
৪। বসে বুড়ো পাট কাটে
তাব দম্ভে গগন ফাটে।
৫। শুধু কথায় বেগুন ভাজা।
৬। কিবা বঙ্গের একাদশী, তাতে আবার মুগের রাশি।
৭। অন্ধকারে লাউ কোটা।
৮। কুমড়ো কাটা বট্‌ঠাকুর।
৯। আখ আর সরষে না পিষলে রস কিসে।
১০। ডাইলের মধ্যে মুসুরি, মানুষের মধ্যে শাশুড়ি।[১]

ময়মনসিংহ-পূর্ববঙ্গ গীতিকার বহু পালায় বারংবার ধান-চালের প্রসঙ্গ এসেছে, আবার কোথাও কোথাও কৃষিনির্ভর জীবনের ছবি ফুটে উঠেছে। 'মহুয়া' পালায় নদের চাঁদকে মহুয়া বলেছে : 'জল পান করিতে দিয়াম সালি ধানেব চিড়া।।' 'কঙ্ক ও লীলা'য় আছে : 'গামছা-বান্দা দৈরে বন্ধু শালিধানের চিড়া।' 'মলুয়া'-য় চাঁদ বিনোদকে তার

মা বলেছে : 'মাঠের পানে যাও রে যাদু ভালা বান্দ আইল।/আগন মাসেতে হইবে ক্ষেতে কার্তিকা সাইল।।' অর্থাৎ ক্ষেতে গিয়ে ভালো ক'রে আল বাঁধতে বলা হচ্ছে যাতে কার্তিকে সাইল ধানের ভাল ফলন হয়। এই অংশেই দেখা যায় জলপ্লাবনজনিত কারণে ক্ষেতে কোনো শস্য হয়নি। এমনকি 'সরু শস্য ক্ষেতে নাই হইল সর্ব্বনাশ।।' ধানশূন্য মাঠ দেখে 'চান্দ বিনোদের কান্দিল পরাণ।।' অকাল দুর্ভিক্ষে ধানের দাম হয়েছে ট্যাকায় 'দেড় আড়া' অর্থাৎ ছ'মন। ফলে তাদের গরু বেচে, জমি বন্ধক রেখে জীবন ধারণ করতে হয়েছে : 'আছিল হালের গরু বেচিয়া খাইল।/পাঁচ গোটা ক্ষেতে বিনোদ মাজনে দিল।।' আবার 'মলুয়ার পরিচয়' অংশে দেখা যায় মলুয়ার পিতা হালুয়া দাস গাঁয়ের মোড়ল ও সম্পন্ন কৃষক তার—

> 'সরু শস্যে ভরা টাইল গোলা ভরা ধান।
> ঘরে আছে দুধবিয়ানী দল গোটা গাই।
> হালের বলদ আছে তার কোনো দুঃখ নাই।।
> বাইস আড়া জমীন তার সাইল আর আমন।
> ধনে পুত্রে বর তাবে দিছে দেবগণ।।'

'কমলা' পালাতেও মাণিক চাকলাদারের আর্থিক সঙ্গতির কথা বলতে গিয়ে লোককবি জানান : 'খামারিয়া জমী তার আছে চল্লিশ কুড়া।' বা 'টাইলভরা ধান আর গোয়াইল ভরা গরু।/বছরে বছরে বান্ধা এক পুরা সরু।'[২]

—বস্তুত ধর্মাচরণ, পরিবেশ ও প্রকৃতি বর্ণনাই নয়, প্রাগুক্ত বর্ণনার মধ্যেও গীতিকায় আমাদের খাঁটি কৃষি-নির্ভর জীবনের প্রতিচ্ছবিই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

৩। আবহাওয়া, ঋতু ও কৃষিসম্পৃক্ত অন্যান্য বিষয়

বাংলা লোকসাহিত্যে কৃষি সম্পৃক্ত বিভিন্ন বিষয়ে নিয়ে রচিত ছড়া-প্রবাদ-ধাঁধার কিছু দৃষ্টান্ত আমরা পূর্বে উপস্থাপিত করেছি। কিন্তু সম্পূর্ণভাবে কৃষিভিত্তিক ব্যবহারিক বিষয় নিয়ে, যেমন কৃষিকার্যের উপযুক্ত আবহাওয়া, কৃষিপদ্ধতির বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিভিন্ন ঋতুকালীন ফসল সংক্রান্ত ব্যবহারিক বিষয়— ইত্যাদিকে কেন্দ্র ক'রে স্বতন্ত্রভাবে বাংলা লোকসাহিত্যের একটি প্রকরণের অন্তর্গত একটি সমৃদ্ধ উপধাবার সন্ধান পাওয়া যায়। বলাবাহুল্য তা হল প্রবাদ-প্রবচনের অন্তর্গত 'খনার বচন'। খনার বচন হিসেবে কিছু লৌকিক বচনের অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকলেও কৃষিবিষয়ক বচনের সংখ্যাই বেশি। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য এ সম্পর্কে বলেছেন :

"বাংলাদেশের সমাজ কৃষিভিত্তিক। সুতরাং কৃষিজীবন বা কৃষিকর্ম ইহার জীবন-চর্চার অন্তর্নিবিষ্ট। সুতরাং এই বিষয়ক সর্বজনগ্রাহ্য কোন বচন যদি ঐতিহ্যের ধারা অনুসরণ করিয়া বিকাশ লাভ করিয়া থাকে, তবে তাহা বাংলা প্রবাদের অন্তর্ভুক্তও হইতে পারে। প্রবাদ যেমন ব্যবহারিক জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য, ইহাও তাহাই, বাঙ্গালীর জীবন চর্চার একটি প্রধান বিষয় অর্থাৎ কৃষিকর্ম, তাহা অবলম্বন করিয়া ইহা রচিত হইয়াছে এবং কৃষিকর্মের সঙ্গে যাহারা প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত, তাহাদের ব্যবহারিক জীবনে

ইহাদের নিত্য প্রয়োজন হইয়া থাকে।" অতঃপর তিনি একথাও বলেছেন যে প্রবাদের মত নারীর গার্হস্থ্য জীবন, অন্তর্মুখী বৈশিষ্ট্য, শ্লেষ-বক্রোক্তি বা সরস প্রকাশভঙ্গী না থাকায় এগুলিকে ঠিক প্রবাদ ব'লে গ্রহণ করা যায় না তাই অনেকেই ডাকের বচনের মত এগুলিকে স্বতন্ত্রভাবে বিচার করেন।[৩]

যাই হোক, প্রবাদপ্রতিম এই বচনগুলির যে একটি স্বাতন্ত্র্য আছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু ওই বিতর্কে আমরা না গিয়ে শুধুমাত্র এটুকুই বলব যে, লৌকিক জ্যোতিষ বচন বা ডাকের বচনের মতই খনার বচন একটি মূল্যবান স্বতন্ত্র উপধারা, যেখানে বাংলার লোকসংস্কৃতির একটি বিশিষ্ট দিক প্রতিফলিত।

কোন্ কোন্ ঋতুতে, কোন্ কোন্ আবহাওয়ায় কোন্ কোন্ ফসল ফলবে অথবা ফলবে না, কোন্ ক্ষেত্রে কি করণীয় অথবা করণীয় নয়— ইত্যাদি খনার বচনগুলি লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়। বস্তুত খনার বচন যেন লৌকিক কৃষিবিজ্ঞান। নিম্নে এর কতিপয় দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল :

খনার মতে কৃষিই শ্রেষ্ঠ :

ক্ষেতের কোণা,
বাণিজ্যের দুনা।

কিন্তু কৃষিকার্য সহজ কাজ নয় :

'ধর্ম হয় না করলে উপাস,
কোদাল মারলে হয় না চাষ।'

জমিতে ঘন চাষ ও ভালো ক'রে মই দিলে তবেই তা ফসল বোনার উপযোগী হয় :

'ঘনাইয়া চাষ আর টীপাইয়া মই,
এই ক্ষেতে ধান না হইয়া যায় কই।'

বোরো ধান রোপনের প্রকৃষ্ট সময় :

'পৌষের শেষ আর মাঘের বার,
এর মধ্যে শাইল বোরো যত পার।'

আউশ ধান ও পাটের উপযুক্ত মাটি হল :

'আউশের ভুঁই বেলে,
পাটের ভুঁই আঁটলে।'

এক খন্দ পতিত রেখে জমিতে ধান চাষ করলে ফলন বেশি হয় :

'খিলে ধান,
যুগে যুগে ভাণ্ডার বান্ধ।'

আমন ও আউশ ধান বপনের ভালো সময় :

'চৈতের আট, বৈশাখের বার,
এর মধ্যে আমন কাতারি যত পারো।'

চৈত্র মাসে জমিতে কাদা আর বৈশাখে ধুলো উড়লে ধান সামান্যই হয় :

'চৈতের পৌকি, বৈশাখের ধূলি,

ধান খায় বাওয়া বুলি।'

জমি গড়ানে হলে ঘন রোপন করতে হয়:

'গা গড়ানে ঘন পা

যেমন মা, তেমনি ছা।'

বিভিন্ন ফসলের জন্য বিভিন্ন প্রকার চাষ অপরিহার্য:

'ষোল চাষে মূলা, / তার অর্ধেক তুলা,

তার অর্ধেক ধান, / বিনা-চাষে পান।'

আষাঢ়ে পান রোপন করল্লে সুপারি বাগানেও পান হয়:

'আষাঢ়ে পান, চাষাড়ে খায়,

গুয়া বনে পান গড়াগড়ি খায়।'

ছায়াতে আলু ভালো হয়:

'বাঁশবনে বুনলে আলু,

আলু হয় গাছ বেড়ালু।'

ঘন পত্রযুক্ত কুমড়োলতা শীঘ্রই ফলবতী হয়:

'চাল ভরা কুমড়ো পাতা,

লক্ষ্মী বলেন আমি তথা।'

ফাল্গুন মাসে পটল বুনলে ফলন দ্বিগুণ হয়:

'পটল বুন্‌লে ফাল্গুনে

ফলন বাড়ে দ্বিগুণে।'

—অনুরূপ বিভিন্ন ফল সব্জী ও শস্য সংক্রান্ত বচন বিদ্যমান। কচু, কলা, ওল, ভুট্টা, নারকেল, সুপুরি, মুলো, তামাক, পাট ও শন, লাউ-কুমড়ো, আদা, হলুদ, আম-জাম-কাঁঠাল, তাল, খেজুর, তিল সরষে, ডাল— এমন সর্ববিধ কৃষিপণ্য নিয়ে খনার বচন কৃষকসমাজে প্রচলিত। কলম করা ও সার দেওয়ার বিধিও এর মধ্যে রয়েছে। যেমন কলম করা প্রসঙ্গে —

'শোনরে মালী বলি তোরে,

কলম রো শ্রাবণের ধারে।'

আবার বাংলার কৃষিকাজ যেহেতু প্রকৃতি দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত ছিল, তাই চাষের উপর বৃষ্টি ও খরার প্রতিক্রিয়া ছিল প্রবল। ফলে প্রাকৃতিক অবস্থাকে নিরীক্ষণ করে কৃষিকার্য করতে হত। তাই খনার বচনে বৃষ্টিপাত ও খরার প্রাকৃতিক লক্ষণগুলি সুপরিস্ফুট। যেমন কয়েকটি দৃষ্টান্ত —

আষাঢ় ও আশ্বিনের খরায় নয়, শ্রাবণ-ভাদ্রের খরা ধানের ক্ষতি করে:

'আষাঢ় কড়ান নামকে, / শ্রাবণে কড়ান ধানকে,

ভাদরে কড়ান শীষকে, / আশ্বিনে কড়ান ফিস্‌কে।'

ভোরের আকাশে মেঘ চলাচল, দুপুরে প্রবল বাতাস অনাবৃষ্টির লক্ষণ—

'বিয়ানে আউলি-বাউলী, দুপুরে বাউ,
দিনে বলে 'খরানের ঘর যাও।'

কোদাল কাটা জমির মত আকাশে খণ্ড খণ্ড মেঘ শীঘ্র বৃষ্টির লক্ষণ:

'কোদাল্যা মেঘ আকাশের গায়
শীগগির শীগগির বৃষ্টি হয়।'

চন্দ্রের সভার মধ্যে তারা দেখা গেলে:

'চন্দ্র-মণ্ডলের মধ্যে তারা,
জল বর্ষে মুষল ধারা।'

জ্যৈষ্ঠ মাসের রাতের আকাশ মেঘমুক্ত হ'লে আষাঢ়ে ভালো বৃষ্টির সম্ভাবনা:

জ্যৈষ্ঠে ফুটবে তারা,
আষাঢে ভরবে গাড়া।'

জ্যৈষ্ঠে, খরা, আষাঢে বৃষ্টিতে চাষীর মঙ্গল,—চাষী ফসল ঘরে তুলতে পারবে:

'জ্যৈষ্ঠে মারে, আষাঢ়ে ভরে,
কাটিয়া মাটিয়া ঘরে পুরে।'

বর্ষফল গণনা সংক্রান্ত খনার বচনের দু-একটি দৃষ্টান্ত:

কার্তিক-অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাস অনাবৃষ্টিতে গেলে, ভাদ্রে পূর্ণ বর্ষা হলে, আশ্বিন মাসে বিনা বাতাসে বৃষ্টি হ'লে প্রচুর ধান হয়.

'কর্কট ছর্কট, সিংহ শুখা, / কন্যা কানে কান,
বিনা বায়ে বর্ষে তূলা, / রাখবি কোথা ধান।'

যে বছর শনি রাজা ও মঙ্গল মন্ত্রী সেই বছরে শস্য হানি:

'শনি রাজা মঙ্গল পাত্র,
চষ, খড়, কেবল মাত্র।'

কার্তিকী পূর্ণিমায় বৃষ্টি না হলে রবি শস্য প্রচুর ফলে:

'কার্তিকে পূর্ণিমা কব আশা. / খনা বলে শোন রে চাষা,
নির্মল মেঘে যদি বাত বয়, / রবি খন্দের ভার ধরণী না সয়।'

মাঘের বৃষ্টি পরবর্তী বছরে উত্তম ফসল জন্মানোর সংকেত:

'মাঘে মেঘে যদি হয়,
সেই বৎসর বড় ভাল হয়।'[৪]

দৃষ্টান্ত বাহুল্য অনাবশ্যক। এমন অজস্র বচন কৃষকের মুখে মুখে একদিন ঘুরতো। বাংলার বিশিষ্ট জলবায়ু ও চাষবাসকে কেন্দ্র ক'রে রচিত এই বচনগুলিতে মানুষের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ জাত জ্ঞান সংগুপ্ত। কোনো কৃষিপ্রধান অঞ্চলে, —কোনো কৃষি-নির্ভর সংস্কৃতিতে, এমন প্রবচন স্বাভাবিক ও অনিবার্য। কাজেই এই বচনগুলি সমাজ-সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের আলোয় বাংলাদেশের কৃষিসংস্কৃতির চিহ্নগুলিকেই সুস্পষ্ট করে।

৪। কৃষিবিষয়ক যাদুক্রিয়া ও অনুষ্ঠান

ড. ওয়াকিল আহমদ বাংলাদেশের লোক প্রচলিত ফসল-সংক্রান্ত অনুষ্ঠানগুলির কালানুক্রমিক শ্রেণীবিভাগ করেছেন এইভাবে—

এক ঃ বৃষ্টি আবাহন—বেঙ বিয়া, পুতুল বিয়া, বদনা বিয়া, মেঘরাণী, হুদুম দেয়া, বসুধারা ব্রত প্রভৃতি।

দুই ঃ বৃষ্টি বারণ—বাটি পোঁতা।

তিন ঃ জমি চাষ—হল প্রবাহ।

চার ঃ বীজ বপন—তুষ ছিটান, কুলানি।

পাঁচ ঃ ফসল রক্ষা—আলোডালো, ক্ষেত বন্ধন, ভগ্‌সা দেওয়া, গার্সী উৎসব, হিরালি আচার উত্যাদি।

ছয় ঃ ফসল তোলা ঃ বাতা ডুগল, আওনি বাওনি।

সাত ঃ বিবিধ—মাগন, নবান্ন উত্যাদি।[৫]

—উপর্যুক্ত অনুষ্ঠানগুলির অধিকাংশই কৃষিবিষয়ক যাদুক্রিয়া ও তৎসংক্রান্ত অনুষ্ঠান। এই সমস্ত অনুষ্ঠানকে ঘিরে বহু আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক ছড়া গান সৃষ্টি হয়েছে। আনুষ্ঠানিক ছড়া গানগুলির অধিকাংশই মন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়, যদিচ তা ছড়ার বৈশিষ্ট্যই বহন করে —সে বিষয়ে পূর্বেই আমরা আলোচনা করেছি। এই ছড়াগুলি অনেক ক্ষেত্রেই সুর করে আবৃত্তি করা হয়. পক্ষান্তরে অনানুষ্ঠানিক ছড়াগুলিতে লোকজীবনের,—ব্যক্তি ও গার্হস্থ্য জীবনের বিভিন্ন ভাব ভাবনা,—ইচ্ছে অনিচ্ছে প্রতিফলিত, এবং অনেক ক্ষেত্রেই এগুলি তাৎক্ষণিক (impromtu) ভাবে সৃষ্ট। যেমন হুদুম দেয়া অনুষ্ঠানের বেশিরভাগ ছড়াই তাৎক্ষণিক সৃষ্টি। বৃষ্টি আবাহন ও বৃষ্টিবারণমূলক বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত ছড়াব উদ্ধৃতি আমরা 'যাদু' অধ্যায়ে দিয়েছি।

ফসল রক্ষার্থে যে সমস্ত যাদুক্রিয়াচার মূলক অনুষ্ঠান পালিত হয়. সেগুলিকে কেন্দ্র করেও বিভিন্ন ছড়া মন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এর উদ্দেশ্য অন্যের অথবা অপদেবতার কুদৃষ্টি যেন ক্ষেতে না পড়ে এবং ফসল যাতে ভালো ফলে তার প্রচেষ্টা করা। যেমন ধানের সাধ দেওয়া এমনই একটি অনুষ্ঠান। মানুষের মত ধানকে সাধ দেওয়া হয়। আমন ধানের শীষ দেখা যায় কার্তিক মাসে। এই অনুষ্ঠানের একটি ছড় :

> 'ভাদ্র গেল আশ্বিন আইল কার্তিক দেয় সাড়া।
> অঘ্রাণেতে ক্ষ্যাতের পরে দেখরে আমন ছড়া।[৬]

বৃষ্টিবারণমূলক অনুষ্ঠানের অন্যতম হল হিরালির আচার অনুষ্ঠান। ফসলের পক্ষে ক্ষতিকর ঝড় বৃষ্টিকে বিভিন্ন ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়ায় যে গুণিন বন্ধ ক'রে থাকে, বাংলাদেশে তাদের (অর্থাৎ হিরালির) যথেষ্ট কদর। হিরালির মন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত লৌকিক ছড়াগুলি লক্ষ্য করার মত। আমরা অন্যত্র তার দৃষ্টান্ত দিয়েছি।

৫। ফসল ও শস্য উৎসব

পৃথিবীর সমস্ত জায়গাতেই ফসল ওঠার পর কৃষিজীবী সমাজে শস্য উৎসব পালিত হয়। বাংলাদেশেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। নবান্ন, মাগন, আওনি-বাওনি,-মায় ভাদু-টুসুর অনুষ্ঠানও শস্য উৎসবের বিভিন্ন প্রকার ভেদ তা বলাই বাহুল্য।

'অগ্রহায়ণ' শব্দের অর্থই প্রমাণ করে এটি বছরের প্রথম মাস। বাংলাদেশে বছর শুরু অগ্রহায়ণ মাস থেকে, মধ্যযুগের মঙ্গল কাব্যগুলিতেও তার প্রমাণ মেলে। কারণ বারমাস্যাগুলি অগ্রহায়ণ থেকেই শুরু। সংস্কৃতে বছরের শ্রেষ্ঠ এই মাসটিকে তাই 'মার্গশীর্ষ' বলা হয়েছে। শ্রেষ্ঠ মাস বলেই এই সময় থেকে বছর গণনা হত। আর শ্রেষ্ঠত্বের কারণ হল, বাংলাদেশ কৃষি প্রধানদেশ, শ্রেষ্ঠ ফসল এই মাসেই উঠত। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যও বলেছেন, "কৃষিভিত্তিক সমাজে যে মাসে বৎসরের নূতন শস্য গৃহে প্রথম আনিয়া সঞ্চয় করা হয়, অর্থাৎ যে মাসে নবান্ন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়, সেই মাসেই বৎসরের প্রথম মাস হইবে, ইহা নিতান্তই স্বাভাবিক।"[৭]

ফলে নবান্ন ও তৎসম্পৃক্ত আওনি-বাওনি ইত্যাদি অনুষ্ঠান শস্য উৎসবেরই অন্তর্গত। অগ্রহায়ণে নতুন ধান ওঠে—কাজেই তার অনুষ্ঠান হল 'নবান্ন'। এই অনুষ্ঠানে নতুন আমন ধানের পায়েস, চিঁড়ে, পিঠে ইত্যাদি তৈরী করে ধর্মসম্প্রদায় নির্বিশেষে মানুষ ভোজন ও বিতরণ করে। আওনি-বাওনি কথার অর্থ যথাক্রমে আগমন (লক্ষ্মীর) ও বন্ধন। পৌষ সংক্রান্তির আগের দিন অগ্রহায়ণ মাসে কেটে নিয়ে আসা ধানগাছ, যা কাপড়ে জড়িয়ে ঘরের খুঁটিতে বেঁধে রাখা হয়, তার এক একটি গাছ সিন্দুক খাট, দরজা, গোয়াল—প্রতিটি জায়গায় ছড়া বলতে বলতে বেঁধে দেওয়া হয়। যেমন একটি ছড়া :

'আওনি বাওনি চাওনি
তিন দিন পিঠা খাওনি
তিন দিন না কোথা যেও
ঘরে বসে পিঠা খেও।'[৮]

এই সময়ে চালের বিভিন্ন প্রকার পিঠে প্রস্তুত করা হয়।

অগ্রহায়ণ মাসে কৃষক সারা বছরের শ্রেষ্ঠ ফসল মাঠ থেকে সংগ্রহ করে। অতঃপর পরবর্তী পৌষ মাসে তার বিশ্রাম ও অবকাশ। ফলে শস্য উৎসবগুলি মূলত এই মাসেই অনুষ্ঠিত হয়। যেমন আওনি-বাওনি, মাগন ইত্যাদি। আওনি-বাওনি সম্পর্কে উপরে আমরা সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি। এবং তা যে মূলত ছড়ায় বাঁধা অনুষ্ঠান তাও বোঝা গেল। সম্পূর্ণ পৌষ মাসের শস্য উৎসবগুলি বস্তুত,— পৌষ বন্দনা, মাগন ও আওনি-বাওনি-এই তিনটি ধাপে বিন্যস্ত। পৌষ বন্দনা দিয়ে যার শুরু আওনি-বাওনির মধ্য দিয়ে তার সমাপ্তি। কারণ আওনি-বাওনির উদ্দেশ্য লক্ষ্মী বা সমৃদ্ধিকে গৃহে অচলা রাখা।

পৌষ বন্দনা মূলক অজস্র ছড়া, গান কৃষিজীবী বাংলার মানুষের মুখে মুখে

ঘুরতো। নিম্নে এমন একটি ছড়া দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ করা হল :

'পৌষ মাসে পৌষ আগালো, ধান কাপাসে ঘর আলা,
এস পৌষ যেও না, জন্ম জন্ম ছেড়ো না,
পৌষ মাস লক্ষ্মী মাস, না যাও ছাড়িয়ে,
গাল ভরে পান দেবো কটোরা পুরিয়ে,
আঁদারে পাঁদারে পৌষ, বড় ঘর চেপেই বোস্।[৯] —বীরভূম

'মাগন' বা 'অরণ মাগন' অনুষ্ঠানে হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায় নির্বিশেষে বালকেরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাল-ডাল মাগন করে এনে মাঠে রান্না করে ভোজন করে। অর্থাৎ এক কথায় এটি বালকদের আনন্দ স্ফূর্তির অনুষ্ঠান। সমস্ত ঘরে ঘরে যখন শস্য, তখন মাগন অনুষ্ঠান অত্যন্ত স্বাভাবিক। ঘরে ঘরে মাগন করতে গিয়ে ছেলেরা বিভিন্ন স্থানে ছড়া বলে। এসব ছড়ায় শিব বা লক্ষ্মীর উল্লেখ প্রায়শই থাকে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এইসব ছড়ার প্রথম পংক্তিটি হল : এলাম রে ভাই অরণে, লক্ষ্মীদেবীর শরণে'। তাই একে 'অরণ মাগনও' বলা হয়।[১০] নিম্নে একটি মাগনের ছড়ার দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল :

আইলাম রে অরণে লক্ষ্মী মায়ের চরণে,
লক্ষ্মী মায় দিলেন বর ধান চাউল বাইর কর।
ধান দিয়া, না দিয়া কড়ি ঐ বাড়ি পাইম সোনার লড়ি।
সোনার লড়ি পাইম্ রে, শ্যাম সুমারি কাইম রে।' [১১]

—ঢাকা, বিক্রমপুর।

ভাদু ও টুসু বাংলার অন্যতম শস্য উৎসব।

বাংলার পশ্চিম সীমান্তবর্তী অঞ্চল—পুরুলিয়া, বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্ধমানের পশ্চিমাংশ, মুর্শিদাবাদের কোনো কোনো অঞ্চল জুড়ে ভাদু অনুষ্ঠান সারা ভাদ্রমাস ব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়। ভাদ্রমাস ব্যাপী অনুষ্ঠান বলেই 'ভাদু' নামকরণ। এটি অনেকের মতেই বর্ষাউৎসব। 'ভাদ্রের ভরা বর্ষার প্রকৃতিকে একটি কুমারী নারীরূপের মধ্য দিয়া ধ্যান করিয়া তাহাকেই কেন্দ্র করিয়া বাস্তব জীবনের নানা কাহিনী ইহার ভিতর দিয়া প্রকাশ পায়।"[১২]

কিন্তু আমাদের মতে এর উৎস শস্য উৎসব থেকেই। কারণ হৈমন্তিক ধান ওঠার প্রায় দীর্ঘ সাত-আট মাস পরে এই সময়েই আউশ ধান কাটা হয়। দ্বিতীয়ত, ভাদুর মূর্তি পরিকল্পনা লক্ষণীয়। আদতে তা ছিল ধান্য। কোথাও কোথাও এখনো একটি মাটির পাত্রে সমূল ধানের শিষকেই দেবতা কল্পনা ক'রে পুজো করা হয় যা ধান্য উপাসনা বলেই চিহ্নিত হতে পারে। তৃতীয়ত কুমারী নারী সমাজ এই দেবতাকে ঘিরে তাদের লোকায়ত জীবনের সুখ দুঃখের গান গায়। শস্যোৎসব ও উর্বরতাতন্ত্রে কুমারী নারীর ভূমিকা স্বাভাবিক। বিভিন্ন জায়গায় ভাদুর মানবী মূর্তি লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীন ঐ ভাদু মূর্তি ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের দ্বারা পরিশীলিত হয়ে মৃন্ময়ী নারীমূর্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে তা বলাই বাহুল্য। যার ফলে ভাদুর নরাকৃতি দেবতা রূপায়ণের

(anthropomorphic) মধ্যে ঐ প্রাচীন চিহ্ন থেকে গেছে। তা হল ভাদুর পাকা ধানের মত হরিদ্রাভ বর্ণ এবং ভাদু মূর্তির হাতে ক'রে সমূল ধানের শিষ ধারণ।

তাৎক্ষণিকভাবে সৃষ্ট অজস্র ভাদু গানের মধ্যে যে পল্লীবালার হৃদয়ানুভূতির অকপট প্রকাশ ঘটেছে তাও নয়, পারিপার্শ্বিক সমাজ ও তার রূপটিও এ-গানে পরিদৃষ্ট হয়। নিম্নের গানটি দৃষ্টান্ত হিসেবে লক্ষ্য করা যাক :

'আয় সারদা, আয় বরদা, কুলিতে বাধ বাঁধাব
কুলির জলে সিনান করে ঝরকায় চুল শুকাব।
আয় সারদা, আয় বরদা, পাড়রে দুটা বিছানা।
মাসে দুটা একাদশী কেও করে কেও করে না।'[১৩]

বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বর্ধমান, মেদিনীপুর, হুগলী— ইত্যাদি অঞ্চলে টুসু পরব বিশেষভাবে পালিত হয়। এক কথায় টুসু হল রাঢ়ের শস্য উৎসব। এই নামকরণ নিয়ে পণ্ডিত মহলে যথেষ্ট বিতর্ক আছে। তবে অনেকের বিশ্বাস প্রাচীন বাংলায় 'তুষ-তুষালি ব্রত' থেকে এই নামকরণ সম্ভব। টুসুর সঙ্গে কোনো পূজা-পার্বণের সম্পর্ক নেই। সমস্ত পৌষমাস ধরে গানে গানে এই ব্রত উৎসব পালিত হয় এবং নারীরাই এতে অংশগ্রহণ করেন। একটি সরায় তুষ ও নৈবেদ্য সাজিয়ে এই ব্রত পালন করা হয়। কোথাও সমগ্র পৌষ মাস ধ'রে, কোথাও সমস্ত অগ্রহায়ণ মাস ধ'রে এই ব্রত-উৎসব পালিত হয়। ভাদুর মতই এর মুখ্য আকর্ষণ এর তাৎক্ষণিক গানগুলি। ভাদুর মত টুসুরও মূর্তি আর্যীভবনের ফলে সৃষ্ট হলেও ভাদুর সঙ্গে এর বড় পার্থক্য প্রকাশের অকপটতায়। অর্থাৎ টুসু যে শস্য-উৎসব— এ নিয়ে কোনো বিতর্কের অবকাশ নেই, এবং ভাদুর মত টুসুরও বহুল বিবর্তন দুর্লক্ষ্য। যাইহোক, টুসু গানও বাংলা লোকসঙ্গীতকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে একটি গান উপস্থাপিত হল :

ও বড় বউ রাগ কেনে, দাদা দিবে আজ শাড়ী কিনে।
বড় দাদা বাক্স খুলে আনছে গো টাকা গুণে।
টাওনায় আছে ফর্দি শাড়ী, তোমায় দিবে আজ কিনে।
বছর দিনের বড় পরব, দাদার আছে গো সবাই মনে,
দশ টাকা দামের শাড়ী লিলি, কান ফুল দিলি কই কানে।।
আস্ছে বছর কান ফুল লিবি, টাকা রাখবি গোপনে।
শাউড়ি ননদ জানতে পালে, গাল দেবে তোরে দুই জনে।।[১৪]

৬। কৃষি সম্পৃক্ত ধর্ম ও উপাসনা

বাতাড়ুগল, দেনীআনা ও ইতু ইত্যাদি বিভিন্ন ব্রতও এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

বাতাড়ুগল নামক সংস্কারটি হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে পালিত হয়,— যা আসলে

ধান্য উপাসনারই এক বিশিষ্ট রূপ। ফসল কাটার আগে কৃষক এই অনুষ্ঠানটি পালন করেন। আমরা ধর্ম অধ্যায়ে বলেছি যে প্রথম দিন ধান কাটার সময়ে বাতা গাছের পাঁচটি ডগা সিদুঁর ইত্যাদি মাঙ্গলিক দ্রব্যে অনুলিপ্ত ক'রে তার সঙ্গে পাঁচটি ধানের ছড়া বাঁধা হয়। এটিকে লক্ষ্মীর আসন মনে ক'রে ঘরে রেখে দেওয়া হয়। ময়মনসিংহ গীতিকার 'মলুয়া'-য় এর উল্লেখ আছে।[১৫]

মুসলমান সমাজে আচারটির বর্ণনা এইরূপ:

"অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম ধান কাটিবার পূর্বে কাঁচি নিয়ে ক্ষেত্রে গিয়ে এক ওয়াসে (নিঃশ্বাসে) পাঁচটি ধানের আগ কাটিয়া সেই আগ পাঁচটি মাথায় নিয়া ঘরের কোণায় আনিয়া বাঁধিয়া রাখিতে হয়। ... এরূপ করিলে সেই বছরের ধানে খুব মুরাদ (বরকত) দেয়।"[১৬]

মাঠের ধান যাতে ভালোভাবে ঘরে আসে তাই এই অনুষ্ঠান। হিন্দু আচারের সঙ্গে মুসলমান আচারও প্রায় অভিন্ন তা দেখা গেল। বস্তুত ধানগুচ্ছকটিকে এভাবে বন্দনা করা ও ঘরে স্থাপন করার মধ্যে ধান্যকে দেবত্বের আসনে বসিয়ে প্রকারান্তরে তাকে পুজো করা হয় এবং এতে এই যাদু বিশ্বাস কার্যকরী হয় যে, ধান্যরূপী দেবতা গৃহে অচলা হলেন।

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলেই ফসল কাটার পর ফসলের শেষ আঁটি নিয়ে মূর্তি তৈরী ক'রে শোভাযাত্রা বা পূজা করা হয়, ফ্রেজারের গোল্ডেন বাও গ্রন্থে তার দৃষ্টান্ত আছে। ইংল্যান্ড-অস্ট্রিয়ায় 'শস্যরাণী', জাপানের 'শস্যমাতা', পোলান্ডের 'শস্যবুড়ি'র অনুরূপ বাংলার 'লক্ষ্মীর ছড়' ! এই আচারটিই দেনী আনা।[১৬ক] ধান কাটার পর শেষ শস্যমুষ্টি শস্যদেবী হিসেবে পবিত্রতার সঙ্গে গৃহে রক্ষিত ও পূজিত হয়। এটিও নিঃসন্দেহে ধান্য উপাসনা।

ইতু, মাঘমণ্ডলের ব্রত এমন কিছু ব্রতানুষ্ঠান কৃষি সম্পৃক্ত, যেখানে সূর্য উপাসনাই মুখ্য। উল্লেখ্য, এই সব অনুষ্ঠানও ছড়া নির্ভর। পরবর্তী অংশে সে বিষয় আলোচনা হয়েছে।

সুতরাং দেখা গেল, মূলত কৃষিনির্ভর বঙ্গ সংস্কৃতির অন্তঃস্থল থেকে কত সহজভাবে এই সমস্ত ছড়া-ধাঁধা-প্রবাদ— এককথায় বাংলা লোকসাহিত্যের বিচিত্র প্রকরণগুলি স্বতোৎসারিত হয়েছে। অতএব প্রসঙ্গান্তরে যাওয়া যাক।

দুই ।। উর্বরতা-তন্ত্র ও বাংলা লোকসাহিত্য:

১. উর্বরতা-তন্ত্র : উৎস বিবর্তন ও বৈশিষ্ট্য:

শিকারজীবী, খাদ্যান্বেষণকারী মানুষ নব্য প্রস্তর যুগেই (Neolithic Period) খাদ্য উৎপাদনকারী মানুষে রূপান্তরিত হল। এই সময়ে তারা পশুপালন, কৃষিকর্ম, মৃৎপাত্র নির্মাণ, বয়নশিল্প, গোষ্ঠীবদ্ধ ভাবে একস্থানে বসবাস ও গৃহ নির্মাণ— এমন কি

স্মৃতিসৌধও স্থাপন করতে শিখেছিল। কাজেই নব্য প্রস্তর যুগ মানব সংস্কৃতির বিবর্তন-পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

মানুষের কৃষিকাজ শেখার ঘটনাই মানব সভ্যতার ইতিহাসে এত নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করল। কৃষিকাজ মানুষকে স্থায়ীভাবে বসবাস করার তাগিদ দিল। এবং বলাবাহুল্য স্থায়ী বসবাস ও খাদ্য সংক্রান্ত অনিশ্চয়তা ও উদ্বেগ প্রশমিত হলে, মানুষ তার অন্তর্নিহিত শক্তি ও বুদ্ধি দিয়ে শিল্প ও জ্ঞানচর্চার অবকাশ পেল; তাই এ যুগে আয়ুধ নির্মাণে যেমন বিপ্লব এল তেমন স্মৃতিসৌধও নির্মিত হল। কাজেই কৃষিকাজ মানবেতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা।

নব্যপ্রস্তর যুগে হলেও, কৃষিকার্য একদিনের ফল নয়। পূর্ববর্তী প্রত্ন প্রস্তর যুগের শেষদিক থেকে এ সম্পর্কে মানুষ অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছিল। এ অভিজ্ঞতা আহরণের অবকাশ নারীদের ছিল বেশি কারণ শিকারের দায় ছিল মূলত পুরুষের। বস্তুত কৃষিকর্মও প্রধানত নারীদের আবিষ্কার, তার পুরোভাগে নারীরই ভূমিকা[১৭]।

নারীই যেহেতু প্রত্যক্ষভাবে কৃষিকর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিল, তাই উর্বরতাকেন্দ্রিক ধর্মধারা, উর্বরতা-তন্ত্র বা উর্বরাতন্ত্রের (fertility cult) কেন্দ্রবিন্দুতে নারীই বিদ্যমান। আমরা জানি, খাদ্যান্বেষণের যুগেই ধীরে ধীরে মানুষের মধ্যে যাদু বা ঐন্দ্রজালিক ধ্যান-ধারণা গড়ে উঠেছিল— বিভিন্ন পর্বতগুহায় আবিষ্কৃত চিত্রই তার প্রমাণ। সুতরাং খাদ্যোৎপাদনের যুগে তার বিকাশ যে প্রভূত পরিমাণে হয়েছিল তা বলাই বাহুল্য। নারীই সন্তান সৃষ্টি করে। কৃষিক্ষেত্রও ফসল উৎপন্ন করে। যে প্রক্রিয়ায় নারী সন্তান ধারণ করে, সমপ্রক্রিয়া যদি কৃষিক্ষেত্রেও অনুসৃত হয় তবে ক্ষেতে ফসল ফলবে, এই বিশ্বাসে ঐ সমপ্রক্রিয়া, যাদুক্রিয়ার—মধ্যে সম্পন্ন হল যার ফলে ক্রমে গড়ে উঠল উর্বরাতন্ত্র।

ফ্রেজার তাঁর 'গোল্ডেন বাও'-এ এমন বহু দৃষ্টান্ত দিয়েছেন যেখানে ঐ বিশ্বাস প্রবলভাবে কার্যকরী। পৃথিবীর সর্বত্র প্রায় এই বিশ্বাস প্রচলিত ঃ "But ruder races in other parts of the world have consciously employed the intercourse of the sexes as a means to ensure the fruitfulness of the Earth. ..."

"... the process by which human beings reproduce their kind with the process by which plants discharge the same function, and fancied that by resorting to the former they were simultaneously forwarding the latter".[১৮]

এর ফলে বৃক্ষ বা কৃষিক্ষেত্রকে মানুষ নারীর সঙ্গে সমীকৃত করতে পেরেছে; এমনকি এইজন্য পরবর্তীকালে বৃক্ষবিবাহ বিষয়টি প্রচলিত হয়েছে। দম্পতির মত গাছও সন্তান অর্থাৎ ফল বা চারাগাছ উৎপাদন করবে— এখানে এই বিশ্বাস কার্যকরী হয়। যেমন রাজবংশী সমাজে বট-পাকুড়ের বিবাহ দেওয়া হয়। "বৃক্ষ এখানে উর্বরতা ও মানুষের প্রতীকরূপে পরিগণিত। যে নারী নিঃসন্তান, সে ভাবে, বট-পাকুড়ের

মিলনের ফলে যেমন চারা গজায়, তেমনি তাহারও সন্তান হইবে, ...।"[১৯] পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বৃক্ষবিবাহ প্রচলিত, অবশ্য বৃক্ষ বিবাহের অন্যান্য যাদুভিত্তিক কারণও বিদ্যমান।

যাইহোক, ভূমিকে কর্ষণ করে ফসল উৎপাদনের প্রক্রিয়াটি এবং নরনারীর যৌনমিলন ও সন্তান সৃষ্টির বিষয়টি ক্রমে সমীকৃত হয়ে ওঠে মানুষের পর্যবেক্ষণ, অভিজ্ঞতা ও যাদু বিশ্বাসগত কারণে। আর মানব জীবন, কি শস্য কি সন্তান— সার্বিক দিক থেকেই উর্বর ও সফল হয়ে উঠতে চায়, ফলে সেই আকাঙক্ষায় ক্রমে গড়ে ওঠে উর্বরতাকেন্দ্রিক ধর্মধারা। একথা অবিসংবাদিতভাবেই সত্য যে আদিম ধর্ম ধারা গড়ে উঠেছিল অতিপ্রাকৃত শক্তিকে বশীভূত ক'রে নিজের মাঙ্গলিক প্রয়োজন চরিতার্থ করার তাগিদ থেকেই। কিন্তু ঐ একই কারণে প্রকৃতি তোষণা ও তৎসংক্রান্ত যাদু আচার বিভিন্ন কাল্ট বা ধর্মধারা সৃষ্টি করেছিল,— এমনকি এখনো তা ক'রে থাকে। নদীকে কেন্দ্র ক'রে তাই গড়ে ওঠে নদী উপাসনা (river cult) বা ধান্যকে কেন্দ্র ক'রে ধান্য উপাসনা— আমরা অন্যত্র তা আলোচনা করেছি। বিভিন্ন ধর্মের মানুষ এইসব উপাসনা বা ধর্মধারা পালন করে থাকে। উর্বরতাকেন্দ্রিক ধর্মধারা (fertility cult) এমন একটি 'কাল্ট' হলেও তা মূলত কোনো বিশিষ্ট প্রাকৃতিক বস্তুকে আশ্রয় করেনি, করেছে প্রাকৃতিক এক ভাব বা ধারণাকে— তা হল অধিক প্রজননশীল ও উৎপাদনক্ষম বা উর্বর হওয়ার ধারণা। অধিক উৎপাদনশীলতার জন্যে— তা সন্তান অথবা শস্য— যাই হোক না কেন, তার জন্য কী কী করণীয় (অবশ্যই তা যাদু আচার, বিশেষত সাদৃশ্য বিধান) ও আচরণীয়— তাই-ই ফার্টিলিটি কাল্টে অনুসৃত হয়। আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়, মানুষের উর্বরতাকেন্দ্রিক ধ্যান-ধারণা বিভিন্ন উপাসনা পদ্ধতি বা কাল্ট সৃষ্টি করেছে; যেমন ভারতবর্ষে লিঙ্গপূজা, সূর্যপূজা ইত্যাদি; আবার এইসব কিছু মিলেই উর্বরতাতান্ত্রিক ধর্মধারা একটি বিশিষ্ট ধর্মধারা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই আলোচনা থেকে উর্বরাতন্ত্র সম্পর্কে আমরা বলতে পারি :

ক। নব্যপ্রস্তর যুগে কৃষির উৎপত্তি ও বিকাশের সঙ্গে এই ধর্মধারার সৃষ্টি

খ। এটি বিশেষ কোনো ধর্ম অথবা উপাসনা পদ্ধতি নয়

গ। এটি আসলে অনুকৃতি ও সংযোগমূলক যাদু বিশ্বাসের মধ্য থেকেই সৃষ্ট

ঘ। মানুষের যৌন ক্রিয়ার অনুকৃতিই মূলত অনুসৃত

ঙ। শস্য বা ফসল উৎপাদন ও সন্তান উৎপাদনের কারণ পদ্ধতি ও ধারণা সমীকৃত

চ। কোনো কোনো উপাসনা, উৎসব বা পূজার উৎস হল এই ধর্মধারা এবং এটি এইসব পূজা ও বিশেষ বিশেষ ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়াচারেরই মিলিত রূপ

ছ। জননাঙ্গের প্রতীক ও বিভিন্ন সংকেতের মধ্যেও এই ধর্মধারা প্রকাশমান এবং

জ। কৃষিক্ষেত্রে শস্য ও মানব সন্তান কামনাই এই ধর্মধারার লক্ষ্য এবং এই চাহিদাই এই ধর্মধারার উৎস, কিন্তু সূচনায় ফসল কামনাই ছিল প্রধান।

—উপর্যুক্ত বিষয়গুলি লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, ফার্টিলিটি কাল্টের বাংলা প্রতিশব্দে 'ধর্ম' কথটি ব্যবহৃত না হলেও 'ধর্মধারা' কথাটি সাধারণভাবে প্রচলিত আছে। কিন্তু তা সংকীর্ণ অর্থে 'ধর্ম' বলতে যা বোঝায় (ধর্ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য) তা নয় বরং ব্যাপকভাবে তা জীবনচর্যার বিশেষ একটি দিককেই নির্দেশ করে। এমনকি এ থেকেই শিব বা সূর্য পূজার মতো কোনো কোনো কাল্টেরও সৃষ্টি হয়েছে। তা পূর্বেই বলা হয়েছে।

ফার্টিলিটি কাল্টের বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে 'উর্বরতাকেন্দ্রিক যাদুবিশ্বাস' কথাটিকেও ধরা যায় না, কেননা ফার্টিলিটি কাল্ট জীবনের বৃহত্তর ও ব্যাপক অংশ জুড়ে বিভিন্নভাবে বিরাজ করছে ও মানব সংস্কৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করছে। পক্ষান্তরে যাদু বিশ্বাস নিছক কিছু বিশ্বাস যা জীবনের বিভিন্ন দিকে বিচিত্রভাবে বিদ্যমান থাকলেও উর্বরাতান্ত্রিক ধর্মধারার মত নির্দিষ্ট লক্ষ্য তার নেই, বিভিন্ন প্রবণতা, ধর্ম ও ধর্মধারা ইত্যাদিতে নিছক প্রক্রিয়া হিসেবে তাকে কাজে লাগানো হচ্ছে। ফার্টিলিটি কাল্টের বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে 'উর্বরাতান্ত্রিক ধর্মধারা' কথাটির ব্যবহারও বিভ্রান্তিকর, যেহেতু ধর্ম বা ধর্মধারা ইত্যাদি শব্দগুলি বলা মাত্রই ধর্মের সংকীর্ণ অর্থদ্যোতনাই আমাদের মনে প্রকট হযে ওঠে। সুতরাং মনে হয়, ফার্টিলিটি কাল্টের বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে উর্বরতা-তন্ত্র বা 'উর্বরাতন্ত্র' শব্দটিই দ্বিধাহীনভাবে গৃহীত হতে পারে।

উর্বরাতন্ত্র ও দেবদেবী

আদিম নরগোষ্ঠীর কাছে ভূমি এবং নারী সমার্থক ছিল, নারীর সন্তান ধারণের সঙ্গে ভূমির শস্য ধারণের যোগ ছিল। ফলে তাদের কাছে নারী বিশেষ শক্তিরূপিণী ছিল এবং সমাজ ছিল মাতৃতান্ত্রিক।[২০] হরপ্পায প্রাপ্ত একটি সীলমোহরের একদিকে এক নারীমূর্তির মাতৃঅঙ্গ থেকে লতাগুল্ম উদ্‌গত হয়েছে ও অন্যপিঠে এক নগ্না নারীমূর্তিকে বলি দেওয়া হচ্ছে— এমন বিষয় খোদিত আছে।[২১] কাজেই সিন্ধু সভ্যতার যুগেও (৩০০০-২৫০০খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) উর্বরতাতন্ত্র যথেষ্ট পরিণত ছিল। আব এরই অনিবার্য পরিণতি হিসেবে মাতৃদেবীর উদ্ভব। সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন মাটিব পুতুল ও মাতৃকামূর্তি— যাদের নারীত্ব সূচক অঙ্গগুলিই স্পষ্ট (ভেনাস ফিগাবাইনস্) এগুলিই যে আমাদেব মাতৃদেবীর পূর্বরূপ তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

সিন্ধু উপত্যকার প্রাগার্য অধিবাসীরা মাতৃকাদেবীর সঙ্গে পুরুষ দেবতারও পূজা করেছেন। প্রাচীন এশিয়ার অধিবাসীদের ও বর্তমান কালের ভারতীয় হিন্দুদের মত তাঁরা সৃজন শক্তির আধার হিসাবে এক পুরুষ দেবতার উপাসনা করতেন। মহেঞ্জোদাড়ো থেকে যে তিন মুখ বিশিষ্ট এক দেবতার মূর্তি পাওয়া গিয়েছে, তার দ্বারা এটা প্রমাণিত হয়।

এই ধ্যানস্থ, পর্যঙ্ক আসনে উপবিষ্ট ও উর্ধ্বলিঙ্গ মূর্তিটি যে আদি শিবের, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। বস্তুত পরবর্তীকালের শিবের তিনটি মূলগত ধারণা

আমরা এখানে দেখতে পাই। তিনি (১) যোগীশ্বর বা মহাযোগী, (২) পশুপতি ও (৩) ত্রিমুখ।[২২]

ভারতবর্ষে শিব ও শক্তি লিঙ্গ-যোনী প্রতীকে পূজিত হয়। এরও উৎস নিঃসন্দেহে প্রাগার্য সিন্ধু সভ্যতাকালের উর্বরাতন্ত্র। সিন্ধু উপত্যকার তাম্রশ্মীয় যুগের আবিষ্কারে লিঙ্গ-যোনী প্রতীক পাওয়া গিয়েছে, ঋগবেদে তাদের শিশ্নোপাসক বলে আর্যরা ঘৃণা প্রকাশ করেছে।[২৩]

আমরা জানি আর্যরা বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির উপাসনা করত, যা আসলে প্রকৃতি তোষণা ও সপ্রাণবাদী ধারণার ফলশ্রুতি। কিন্তু সূর্যপূজার আর একটি উৎস হল উর্বরাতন্ত্র। কৃষি ভূমিকর্ষণ ও সৌরশক্তির অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক আদিম জনগোষ্ঠীর (primitive man) অজানা থাকার কথা নয়। 'এ কারণেই কৃষির প্রাচীন কেন্দ্রসমূহে আমরা মাতৃকাদেবীর পূজার সঙ্গে সূর্যপূজার সংযোগ লক্ষ্য করি। সূর্যের প্রতীকচিহ্ন— চক্র ও স্বস্তিকা— আমরা মহেঞ্জোদাড়োয় প্রাপ্ত কয়েকটি সীলমোহরের ওপর দেখতে পাই। প্রাগার্য সূর্যপূজা এখনও হিন্দুর লোকায়ত ধর্মের মধ্যে জীবিত আছে। বিহারের ছটপূজা ও বাঙালীর ইতুপূজা ও রালদুর্গার ব্রত তার প্রমাণ। বৈদিক আর্যগণের মধ্যে সূর্যপূজার প্রচলন থাকলেও এ সকল লোকায়ত পূজা সম্পূর্ণ ভিন্ন'।[২৪]

সুতরাং একটি বিষয় স্পষ্ট যে মাতৃকাদেবী এবং শিব বা লিঙ্গ পূজার উৎস হল উর্বরাতন্ত্র। ভারতীয় উপমহাদেশে, তথা হিন্দু ধর্মে শেষপর্যন্ত এই অনার্য সংস্কৃতি ব্রাহ্মণ্য সংস্কাব বা আর্য সংস্কৃতির সংঘাতের মধ্যে দিয়েও অস্তিত্ববান হয়ে আছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন সংস্কার-ঐতিহ্য-মূর্তিপূজা— এককথায় বাঙালীর সংস্কৃতিকে, ঐ উর্বরাতন্ত্র ও তৎপ্রসূত ধর্মধারাই মুখ্যত নিয়ন্ত্রিত করছে। আর এই বিষয়টি নিঃসন্দেহে সত্য যে ভারতীয় সংস্কৃতির তথা অনার্য সভ্য সংস্কৃতিব প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ আমাদের সিন্ধু সভ্যতার মধ্যেই লুকিযে ছিল।

সিন্ধুসভ্যতা ও বাঙালী সংস্কৃতি

জনৈক নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক জানিয়েছেন যে বাংলাদেশেই তাম্রাশ্ম সভ্যতার জন্ম ও বিকাশ এবং এই সভ্যতার পবিযান (মাইগ্রেসন) পূর্ব থেকে পশ্চিমে হয়েছিল। পেন্‌সিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়েব পুরাতত্ত্বের অধ্যাপক গ্রেগরী পয়সেলও এই মত পোষণ করেন বলে তিনি জানিয়েছেন। সিন্ধু সভ্যতা তাম্রাশ্ম সভ্যতা। ফলে মনে হয় এই দু'স্থানের সভ্যতা আসলে একই স্থান থেকে উদ্ভূত। নৃতাত্ত্বিকের মতে, বাঙালীরাই সিন্ধুসভ্যতার কেন্দ্রে উপস্থিত ছিল যা পাঁচটি বিষয় থেকে প্রমাণিত হয়:

১) মাতৃদেবীর উপাসনা
২) মৎস্য ভক্ষণ
৩) হস্তীর সঙ্গে পরিচয়
৪) ধানের ব্যবহার
৫) শিব ও শিবলিঙ্গের আরাধনা।[২৫]

সিন্ধুসভ্যতার ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রাপ্ত মাতৃমূর্তি, বঁড়শি, হস্তীর প্রতিকৃতি, শিব-শিবলিঙ্গ ও লোথালে ধানের ব্যবহার— ইত্যাদি বাঙালী-সংস্কৃতির পরিচয়বাহী। কেননা হাতীর আদি নিবাস বাংলাদেশ, মাছের সঙ্গে বাঙালীর সংযোগ ওতপ্রোত, মাতৃদেবীর আরাধনা বাংলাদেশে কৃষির সঙ্গে আরম্ভ হয় এবং ধান চাষেরও সূচনা হয় বাংলাদেশে। বাঙালীর প্রিয় ও প্রধান খাদ্য ধানের চাষ বঙ্গোপসাগরের আশেপাশেই যে উদ্ভূত হয়েছিল সে বিষয়ে পণ্ডিতমহলে মতবিরোধ নেই। কার্‌লো চিপোলোর 'দি ইকনমিক হিস্টরি অব্ ওয়ার্লড পপুলেশন' গ্রন্থে এই মতের সমর্থন মেলে,— এমনকি তিনি স্পষ্টতই বাংলাদেশকে নির্দেশ করেছেন।[২৬] নৃতাত্ত্বিক কার্লটন এস. কুন. তাঁর 'হিস্ট্রি অব্ ম্যান' গ্রন্থে প্রদত্ত মানচিত্রে (পৃ-১৪৫) নবোপলীয় সভ্যতার উৎস স্থান নির্দেশ করেছেন পূর্বভারতকে।

আরও জ্ঞাতব্য বিষয় হ'ল: "মাতৃদেবীর পূজার উদ্ভব নবোপলীয় যুগে কৃষির সূচনার সঙ্গে ঘটেছিল। বাংলায় নবোপলীয় বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল ধান্যের চাষ নিয়ে। মনে হয়, ধানের চাষের সঙ্গে মাতৃদেবীর পূজা বাংলাতেই শুরু হয়েছিল। ধান্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হচ্ছেন লক্ষ্মী। লক্ষ্মীপূজার অপর নাম খন্দপূজা। খন্দ শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে ফসলাদি।"[২৭]

বাংলায় বিভিন্ন মাতৃদেবী একদা যে উর্বরাতন্ত্রর সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। 'ঋগ্‌বেদ ও শতপথ ব্রাহ্মণে' উল্লিখিত 'শ্রী' ভারতের প্রাচীন দেবী, যিনি প্রণয় ও উর্বরতার সঙ্গে সম্পৃক্ত, আবার তিনি লক্ষ্মীর সঙ্গে একীভূতা, আবার সরস্বতী নদীরূপিনী ও উর্বর পলিজমি সৃষ্টি করার কারণে তিনি ছিলেন উর্বরতাদায়িনী— ঋগ্‌বেদে সেই ভাবেই তিনি বর্ণিতা। আসলে "সরস্বান্ বা সূর্যের কন্যা এবং নদীর সমন্বিত রূপে তো তিনি অবশ্যই ফার্টিলিটি কাল্‌টের সঙ্গে ভাবগত রূপে সংযুক্তা"।[২৮] আবার এইসব মাতৃদেবীর অনেকেই 'শাকম্ভরী'— ইত্যাদি নামে পরিচিতা— এমনকি দুর্গা-মনসাও। কাজেই এ থেকে প্রমাণ হয় মাতৃদেবীর উৎস ঐ উর্বরাতন্ত্র, অর্থাৎ আদিতে সকলেই মোটামুটি উর্ববতা ও শস্যের সঙ্গে সম্পৃক্তা ছিলেন। সুতরাং নবোপলীয় যুগে বাংলায় ধান চাষের উদ্ভব যদি নবোপলীয় বিপ্লবের সূচনা করে, তবে বলতেই হয় তারই অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতি হিসেবে উর্বরতাকেন্দ্রিক মাতৃদেবীদের উদ্ভব এই বাংলাদেশেই ঘটেছিল।

আনুমানিক বিশ হাজার বছরের প্রাচীন কিছু ভেনাস ফিগারাইনস্ যা অস্ট্রিয়া-ফ্রান্স-ইতালি ইত্যাদি স্থান থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে— সেগুলি প্রমাণ করে কৃষিপূর্ব যুগেও মানুষ কোনো না কোনো কারণে, হয় বিস্ময়ে নয় গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনকে আরো শক্তিশালী করার জন্য অধিক সন্তান কামনায় যাদু বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে এই মূর্তিগুলি সৃষ্টি করেছিল; কিন্তু কৃষি ও কৃষি উত্তর যুগে, ক্ষেতের সঙ্গে নারী সমার্থক বা একীভূতা হলে মানুষ পৃথকভাবে স্ত্রী চিহ্নের প্রতীকগুলিকে সৃষ্টি করে অর্চনা করতে থাকে। গৌরী পট্ট সহ শিবলিঙ্গ ইত্যাদি প্রমাণ করে পুরুষ চিহ্ন প্রতীকও

গুরুত্বলাভ করেছিল। ভারতীয় তন্ত্র সাধনা, যা খ্রীষ্ট জন্মের বহু পূর্ব থেকেই ভারতীয় লোকায়ত ধর্ম হিসেবে চলে আসছে তার মূলেও পরমা-প্রকৃতি চেতনা বিদ্যমান। তাই নারীসঙ্গ এর ভিত্তি। সাধনার সময় পঞ্চ 'ম' কার (মৎস্য, মাংস, মদ্য, মুদ্রা, এবং মৈথুন) তাই অচ্ছেদ্য অংশ। উল্লেখ্য ভারতে তন্ত্রধর্ম ও সাধনা একসময়ে বিশেষভাবেই পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। যেমন, শুধু 'আগমতন্ত্রবিলাস' থেকেই একুশ' সাতচল্লিশ প্রকার হিন্দুতন্ত্রের অস্তিত্বের কথা জানা যায়, এর বাইরেও বহু তন্ত্রের অস্তিত্ব ছিল।

আমরা পূর্বেই বলেছি, স্ত্রী-চিহ্ন পূজা, রজো-বন্দনা ও বিভিন্ন যাদু বিশ্বাস তন্ত্র সাধনার মধ্যে সমন্বিত হয়েছে, তার সঙ্গে যৌনাচারও সংশ্লিষ্ট। তান্ত্রিক মতের 'মন্ত্র প্রতিষ্ঠা', 'গৌরী বরণ' বা 'বিন্দু' স্থাপনের মত বিষয়গুলির অর্থ ব'লে দিতে হয় না। তন্ত্রের ষটচক্র বা পদ্ম ইত্যাদি প্রকৃতপক্ষে স্ত্রী প্রত্যঙ্গেরই সংকেত তাও বলা বাহুল্য।[২৯] সুতরাং তন্ত্রের উৎপত্তির ক্ষেত্রেও ঐ যাদু আচার ও যাদু বিশ্বাস প্রবণ যৌনাচার এবং স্ত্রীঅঙ্গ অর্চনা মূলত দায়ী, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

উর্বরাতন্ত্র : প্রতীক দ্যোতনা

কৃষিনির্ভর বাংলাদেশের লৌকিক সংস্কৃতির ধারাটি বহুলাংশেই কৃষি ও উর্বরাতন্ত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বাংলাদেশের বিভিন্ন উৎসব, পূজাপার্বণ, বিবাহের প্রধান আচারসমূহ ইত্যাদি সবই প্রায় কৃষি ও উর্বরাতন্ত্রর সঙ্গে ওতপ্রোত। আর লোকসংস্কৃতির অন্যতম অংশ হওয়ায় লোকসাহিত্যেও তার প্রতিফলন যথেষ্ট। আবার কৃষি ও উর্বরাতন্ত্রকেন্দ্রিক বহু ক্রিয়াকর্মের উপর ভিত্তি করেও লোকসাহিত্যের বিভিন্ন প্রকরণ সৃষ্টি হয়েছে, যদিচ তার মধ্যে অনেকাংশই প্রত্যক্ষভাবে কৃষি বা উর্বরতাতন্ত্রের ইঙ্গিত বহন করে না। লোকসাহিত্যের বিভিন্ন অংশে আমরা সেইসব বিষয়গুলি অন্বেষণ করতে পারি। তবে সর্বাগ্রে উর্বরাতন্দ্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উল্লেখযোগ্য কিছু প্রতীক চিহ্নের প্রসঙ্গ দু'এক কথা জানা বোধ হয় বাঞ্ছনীয় হবে, কেননা উর্বরাতান্ত্রিক সমস্ত আচার-অনুষ্ঠানে এই প্রতীক-চিহ্নগুলির অবশ্যম্ভাবী উপস্থিতি।

১। স্ত্রীঅঙ্গ :

উর্বরাতন্ত্রে স্ত্রীজননাঙ্গ স্বাভাবিক কারণেই বিশেষভাবে বন্দিত। এরসঙ্গে আকৃতিগত সাদৃশ্য আছে এমন সব বস্তু, প্রতীক হিসেবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। পান, কড়ি ও বিশেষ বিশেষ মাছ, এর প্রতীক।

'কপর্দক' শব্দ থেকে কড়ি কথাটি এসেছে। সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে বিভিন্নভাবে কড়ির ব্যবহার ছিল। বিনিময় মাধ্যম হিসেবে এর ব্যবহার ছিল মধ্যযুগেও; চর্যাপদ (কবড়ী ন লেই, বড়ী ন লেই) বা মঙ্গলকাব্য ইত্যাদিতে এর উল্লেখ আছে। বাঙালীর বিভিন্ন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানেও এর উপস্থিতি। কেননা অর্থ সৌভাগ্য ও লক্ষ্মীর সঙ্গে কড়ি ওতপ্রোত। ভারতবর্ষেই নয়, আফ্রিকাতেও কোনো কোনো "জনজাতির মধ্যে

ভূত তাড়াতে বা বন্ধ্যাত্ব দূর করতে কড়ি অপরিহার্য এর ওষধিগুণও আছে।"[৩০] বস্তুত কড়ির ব্যবহার ভারতবর্ষে প্রাগার্যকাল থেকে বলেই ঐতিহাসিকদের অভিমত। কিন্তু স্ত্রীজননাঙ্গের সঙ্গে কড়ির আকৃতিগত সাদৃশ্য হেতু বন্ধ্যাত্ব নিবারণের যাদুক্রিয়ায় বা বিবাহে কড়ি খেলায়, লক্ষ্মী-সৌভাগ্য ইত্যাদি ধারণায় কড়ি উর্বরতার প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত। সম্ভবত বিভিন্ন ক্ষেত্রে— যে অর্থেই ব্যবহৃত হোক, কড়ির প্রচলন যে ঐ প্রতীকী তাৎপর্যের জন্য— এমন অনুমান অযৌক্তিক হবে না। কাটা মাছও ঐ আকৃতিগত সাদৃশ্যের জন্য উর্বরাতান্ত্রিক প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়, অবশ্য এ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ মাছটিই প্রতীক হিসেবে গণ্য হয়। কেউ কেউ বলেছেন, "... পোনা, ইলিশ ইত্যাদি মাছের টুকরো তাদের আকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের জন্য স্ত্রী-চিহ্ন দ্যোতক হওয়ায়, এইসব মাছকে 'এয়ো' হিসেবে গণ্য করেই তত্ত্বে পাঠানো হয়।"[৩১] —এই মতের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন না তুলেও আমরা বলতে পারি, নদ-নদী প্রধান বাংলাদেশে অগণ্য মাছের উৎপাদন, মাছের অসংখ্য আঁশ ও ডিম ইত্যাদি মাছকে উর্বরতা-প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করেছে। উল্লেখ্য, কোনো কোনো দেশে মাছের মত সাপ-ব্যাঙ প্রভৃতিও উর্বরতা-দ্যোতক চিহ্ন হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

২। পুরুষঅঙ্গ :

স্ত্রীঅঙ্গের মত পুরুষ জননাঙ্গও বিভিন্ন প্রতীকে ব্যবহৃত হয়। কলা অথবা মাগুর, লেটা কই জাতীয় মাছ এর প্রতীক। নববধূর হাতে এই জাতীয় মাছ ধরানোর অর্থ কাজেই অবোধ্য নয়। বিভিন্ন উর্বরতা সূচক অনুষ্ঠানে কলা অপরিহার্য। কলার অধিক ফলনশীলতার বিষয়টিও এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য।

৩। মাতৃবৈশিষ্ট্য ঃ

উর্বরাতন্ত্রে মাতৃবৈশিষ্ট্য বিভিন্ন প্রতীক দ্বারা ব্যঞ্জিত। ভেনাস ফিগারাইনস্ এই প্রণোদনা থেকেই সৃষ্ট। বিভিন্ন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান ও পূজায় ব্যবহৃত পিটুলি, জলভরা ঘট, ডাব, নারকেল ইত্যাদি এর প্রতীক। বাংলাদেশের বিভিন্ন ব্রতে ব্যবহৃত পিটুলি অর্থাৎ চালবাটা দিয়ে নির্মিত বা অঙ্কিত নারীমূর্তি ও মাটির পুতুল লক্ষ্য করলে দেখা যায় কেবলমাত্র স্ত্রীচিহ্নগুলিই স্থূলভাবে এখানে প্রকটিত। ঘট ডাব ইত্যাদি গর্ভবতী রমণীর সংকেত তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ঘট বা ডাবে অঙ্কিত বসুধারা চিহ্নের দ্বারা বিষয়টি আরো প্রমাণিত হয়।

৪। অধিক প্রজননশীলতা :

অধিক শস্য ও সন্তান কামনা আদিম জনগোষ্ঠীর অন্যতম চাহিদা ছিল। মাত্র কয়েক শতক পূর্বেও 'শতপুত্রের জননী' হওয়া সৌভাগ্যজনক বিষয় বলে গণ্য হত। তাই নারীর উর্বরতা ছিল বিশেষভাবে কাম্য। এই বিষয়টিও বিভিন্ন প্রতীক-দ্যোতনায় বিবাহ, ব্রত ও অন্যান্য মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে বড় অংশ জুড়ে বিরাজ করে। এই

প্রতীকগুলি মূলত অধিক ফলনশীল বস্তু। যেমন পান, সুপারি, মাছ, দূর্বা, ধান গাছ। আশীর্বাদ করার ক্ষেত্রে তাই ধান দূর্বার ব্যবহার অনিবার্য। বিবাহে গাঁটছড়া বাঁধায় ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সুপারি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। এখানে অনুকৃতি মূলক যাদু বিশ্বাসও ক্রিয়াশীল। নদীমাতৃক বাংলাদেশে বাঙালীর মাছ অতিপ্রিয়। মাছের প্রাচুর্য, অসংখ্য আঁশ এবং ডিম অধিক প্রজননশীলতাকেই দ্যোতিত করে তা আগেই বলেছি। সেইরকম পানের বহুল ফলন ও আকৃতির জন্য পানও উর্বরতার দ্যোতক। অবশ্য আরো বহুবিধ কারণে পান বাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে আবদ্ধ। যেমন প্রথমত, বাংলাদেশেই পানের অধিক ফলন, দ্বিতীয়ত পান সুপারী কাম উদ্রেককারী বলে প্রচলিত এবং আয়ুর্বেদ ও কামশাস্ত্রে তার সমর্থন আছে, তৃতীয়ত, শ্রদ্ধা-আতিথেয়তা জ্ঞাপনে বাংলায় পানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল, তাই নান্দীমুখের মত পূর্বপুরুষ অর্চনাতেও পান আবশ্যক এবং চতুর্থত নেশা ও বিলাসদ্রব্য হিসাবেও পানের কদর যথেষ্ট।

৫। পুরুষ বীজদ্যোতকতা :

এর প্রতীক হিসেবে শস্য, নুন, ঘি, দই, দুধ ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। "শস্য হল কৃষি নির্ভর সংস্কারগত উপকরণ। প্রাগার্যভাষী সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী। শস্য পুরুষের বীজদ্যোতক, ...নববধূর ঝাঁট দিয়ে শস্যকণা আহরণ করার তাৎপর্যটি অতঃপর সুবোধ্য।"[৩২] অনুরূপ সুবোধ্য দুধ এবং লাল রঙ। এ প্রসঙ্গে আলতার মিশ্রনে নববধূর পা ডোবানোর বিষয়টি স্মর্তব্য। পৃথিবীর কোনো কোনো সমাজে বিয়ের অনুষ্ঠানে নুনভর্তি পাত্র ছুঁড়ে ভাঙার মধ্যে এরই সংকেত বিদ্যমান— গোল্ডেন বাও গ্রন্থে ফ্রেজার তার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন।

৬। অন্যান্য বিষয় : সিঁদুর-হলুদ-রঙ :

বিবাহ ও মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে সিঁদুরের ব্যবহার বাংলাদেশেই সর্বাপেক্ষা বেশি। নৃতাত্ত্বিক শরৎচন্দ্র রায় দেখিয়েছেন যে ছোটনাগপুরের ওরাওঁ, বীরহোড় প্রভৃতি উপজাতির কন্যার সিঁথিতে সিঁদুর দানই বিবাহের প্রধান ও একমাত্র আচার। তাদের এই অনুষ্ঠানের নাম 'ইসুং সিন্দ্রি'— যা থেকে 'সিঁদুর' কথাটির উদ্ভব। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যেরও সেই অভিমত।[৩৩] সিঁদুর শব্দটিও অনার্য। রিস্‌লের মতকে উদ্ধৃত করে তিনি বলেছেন যে এটি ছোটনাগপুরের অনার্য আদিবাসীদের কাছ থেকেই বাঙালী হিন্দুর মধ্যে সংক্রমিত হয়েছে। তাঁর মতে সিঁদুর নামক রঞ্জকটি রক্তেরই সমার্থক। কন্যার ললাটে রক্তবিন্দু দেওয়া ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যার আদিবাসী অঞ্চলে বিদ্যমান ছিল, কোথাও বরের কনিষ্ঠ আঙুল থেকে রক্ত বের করে পানের সঙ্গে কন্যাকে খেতে দেওয়া হয়, কুর্মী জাতি গালার রঙের সঙ্গে রক্ত মিশিয়ে তা সিঁদুর হিসেবে ব্যবহার করে, কন্যার পায়ের আঙুলে বরের আত্মীয়রা গাল্যার রঙ ঘষে দেয়।[৩৪] সম্ভবত হিন্দুর আলতা ব্যবহার এমন প্রথা থেকেই এসেছে।

আবার যুদ্ধ বিজয়ের প্রতীক লাল রঙ— যার উৎস অনিবার্যতই রক্ত। ফলে

রাক্ষস বিবাহে (ম্যারেজ বাই ক্যাপচার) রক্ত চিহ্নের ভূমিকা নিয়েছে সিঁদুর— এমন ধারণাও অসঙ্গত নয়।

কিন্তু সিঁদুর সম্পূর্ণতই উর্বরাশক্তির প্রতীক। পৃথিবীর বিভিন্ন সমাজে লাল রঙ উর্বরাশক্তির প্রতীক হিসেবেই গণ্য হয়। এই লাল রঙের উৎস রক্ত ও ঋতুস্রাব। 'দি মাদার্স' গ্রন্থে রবার্টা ব্রিফল্ট যুক্তিনিষ্ঠভাবে তা দেখিয়েছেন। তাঁকে উদ্ধৃত ক'রে ড. আবদুস সাত্তারও বলেছেন ঋতুস্রাব মেয়েদের যৌবনবতী ও সন্তান ধারণক্ষম হওয়ার লক্ষণ। "ঋতুস্রাবের রক্ত লাল এবং এ কারণেই লাল জিনিস যৌন চিহ্ন বলে আদিবাসীদের ধারণা। এই ধারণার ফলে বিবাহ অনুষ্ঠানে নববধূর জন্য লালপেড়ে কাপড়, লাল মোজা ইত্যাদি দেওয়ার প্রাধান্য তাদের মধ্যে বর্তমান। এমনকি আদিবাসী সমাজে সিঁদুর পরার রীতি একই বিশ্বাস থেকে উদ্ভূত।"[৩৫]

ক্রমে মঙ্গল, সৌভাগ্য ও উর্বরা-বিশ্বাসে সিঁদুর বিচিত্রভাবে বাঙালীর সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে গেছে।

বাঙালীর যেকোন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে হলুদের উপস্থিতি আবশ্যক। ভারতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে হলুদ ব্যবহারের রীতি আছে। প্রাগার্যকাল থেকে হলুদের ব্যবহার চলে আসছে। কৃষি সভ্যতায় সূর্য উর্বরাশক্তির দ্যোতক এবং পুরুষশক্তিরও প্রতীক তা বলাই বাহুল্য। বাঙালীর বিভিন্ন ব্রতের আলপনায় বা লোকশিল্পে তাই সূর্য বা বৃত্ত এসে পড়ে। সূর্যের রঙের সঙ্গে হলুদের যোগ এই রঙের দিক থেকে। ফলে উর্বরাশক্তির অন্যতম চিহ্ন হিসেবে হলুদের ব্যবহার। নৃতাত্ত্বিকের মন্তব্য উদ্ধার করে আমরা বলতে পারি ঃ "Turmeric has been used in India as a substitute for saffron and other yellow dyes from a very early period. In the first place the very colour, resembling Sun-light, was auspicious, and therefore considered to possess protective powers. Consequently turmeric, as well as the colour red, figures largely in marriage ceremonies, and in fact, in all important functions occurring in the life of a Hindu.

It would not be an exaggeration to say that the general auspiciousness of reds and yellows is a direct outcome of sunworship in one form or another. The idea of festivity connected with the colour yellow, through its association with the Sun, has given it an erotic significance. This is another reason why it is the chief colour at weddings, and in any relations, between the sexes. Apart from the custom of smearing the body with turmeric at weddings, garments dyed, or only marked at the corners, with the colour became lucky. It is also used in cases of expectant pregnancy."[৩৬]

উর্বরাশক্তি সম্পন্ন ব'লে হলুদের ব্যবহার তো বটেই, এর অন্যান্য যাদুগুণও আছে ব'লে লোকসমাজের বিশ্বাস। এবং হলুদের যে বিভিন্ন ওষধিগুণ আছে তা বিজ্ঞানসম্মত

ভাবেও প্রমাণিত। হলুদ ব্যবহারের একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত বিবাহে 'গায়ে-হলুদ'-এর অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দ্রব্য সহ হলুদ বাটা বরের দেহে লেপন ক'রে, সেই হলুদ-ই আবার কনের বাড়ি নিয়ে যাওয়া হয় এবং কনেকে তা মাখিয়ে স্নান করানই রীতি। লক্ষণীয় বিষয় হ'ল, পুরুষের দেহ-স্পৃষ্ট হলুদ কনেকে স্পর্শ করান হয়— যার অর্থ সহজেই অনুধাবনযোগ্য। এছাড়াও এর মধ্যে হলুদের নিবর্তকমূলক যাদু বিশ্বাস কার্যকরী নিঃসন্দেহে— অর্থাৎ বিশ্বাস এই যে, কোনো অশুভশক্তি বর-কনেকে এর ফলে স্পর্শ করতে পারবে না। হলুদ যে 'পুরুষশক্তি'র দ্যোতনা বহন করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারও প্রমাণ আছে। বিবাহ বা মাঙ্গলিক (এবং উর্বরতা-সূচক) অনুষ্ঠানে হলুদের সঙ্গে স্ত্রী-উর্বরতা চিহ্ন সিঁদুর বা আলতা একই সঙ্গে ব্যবহৃত হয়। বর কনের হাতে বা কোমরে লাল হলুদ সুতো এই কারণেই বাঁধা হয়।

২. বাঙালীর লৌকিক সংস্কৃতি ও উর্বরা-তন্ত্র

বাঙালী জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রেই, কি কৃষিক্ষেত্রে, কি বিবাহ অনুষ্ঠান, কি ধর্মকর্ম— সর্বত্রই উর্বরাতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। বাঙালীর লৌকিক ব্রত অনুষ্ঠানগুলি যে মূলত ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়াচার, আগেই তা উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গে আর একটি কথা না বললেই নয়, তা হল এগুলি আসলে বেশিরভাগই উর্বরাতান্ত্রিক যাদু আচার। বাঙালী জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত এই উর্বরাতন্ত্র কোথায় কোথায় স্বমহিমায় বিরাজমান তা দেখা যাক :

কৃষি : ক্ষেত্রকে মাতা কল্পনা করা হয়। ক্ষেত্র উর্বরাশক্তিসম্পন্না। তাই অম্বুবাচীতে ধরিত্রী ঋতুমতি হলে হল কর্ষণ তিনদিন বা সাতদিন নিষিদ্ধ। লাঙল দ্বারা ভূমি কর্ষিত হয়। এই লাঙল শব্দটির উৎস 'লন্‌গ' ধাতু, যা থেকে লাঙুল শব্দটিও জাত। মহাভারতে বা কোনো কোনো সুত্রগ্রন্থে লাঙুলহ শব্দের অর্থ লিঙ্গ বা প্রাণীর লেজ। কাজেই লাঙল ও লিঙ্গ সমার্থক সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। "কেননা, সৃষ্টি প্রকল্পে লিঙ্গের ব্যবহার ও শস্য-উৎপাদনে লাঙল দ্বারা ভূমিকর্ষণের মধ্যে একটা স্বাভাবিক সাদৃশ্য আছে। অস্ট্রিক ভাষাভাষী অনেক জাতির লোক ভূমি কর্ষণের জন্য লাঙলের পরিবর্তে লিঙ্গ সদৃশ খনন যষ্টি ব্যবহার করে। এ সম্পর্কে অধ্যাপক হিউবার্ট ও ময়েস বলেছেন যে মেলেনেসিয়া ও পলিনেসিয়ার অনেক জাতি কর্তৃক ব্যবহৃত খননযষ্টি লিঙ্গাকারেই নির্মিত হয়। মনে হয়, ভারতের আদিম অধিবাসীরাও নবোপলীয় যুগে বা তার কিছু পূর্বে এইরূপ যষ্টিই ব্যবহার করত, এবং পরে যখন তারা লাঙ্গল উদ্ভাবন করল, তারা একই শব্দের ধাতুরূপ থেকে তার নামকরণ করল।"[৩৭]

পৃথিবী যেহেতু সকলের মাতা, তাই মানব সন্তানের জন্ম হলেই সিংহল, ব্রাজিল, মধ্য আফ্রিকা— ইত্যাদি বহুদেশের মানুষ শিশুটিকে ভূমিতে স্পর্শ করায় বা ভূমিতে একবার শুইয়ে দেয়।[৩৮]

ভূমি যেমন মাতা, তেমন পিতা হিসেবে সূর্যকে কল্পনা করা হয়। অথবা পুরুষের যে ক্ষমতা নারীর গর্ভ সঞ্চারের একমাত্র পথ, সূর্যরশ্মি, বৃষ্টি ইত্যাদিকে তার সমার্থক বলেও

ধরা হয়। ফলে অনার্য শিব পরিকল্পনায় সূর্যবন্দনাও একীভূত, অধিকন্তু শিবলিঙ্গ, লিঙ্গ হিসেবে তো পূজিত হনই। অগ্রহায়ণ মাসে অনুষ্ঠিত সেঁজুতি ব্রত, ইতু ব্রত, খোয়া ব্রত, পৌষ মাসে তোষলা বা তুঁষ-তুষালী ব্রত, মাঘ মাসে মাঘমণ্ডল ব্রত, ফাল্গুন মাসে বসন্ত রায়ের ব্রতে উত্তম ঠাকুরকে ফুল দেওয়ার অনুষ্ঠান ইত্যাদিতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পুরুষ শক্তিকে আহ্বান করা হয়, যাতে বসুন্ধরা ও নারী ফলবতী হয়ে ওঠে। বস্তুত এমন প্রায় সব ব্রতই আসলে উর্বরতামূলক ক্রিয়ানুষ্ঠান।

যেমন ধরা যাক সেঁজুতি ব্রতের কথা। শিব এখানে মুখ্য আরাধ্য। এই শিব বন্দনা সূর্য বন্দনারই তুল্য। ব্রতিনী আলপনায় শিব, গোয়াল, হাতে পো, কাঁখে পো, গয়না, ধানের মরাই—এমন প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশটি জিনিসের ছবি আঁকে। অতঃপর কুমারী ব্রতিনী প্রতিটি বস্তুর চিত্রে দূর্বা দিয়ে ছড়া ব'লে মনস্কামনা জ্ঞাপন করে। দৃষ্টান্ত হিসেবে একটি ছড়া লক্ষ্য করা যাক, যেখানে নারীর ঐহিক কামনাই প্রকাশিত :

হাতে পো কাঁখে পো।
আমার যেন পৃথিবীতে না পড়ে নো।।
কাজল পাতা কাজল পাতা বাসর ঘর,
দাও গো মালিনী, বর।
যাই গো ঘর।।
মাকসা মাকসা চিত্রের ফোঁটা
মা যেন বিয়োন চাঁদপানা বেটা।।
আমি পূজা করি পিটুলির রান্নাঘর,
আমার যেন হয় কোটার রান্নাঘর।
গঙ্গা যমুনা পূজন,
সোনার থালে ভোজন।
চন্দ্র সূর্য পূজন, সোনার থালে ভোজন,
রূপার ঘট, রূপার গাড়ু।
আমার যেন হয় শাঁখা সোনার খাড়ু।।
যতগুলি নক্ষত্র ততগুলি ভাই।
নক্ষত্র পূজা করে ঘরে চলে যাই।।
আমি পূজা করি পিটুলির গোয়াল,
আমার যেন হয় সত্যিকারের গোয়াল।।[৩৯]

'ইতু' শব্দটি 'আদিত্য' থেকে এসেছে। ইতু প্রত্যক্ষভাবে সূর্যপূজা। খোয়াব্রতে শিবলিঙ্গ পুজো করা হয়, মাটির জ্বলন্ত প্রদীপ অগ্রহায়ণ সংক্রান্তিতে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। এইসব ব্রতগুলিতেও ছড়ার আকারে ব্রতিনীরা মনস্কামনা জ্ঞাপন করে। তোষলা ব্রত (টুসু দ্রষ্টব্য) মূলত ধরিত্রীর শস্যোৎপাদিকা শক্তিরই আরাধনা। উল্লেখ্য এই ব্রতানুষ্ঠানে গোবরের সঙ্গে নতুন ধানের তুঁষ দিয়ে নাড়ু পাকানো হয় এবং প্রতিটি নাড়ুর মধ্যে একটি করে দূর্বা গুঁজে দেওয়া হয়। এখানেও ছড়া ও গানের

আকারে ব্রতিনীরা তাদের মনস্কামনা ব্যক্ত করে।

ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যর মতে পশ্চিমবঙ্গের সেঁজুতি ব্রতই পূর্ববঙ্গে মাঘমণ্ডলের ব্রত নামে আখ্যায়িত, তাঁর মতে "পূর্ববঙ্গের কুমারীগণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত মাঘমণ্ডলব্রতের ভিতর দিয়া প্রাচীন বাংলার সূর্যোপাসনার এক বিশিষ্ট ধারা বিকাশ লাভ করিয়াছে।"[৪০] এই ব্রতের নিয়মকানুনের মধ্যেও তা স্পষ্ট। কুমারী ব্রতিনীরা সূর্যোদয়ের আগে উঠে নদীতীরে বা পুকুর ঘাটে সূর্যবন্দনা মূলক লৌকিক ছড়া ফুল হাতে নিয়ে আবৃত্তি করে। এই ছড়াগুলির মধ্যে আবার সূর্যদেবেব শৈশব, যৌবন, বিবাহ, পুত্রলাভ ইত্যাদি বিষয় বর্ণিত হয়। এবং শেষ পর্যন্ত ব্রতিনীরা সূর্যের কাছে স্বামী পুত্র ইত্যাদি কামনা করে। ড. ভট্টাচার্যের মতে, "মাঘমণ্ডলের ব্রত যে সময়ে উদ্‌যাপন করা হইয়া থাকে, সেই সময়টিও বিশেষভাবে লক্ষণীয়— তখন হইতেই সূর্যের উত্তরায়ণ আরম্ভ হয়, প্রকৃতপক্ষে ইহা পৃথিবীর বহু আদিম ও সভ্য জাতির সূর্যোৎসবের (sun festivel) অন্যতম সময়।"[৪১]

সুতরাং এই সমস্ত ব্রতগুলির মধ্যে কৃষিনির্ভর সমাজ-জীবনের বিভিন্ন চাওয়া-পাওয়ার মধ্যে মুখ্যত উর্বরাতন্ত্রের ধ্যান-ধারণাই প্রতিফলিত। বাংলা কৃষি-সংস্কৃতির সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন ব্রতগুলিতে মন্ত্র হিসেবে যে ছড়াগুলি উচ্চারিত হয়, তাতে মানুষের ঐহিক কামনাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে; সেইসঙ্গে বাংলা লোকসাহিত্যের কিছু ছড়া-গানের উৎস ও উপাদান হিসেবেও ব্রতগুলি স্বচ্ছন্দে চিহ্নিত হতে পারে।

কৃষি সংক্রান্ত বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে উর্বরাতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত স্পষ্ট। যেমন হুদুম দেয়া, পুতুলবিয়া, বদনাবিয়া, হলপ্রবাহ, তুষছিটানো ইত্যাদি বহু অনুষ্ঠান বা যাদু আচারগুলি তার প্রমাণ। হুদুম দেয়া অনুষ্ঠানে মেঘ দেবতাকে প্রসন্ন করার জন্য রাত্রে কৃষক রমণীরা নগ্ন হয়ে ক্ষেতের উপর দিয়ে হেঁটে বেড়ায়, নৃত্য করে, মেঘদেবতাকে নিজ শরীর উপচার হিসেবে প্রদান করার অঙ্গ ভঙ্গী করে, অশ্লীল গান ও ছড়া কাটে। বিবাহ বিষয়টি বৈধ প্রজননক্রিয়ার নামান্তর। তাই বৃষ্টি কামনায় ব্যাঙ বা পুতুলের বিয়ে দেওয়া হয় যা বৃষ্টি ও ক্ষেত্রের বা আকাশ ও পৃথিবীর বিবাহ-দান ও প্রজননের আহ্বান সূচক তাৎপর্য বহন করে। উত্তরবঙ্গের হুদুমার অনুষ্ঠান সম্পর্কে ড. ভৌমিক জানিয়েছেন: হুদুমার অনুষ্ঠানে কোথাও কোথাও লাঙল ও জোয়ালের বিবাহ দেওয়া হয়। লাঙল হ'ল হুদুমা আর হুদুমানী হ'ল জোয়াল। "হুদুমা হুদুমানীর প্রাক্-বিবাহ এবং বিবাহোত্তর দাম্পত্য ও গার্হস্থ্য জীবন, কৃষকের জীবনের আশা-আনন্দ প্রভৃতি লৌকিক মানুষের সংসারের মতো করিয়া গানে চিত্রিত হইয়া থাকে।" ধূপগুড়িতে হুদুমার অনুষ্ঠানে মেয়েরা কয়েকরাত্রি পরপর নগ্ন হয়ে বাড়ি বাড়ি গান গায়। শেষ দিনে পুজো হয়; রাত্রিতে বা দিনের বেলায় কোনো নির্জন স্থানে "কোনো কুমারী মেয়ের যোনীর উপর কাদা লেপিয়া তাহাতে কয়েকটি ধান রোপন করিয়া দেওয়া হয় এবং সেই যোনীকে বিবিধ উপচারে পূজা নিবেদন করা হয়। বৃষ্টি নামাইবার উদ্দেশ্যে কুমারী মেয়ের যোনী-পূজার প্রথা বাঁকুড়া জেলার ডাম্না গ্রামেও লক্ষ্য করা

যায়।"

"বেরুবাড়ী অঞ্চলে একটি কুলার উপর দুইটি ব্যাঙ স্থাপন করিয়া তাহাদের বিবাহ দেওয়া হয়; কল্পনা করা হয়, উহার একটি হুদুম, অপরটি হুদুমা।"[৪২] — এই যোনীপূজা, তাতে ধান্য রোপন অনিবার্যতই সিন্ধু সভ্যতা থেকে প্রাপ্ত সীলমোহরটির কথা মনে করিয়ে দেয়, যার একদিকে নারীর স্ত্রীঅঙ্গ দিয়ে উদ্‌গত উদ্ভিদের চিত্র খোদিত আছে, অন্যদিকে এক নারীকে ক্ষেত্রে বলি দেওয়া হচ্ছে। আবার এখানে লাঙল বা ব্যাঙের বিবাহ (ব্যাঙ উর্বরতা দ্যোতক প্রাণী) দেবার মূলেও ঐ বিবাহ অর্থাৎ প্রজননের ধারণাটিই প্রকটিত। 'বদনাবিয়া'তে একটি নগ্না বালিকা মাথায় কুলো নিয়ে মাগন করতে বেরোয়। এর সঙ্গে থাকে ছড়া। যেমন বদনা বিয়ার ছড়া :

'দেয়ারে তুমি অঝোরে অঝোরে নামো।
দেয়ারে তুমি নিষালে নিষালে নামো।
ঘরের নাঙ্গল ঘরে রইল হাইলা চাষা রইদি মইল,
দেওয়ারে তুমি অরিশাল বদনে ঢলিয়া পড়।'

এখানেও নগ্না বালিকা বস্তুত উর্বরতার প্রতীক।

'হলপ্রবাহ' বছরের প্রথম হল কর্ষণের অনুষ্ঠান, বলা বাহুল্য জমিকে ফলবতী ও উর্বরা করার কাজ এর দ্বারাই সাধিত হয়। তুষ ছিটানো, তুষ তুষুলী ব্রত, যেখানে তুষ উপচার দ্বারা, দূর্বা ব্যবহারের দ্বারা লৌকিক তোষলা বা লক্ষ্মীদেবীর কৃপা যাজ্ঞা করা হয়। নাড়ুতে দূর্বা গোঁজার বিষয়টি নিঃসন্দেহে উর্বরাতন্ত্রের স্পষ্ট এক ক্রিয়াচার।

ব্রত : প্রাগুক্ত ব্রত সংক্রান্ত আলোচনায় আমরা দেখেছি যে (যাদু অধ্যায় দ্রষ্টব্য) ব্রত আসলে একপ্রকার অনুকৃতিমূলক ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়াচার। এই অধ্যায়ে আলোচিত কৃষি সংক্রান্ত ব্রতগুলিতে উর্বরাতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি নির্দেশিত হয়েছে। প্রত্যক্ষভাবে কৃষি সম্পর্কিত নয় এমন ব্রতগুলিতেও উর্বরাতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি মুখ্য স্থান অধিকার ক'রে আছে; কারণ সাধারণভাবে সমস্ত ব্রতই আসলে শস্য সন্তান ও পূর্ণ জীবন কামনার প্রতিচ্ছবি। সুখে নিরুপদ্রব জীবন যাপনের জন্য তাই হরিষমঙ্গলবার ব্রত, অরণ্যষষ্ঠীর ব্রত, শীতলষষ্ঠী ব্রত, পারলৌকিক সুখের জন্য রামনবমীব্রত, কুলে যাতে কলঙ্ক না পড়ে তার জন্য কুলুই মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত, যমপুকুর ব্রত, রূপহলুদ ব্রত, নিৎসিঁদুর ব্রত— ইত্যাদি ব্রতগুলি রমণীরা পালন করেন যেখানে আলপনায়, উপচার ব্যবহারে উর্বরাতন্ত্রের প্রতীকগুলিই স্পষ্ট। যেমন আলপনায় বসুধারা, পুতুল, শিবলিঙ্গ, মাছ, ধান, সাপ, পদ্ম সূর্যবৃত্ত ইত্যাদি অঙ্কন, উপচারে ধান কড়ি, দূর্বা, সিঁদুর, কলা, পান, সুপারি— ইত্যাদির ব্যবহার আবশ্যকীয়।

দেবদেবী : সূর্য, শিব, দুর্গা, মনসা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, শীতলা, ষষ্ঠী, কার্তিক, কালিকা— প্রভৃতি দেবদেবীর উৎস উর্বরতাভিত্তিক চেতনা থেকে তা পূর্বেই

উল্লিখিত হয়েছে। এইসব অনার্য, ব্রাত্য, অস্মার্ত ও অপৌরাণিক দেবদেবীর আর্যীভবন হওয়ার ফলে ('ধর্ম' অধ্যায় দ্রষ্টব্য) ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কারে পরিপ্লুত হওয়ার পরে আজও পূজা-পদ্ধতি, উপচার ব্যবহার ইত্যাদির মধ্যে ঐ উর্বরাতান্ত্রিক কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য প্রকটভাবেই বিদ্যমান। যেমন শিব ও লিঙ্গ উপাসনা সমার্থক, দুর্গা পুজোর নবপত্রিকা, লক্ষ্মী-সরস্বতী পুজোয় পঞ্চশস্য, দধি ইত্যাদির অনিবার্য উপস্থিতি; মনসা দুর্গা ও বেশিরভাগ দেবীর 'শাকম্ভরী' অভিধা, ধান দূর্বা, সিঁদুর, কলা ইত্যাদি দ্রব্যগুলির ব্যবহার, কালীর নগ্ন রূপ, ঘট, ডাব, কুমারীপুজো— এই সবকিছুই ঐ শস্য-কৃষি সম্পৃক্ত ও উর্বরতা-দ্যোতক সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

বিবাহ: প্রজনন বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য। বাঙালীর বিবাহ অনুষ্ঠানের প্রতি পদক্ষেপে তাই উর্বরাতান্ত্রিক অনুষ্ঠান। মাঙ্গলিক দ্রব্য হিসেবে ব্যবহৃত বস্তুসমূহ যার বেশিরভাগই আসলে উর্বরতা-দ্যোতক বস্তু, সেগুলির ব্যবহারও সর্বক্ষেত্রে। যেমন ধান-দূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ, বরণডালায় ধান, দূর্বা, প্রদীপ, কড়ি, কলা, পান-সুপারি, আংটি ইত্যাদির ব্যবহার, গ্রন্থি বন্ধনে কড়ি, পাঁচফল, হলুদ রাখা— ইত্যাদি। বিবাহের পর কন্যার কোলে শিশু বা পুতুল বসানো, গাত্র হরিদ্রার উপকরণ, একজোড়া তেলসিঁদুর হলুদ মাখানো মাছ, (তার মুখে সুপুরি ও পয়সাও রাখা হয়), বসুধারা চিহ্ন অঙ্কন সর্বত্রই উর্বরতাসূচক চিহ্নের উপস্থিতি। শুধু তাই নয়, হিন্দু বিবাহের অনুষ্ঠানে বিধবা ও বন্ধ্যা নারীর প্রবেশ নিষেধ, কারণ বিবাহের মূল লক্ষ্য প্রজনন। বিধবা ও বন্ধ্যা নারীর সে অধিকার বা ক্ষমতা নেই। তাই কর্তৃত্ব এয়োস্ত্রীর। আবার স্ত্রী আচারই এখানে মুখ্য। এই অনুষ্ঠানে এয়োস্ত্রীর সংস্পর্শলাভ নবদম্পতিকে উর্বর করে তুলবে,— এমন সদর্থক বিশ্বাসই প্রবলভাবে ক্রিয়াশীল থাকে। বিবাহে উর্বরতা সূচক 'পানখিলি'র অনুষ্ঠানে "পানখিলি স্ত্রী জননাঙ্গের প্রতীক, কাঠি পুংলিঙ্গের এবং খিলির মধ্যে দেয় সিন্দুর হলো রজোরক্তের প্রতীক।"[৪৩]

বস্তুত বাঙালীর বিবাহ অনুষ্ঠানে শাস্ত্রীয় মন্ত্র-তন্ত্রের ভূমিকা থাকলেও স্ত্রী আচারই এখানে মুখ্য এবং সমগ্র অনুষ্ঠানের অধিকাংশ স্থানই উর্বরাতন্ত্রের দখলে— যেহেতু লোকসমাজে বিবাহের অর্থ হ'ল সন্তান উৎপাদন।

লোকক্রীড়া: বহু ক্রীড়ার মধ্যেও উর্বরাতন্ত্রের প্রতীকী প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। যেমন ডাংগুলি, গুলি খেলা, পাশা খেলা, পুতুল খেলা, কড়ি খেলা, আংটি খেলা ইত্যাদি।

নব্য প্রস্তর যুগে সৃষ্ট প্রাচীন কৃষিকার্যের জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রটি হল ডিগিংস্টিক বা খননদণ্ড। একটি এক ফুট দীর্ঘ গাছের ডালের একটি দিক সূঁচালো ক'রে, কখনো বা আগুনে সামান্য পুড়িয়ে শক্ত ক'রে নেওয়া হত। লৌহযুগে সূচালো প্রান্তে লৌহঠুলি লাগিয়ে নেওয়া হত। এই সবল খনন যন্ত্রটিই ডাংগুলি খেলার ডাং বলে অনেকের ধারণা। তাঁদের মতে এই খেলায় গুলিটি হল খুঁড়ে তোলা কন্দ।[৪৪] এমনকি অতি প্রচলিত মারবেল খেলা যা কিনা তিন-চার হাজার বছর আগেও একটু

অন্য ভঙ্গীতে প্রচলিত ছিল, তাও আসলে মাটিতে বা নারী অঙ্গে বীজ বপনের অনুকৃতি।[৪৫] পাশা এরই বিবর্তিত রূপ। গুলি খেলার সময় বিজয়ী খেলোয়াড়গণ যে ছড়া আবৃত্তি করে, সেখানে আকস্মিকভাবে পাকাদেখা, বিবাহ, সন্তানের জন্ম ইত্যাদি বিষগুলি এসে পড়ে যা আসলে এই খেলার উর্বরাতান্ত্রিক ভাবনারই অনুষঙ্গ :

একে ইন্দুর / দুইয়ে দাঁত,
তিনে তেলি / চারে চোর,
পাঁচে পেঁচা / ছয়ে ছুঁচো,
সাতে শালিক / আটে দাদার পা চাটে,
ন'য়ে নাপিত / দশে ধোপা,
এগারোয় এঁড়ে বাছুর / বারোয় বকনা বাছুর,
তেরয় তেন্দর / চৌদ্দয় চাদর,
পনেরয় সম্বন্ধ / ষোলয় পাকা দেখা,
সতেরয় আশীর্বাদ / আঠারোয় বিয়ে,
উনিশে বৌভাত / বিশে এক ছেলের বাপ,
একুশে ছেলের মুখে ভাত । বাইশে এক ছেলে এক মেয়ের বাপ,
তেইশে মেয়ের মুখে ভাত ... ইত্যাদি।[৪৬]

পুতুলের খেলার মধ্যেও অনুরূপ প্রতিচ্ছবি। আগেই আমরা পুতুল ও ভেনাস ফিগারাইন্‌স্-এর সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। বাংলাদেশের মাতৃত্ব লক্ষণযুক্ত পুতুলেরই সুলভ ব্যবহার। এবং ছেলে কোলে পুতুলের চলও যথেষ্ট। আগে পুতুলের বিয়ে দেওয়া ধনীদের এক আমোদ ছিল। গ্রাম্য বালক-বালিকাদের মধ্যেও পুতুলের বিবাহ দানের ঝোঁক যথেষ্ট বেশি তা লক্ষ্য করলেই দেখা যায়। তাই পুতুলের বিবাহকে কেন্দ্র করে বহু লৌকিক ছড়ার সৃষ্টি হয়েছে। যেমন :

লাউ মাচার তলে লো জোড়া পুতুলের বিয়া।
বাজনা বাজায় ঝুমুর ঝুমুর দেখে আসি গিয়া।
আম-কাঁঠালের পিঁড়িখানি ঝিমিক ঝিমিক করে,
তারি মধ্যে বাপে খুড়ায় কন্যা দান করে[৪৭]।" —ঢাকা

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায় কৃষি ও সন্তান উৎপাদন কীভাবে লোকমানসে সমীকৃত হয়ে একটি বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম দিয়েছে! মানুষের পর্যবেক্ষণ ও কল্পনা, তার বিশ্বাস ও আস্থা যুগ যুগ ধ'রে ধীরে ধীরে এই উর্বরাতন্ত্র ও তার বিচিত্র আচার আচরণকে সৃষ্টি করেছে। যেহেতু ফসল ও সন্তান উৎপাদন প্রক্রিয়া বস্তুত সার্বজনিক প্রক্রিয়া-— সর্বত্রই তা একইভাবে হয়, তাই পৃথিবীর সর্বত্রই কৃষিজীবী আদিম (primitive) মানুষের চিন্তাভাবনা একই খাতে প্রবহমান হ'তে পেরেছিল। ক্রমে পরবর্তীকালে লোকসমাজ- জীবনের সমস্ত বৃহত্তর ক্ষেত্রে এই চিন্তাকে বিকশিত ও প্রয়োগ করতেও পেরেছিল। লোকসমাজের সৃষ্ট সেইসব প্রয়োগ, তার নিয়মকানুন

বা আচার আচরণ ক্রমে লৌকিক সংস্কার ও সংস্কৃতির রূপলাভ করেছে; শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে প্রবহমান এই সব সংস্কার পরবর্তী প্রজন্ম জেনে বা না জেনে মেনে চলেছে, ব্যবহার করেছে;— কখনো আবার তার বিবর্তনও ঘটেছে;— কোথাও বিভিন্ন চিন্তা-ভাবনা ও অন্যান্য সংস্কার-এর দ্বারা পরিশীলিত ও জটিল হয়ে উঠেছে। তবু উর্বরাতন্ত্রের রীতি-নীতি ও লক্ষণগুলি এতটাই একমুখী যে বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও লৌকিক আচার-আচরণের মধ্যে তাকে খুঁজে পেতে কষ্ট হয় না।

বাংলার বিভিন্ন লৌকিক সংস্কারে,— জন্ম, বিবাহ, কৃষিকার্য, খেলাধুলো, পুজো-পার্বণ সর্বত্রই এই উর্বরাতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণাকে উপজীব্য ক'রে বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান পালিত হয়ে চলেছে। আবার সেই সমস্ত অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র ক'রেই গড়ে উঠেছে বাংলা লোকসাহিত্যের এক বিপুল ভাণ্ডার। প্রাগুক্ত বিভিন্ন ব্রতের গান-কথা-ছড়া, বিবাহের পানখিলি ও আরো বিভিন্ন অনুষ্ঠানের গান, খেলার ছড়া, বৃষ্টি আবাহন মূলক গান-ছড়া, গাছ-ব্যাঙ ইত্যাদির বিবাহ দেবার সময় গীত লোকসঙ্গীত বা ছড়া, বিভিন্ন লৌকিক দেব-দেবীর পূজানুষ্ঠানে আচরণীয় উর্বরাতান্ত্রিক বিধিকে উপজীব্য ক'রে রচিত গান, কথা ও মন্ত্রধর্মী ছড়া, হল প্রবাহ ও এই জাতীয় অনুষ্ঠানে অপরিহার্য ছড়া-গান— এমন সর্বত্রই উর্বরাতন্ত্রের এক মুখ্য ভূমিকা আছে। তাই উর্বরাতন্ত্র বাংলা লোকসাহিত্যেরও অন্যতম উৎস নিসন্দেহে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

লোকসাহিত্য : অরণ্য ও নদী

অরণ্য ও নদীর সঙ্গে মানবসভ্যতা ও সংস্কৃতির যে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক তা বলার অপেক্ষা রাখে না। মানুষের জীবন চর্যার বিভিন্নতা, স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য মূলত সেই অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতির উপরেই নির্ভরশীল। ভারতবর্ষের ভূ-প্রকৃতির বিভিন্নতা ও বিচিত্রতা নিঃসন্দেহে ভারতের মিশ্র সংস্কৃতি ও সভ্যতা কৃষ্টির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ। তথাপি একথাও অনস্বীকার্য নয়, এই মিশ্র সংস্কৃতি ও কৃষ্টির মধ্যে আছে এক অন্তর্নিহিত ঐক্য, —যা সামগ্রিকভাবে ভারতীয় সভ্যতাকে আরণ্যক সভ্যতা এবং নদী-মাতৃক সভ্যতা বলে চিহ্নিত করেছে। সুতরাং নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতবর্ষ হল নদী ও অরণ্যের দেশ, তার অন্তর্নিহিত ঐক্য ও বিচিত্রতার উৎস, মূলত ঐ নদী ও অরণ্যবহুল ভৌগোলিক বাতাবরণ। আর্য-পূর্ব ভারতবাসীও নদী বা অরণ্যের সঙ্গে জীবনকে বিবিক্ত ক'রে দেখেনি। সুতরাং তাদের যাবতীয় আচার-অনুষ্ঠান, বিশ্বাস-সংস্কার ও ধ্যান ধারণায় নদী ও অরণ্য প্রকৃতির অনিবার্য ও তীব্র উপস্থিতি স্বাভাবিক। পরবর্তীকালে আর্য-আগমনই নয়, অন্যান্য বহিরাগত মানুষের আগমনও এই সুপ্রাচীন সভ্যতাকে পর্যুদস্ত করতে পারেনি। সাংস্কৃতিক বিমিশ্রণ (cultural diffusion) যতই ঘটুক না কেন, মূল আরণ্যক ও নদীমাতৃক ভারতের ঐতিহ্যের কিছু রূপান্তর ঘটেছে, কিন্তু বিন্দুমাত্র বিপরীত চরিত্রমুখী হয়নি। ভারতবর্ষের ইতিহাস, শিল্প সাহিত্য তার সাক্ষ্য।

বাংলাদেশে (পূর্ব ও পশ্চিম বাংলা) নদী ও অরণ্যের সমধিক উপস্থিতি। একই সঙ্গে নদী ও অরণ্য উদ্ভিজ্জের এত প্রাচুর্য ও ঘনিষ্ঠ সহাবস্থান সর্বত্র সুলভ নয়। তার উপর বঙ্গদেশের বেশিরভাগই পলিগঠিত উর্বর সমতলভূমি। সুতরাং সংগত কারণেই বঙ্গভূমি ছিল 'সোনার বাংলা'। এখানকার অধিবাসীদের শ্লথ, মসৃণ ও অনায়াস জীবন-যাপন তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে নির্ধারণ করেছে,— নির্ধারণ করেছে তার কৃষ্টি ও সভ্যতার গতিপ্রকৃতিকে।

বাংলার এই বিশিষ্ট ভূ-প্রকৃতি ও জীবনধারা বাংলা লোকসাহিত্যের চরিত্র গঠনে স্বভাবতই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। বরং বলা ভালো, এই বিশিষ্ট প্রকৃতি ও জীবনাচরণই বাংলা লোকসাহিত্যের চরিত্রকে তৈরি করেছে। বাংলার লোকসাহিত্যে একদিকে যেমন সহজভাবে উঠে এসেছে এদেশের নিজস্ব গাছ-পালা, ফল-ফুল, নদ-নদী —অর্থাৎ প্রাকৃতিক পটভূমিকাটি, অন্যদিকে তেমন পরিস্ফুটিত হয়েছে এদেশের মানুষের স্বকীয় ক্রিয়ানুষ্ঠান, আচার-আচরণ, বিশ্বাস সংস্কারের ছবি। বিষয়টিকে আমরা মোটামুটি তিনটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার ক'রতে পারি :

১। প্রত্যক্ষভাবে নদী বা অরণ্য-উদ্ভিজ্জের উপস্থিতি।

২। নদীমাতৃক সংস্কৃতির প্রতিফলন।

৩। অরণ্য-উদ্ভিজ্জের উপর নির্ভরশীল মানুষের সংস্কৃতির প্রতিফলন।

প্রত্যক্ষভাবে নদীর উপস্থিতি :

নদী বা অরণ্য উদ্ভিজ্জ-প্রধান অঞ্চলে মানব সংস্কৃতির যাবতীয় দিক সেই ভূ-প্রকৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়। নদী এবং অরণ্য উদ্ভিজ্জের প্রাধান্য বঙ্গদেশের লোকসমাজের রীতি-নীতি, আচার-আচরণ, ধর্ম-সংস্কার-বিশ্বাস, শিল্প-সাহিত্য, খাদ্য, পোশাক —সবকিছুকেই কমবেশী নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবিত করেছে। এই প্রভাব লোকসাহিত্যের কোথায় কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, সেই আলোচনায় প্রবেশ করা যেতে পারে। তবে তা কখনো প্রত্যক্ষভাবে কখনো পরোক্ষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। যেমন ধরা যাক, নদীকেন্দ্রিক ধাঁধার প্রসঙ্গ। এই বিষয়টি তিনটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা যেতে পারে। প্রথমত, প্রত্যক্ষভাবে নদীর উল্লেখ আছে, অথবা নদীকে নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে এমন কিছু ধাঁধা। দ্বিতীয়ত, নদী নয়, অন্যান্য বিষয় নিয়ে, যেমন ফুল, পাতা ইত্যাদি নিয়ে —রচিত ধাঁধায় নদী বা নদীর অনুষঙ্গ এবং তৃতীয়ত, নদীর সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত বিষয় বা বস্তুসমূহ, যেমন— মাছ, নৌকা —ইত্যাদি নিয়ে স্বতন্ত্র ধাঁধার অস্তিত্ব।

কিন্তু মনে রাখা দরকার, নদীকেন্দ্রিক যে বিভিন্ন পুজো-পার্বণ, ক্রিয়াচার বা বিশ্বাস-সংস্কার তার উল্লেখও লোকসাহিত্যের এই উদাহরণে, অর্থাৎ ধাঁধার মধ্যে থাকতে পারে বা সেই সব বিষয়কে কেন্দ্র ক'রেও ধাঁধা সৃষ্টি হয়ে থাকে। সুতরাং এই বিষয়টিও এখানে আলোচিত হওয়া সঙ্গত। কিন্তু আমরা এই শেষোক্ত বিষয়টির আলোচনা এই প্রসঙ্গে করব না যেহেতু অন্যান্য অধ্যায়গুলিতে বাংলার লোকধর্ম, লোকাচার-লোকবিশ্বাস ইত্যাদি বিষয়কে কেন্দ্র ক'রে বিস্তৃত এবং স্বতন্ত্র আলোচনা করা হয়েছে।

ধাঁধা :

লোকসাহিত্যের যাবতীয় আঙ্গিকের মধ্যে একমাত্র ধাঁধায় মানুষের বৈদগ্ধ্যের প্রভাব বেশি। এখানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বুদ্ধির সঙ্গে কৌতুকের, কাব্যগুণের সঙ্গে কৌতূহলের ও ব্যবহারিক দৃষ্টির সঙ্গে কল্পনার মেলবন্ধন ঘটেছে। বস্তুতপক্ষে ধাঁধা লোকসাহিত্যের এমন এক উপাদান এবং শিল্পরূপ, যেখান থেকে লোকসাহিত্য শিষ্ট সাহিত্যের আঙিনায় পা বাড়ানোর প্রেরণা পায়। সুতরাং সেই দিক থেকে ধাঁধাকে লোকসাহিত্যের পরিণত অভিব্যক্তি বললে অত্যুক্তি হবে না। অবশ্য লৌকিক ধাঁধার শিষ্টতা ও সারল্য অবশ্যই বিভিন্ন লোকসমাজের বা লোকগোষ্ঠীর মধ্যে একই প্রকার নয়। তবে তা যেমনই হোক না কেন, স্বতন্ত্র ভৌগোলিক বাতাবরণ, স্বকীয় কৃষ্টি-ঐতিহ্যের প্রভাব লোকসাহিত্যের বিভিন্ন প্রকরণের মধ্যে 'ধাঁধা'য় সম্ভবত বেশি প্রতিফলিত হয়েছে। তাই এই আলোচনায় ধাঁধার দৃষ্টান্তগুলিই প্রথমে উপস্থিত করা গেল।

নদী শুধু বাংলার ভৌগোলিক নয়, সামাজিক চরিত্র গঠনের ক্ষেত্রেও সর্বপ্রধান উপাদান হিসেবে পরিগণিত হতে পারে। লক্ষণীয় জীবনের সঙ্গে নদীর সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। সেই দৃষ্টান্ত বাংলা ধাঁধায় লক্ষ্য করার মত। যেমন —

'দুই বর্ণে নাম তার, জল জীবজন্তু করে পান'[১] (উত্তর : নদী)

জলই জীবন। নদী মানেই বেঁচে থাকা —তৃষ্ণা নিবারণ। এই ধাঁধায় নদীর জল পান-ই মুখ্য হয়ে উঠেছে।

আবার এই নদী বাংলাদেশে কখনো কখনো ভয়ঙ্কর রূপ নেয়। মানুষের সর্বনাশ করে,— মানুষকে নিঃস্ব ক'রে তোলে। বিভিন্ন নদীতে প্রায় প্রতি বছরই বন্যা দেখা দেয়। মানুষের এই অভিজ্ঞতাও ধাঁধার মধ্যে প্রতিফলিত—

'পাহাড়ে জন্ম আমার সাগরে আমার আশ'
চলার পথে মানুষের করি সর্বনাশ।'

বন্যাই নয়, বঙ্গদেশ সমভূমি হওয়ায় এবং মূলত পলি গঠিত অঞ্চলই তুলনামূলকভাবে বেশি হওয়ায়, নদী প্রায়শই ভৌগোলিক নিয়মে গতিপথ পরিবর্তন করে। যার অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতি — মানুষের স্থাবর সম্পত্তির বিনাশ। প্রাগুক্ত ধাঁধাটিতে সেই ইঙ্গিতও বিদ্যমান।

নদীমাতৃক বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রসঙ্গে নদীর উল্লেখ স্বাভাবিক। বাংলার সাহিত্য-শিল্পে নদীর উল্লেখ ও নদীকে প্রতীক হিসেবে বিভিন্নক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হয়েছে। আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে চর্যাগানেও তা লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং নদী সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে যেমন বহু ধাঁধা রচিত হয়েছে তেমনি বহু ধাঁধায় কেবল নদীর উল্লেখ আছে। নিম্নে বিবাহবাসরে প্রশ্নোত্তর মূলক একটি ধাঁধা দৃষ্টান্ত হিসেবে দেওয়া গেল—

প্রশ্ন : কয় হাতের কেশ তোমার কয় হাতের নাড়ী
কোন জননী ছিলেন শিওরী।
কোন নদী ভজে হলি পার
কয়রতি ক মাসা জননী তোমার।

উত্তর : চোদ্দ হাতের কেশ আমার বত্রিশ হাতের নাড়ী
উদরে জননী ছিলেন উত্তর শিওরী।
ভবসিন্ধু নদী ভজে হইলাম পার
ছয়রতি নয় মাসা জননী আমার। (উত্তর : নদী)

গঙ্গা শুধু বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের কাছেই নয়, বাংলার বৃহৎ মানবগোষ্ঠীর কাছে পবিত্র নদী ব'লে স্বীকৃত। বাংলাদেশ এই গঙ্গা নদীরই দান। গঙ্গার পলি জমেই গড়ে উঠেছে নিম্ন গাঙ্গেয় সমভূমি। তাই অনেক সময়েই বাংলাদেশে নদী মানেই গঙ্গা-পদ্মা-ভাগীরথী। শ্রীহট্ট থেকে সংগৃহীত নিম্নলিখিত ধাঁধাটি লক্ষ্য করার মত :

'গঙ্গাপারের বুড়ীগুলি নব ধান কুটে

কাঁকলিত পাড়া দিলে কেকাত্ করি উঠে।' (উত্তর : ঢেঁকি)

নদী অববাহিকার সঙ্গে কৃষিকার্যের সম্পর্ক কতটা তা আলোচনা অনাবশ্যক। কিন্তু স্মর্তব্য, বাংলার প্রধান শস্য ধান এবং তা নদীতীরবর্তী অঞ্চলেই সর্বাপেক্ষা বেশি উৎপন্ন হয়। তাই শ্রীহট্টের এই 'গঙ্গাপারের বুড়ীগুলি' আসলে 'নদীপারের বুড়ীগুলি।'

আবার মাছ ধরার জাল নিয়ে রচিত ধাঁধায় একইভাবে গঙ্গার উল্লেখ:

'সাতশো গঙ্গায় ডুব মারে
অগ্নি খেয়ে জাড়ে
আমগালে ঘর ভিতরা বসলি
পিড়া নিয়ে গেল চোরে।'

গঙ্গা জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের অতি নিকটবর্তী হলেও হিন্দুদের কাছে ধর্মীয় দিক থেকে তার আবার আর এক মাহাত্ম্য! হিন্দুর ধর্মীয় ক্রিয়াচারে গঙ্গা বা গঙ্গা জলের ভূমিকা অচ্ছেদ্য। হিন্দুমতে গঙ্গাজলের স্পর্শে পাপ দূরীভূত হয়, গঙ্গাস্নানে হয় মোক্ষলাভ:

'কোন নারী দরশনে পুণ্য হয় অতি,
আলিঙ্গনে মোক্ষ লাভ শাস্ত্রের ভারতী।
চুম্বন করিলে হয় পবিত্র জীবন,
হেন কোন নারী আছে জগতে এমন।'

প্রত্যক্ষভাবে নদীর উল্লেখ মাছধরার জাল, নৌকা—ইত্যাদি নিয়ে সৃষ্ট ধাঁধায় স্বভাবতই এসে পড়ে। যেমন জাল নিয়ে:

'ধাঁধারে ধাঁধা
সাত নদী বাঁধা,
উড়ে গেল পাখ
লেজটা রইল বাঁধা।

নৌকাকে উপজীব্য করে রচিত ধাঁধা—

'কালোগাই হাংরায়
সাতনদী সাঁতরায়।'

আরো বিচিত্রভাবে নদীর উল্লেখ বাংলা ধাঁধায় বিশেষ কৌতূহল উদ্রেক করে। যেমন নারকেল নিয়ে রচিত একটি প্রশ্নোত্তর মূলক ধাঁধা—

'যোগী নহে জটা ধরে তোমার লক্ষণ।
গঙ্গা নহে জল বহে এ তিন লোচন।।
নারি সম্বোধন মান নহে স্ত্রীজাতি।
শস্য উপজে তাহে নহে সেই ক্ষিতি।।
হর, বুঝ প্রহেলিকা, হর, বুঝ প্রহেলিকা।
জিজ্ঞাসে তোমারে একপটলা বালিকা।।

উত্তর : 'শুন একপটলা তোমার এ প্রহেলিকা।

নাম কহিয়া দিলে দিবে কুমুদ-কলিকা।
যেই অস্ত্র করে ধরে রেবতীর কান্ত।
তৃতীয় অক্ষরে তার কর ই-কারান্ত।
সেই তো বৃক্ষের ফল শুন গো সুন্দরী।'

এই ভাবে নদীমাতৃক বাংলাদেশে মানুষের কথা-বার্তায়, উপমা অলঙ্কারে অনিবার্যভাবেই নদী উপস্থিত হয়। যেমন—

'একটা বুড়ি রোজ সকাল থেকে
নদীতে বসে।' (নৌকা)

পৌরাণিক চরিত্র শান্তনুর প্রসঙ্গে—

'সমুদ্রে জল নাই ছাঁচা করলে ঢেউ,
গঙ্গা ব্যাটা নহি জনম ষোল বছরের বউ।'

ময়ূরের ধাঁধায় নদী প্রত্যক্ষভাবে আছে—

'নদী সেপসুরত আইলা বানে
তার পাছায় খড় পণে।'

ছায়া কেন্দ্রিক ধাঁধায় নদীর অনুষঙ্গ:

'নদীতে তো জল নাই লতা কেন ভাসে
যার সঙ্গে ভাব নাই সে কেন হাসে।' ইত্যাদি।

লোকসঙ্গীত :

লোকসঙ্গীতের মধ্যে লোকগোষ্ঠীর সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনার প্রত্যক্ষ ও সহজ প্রকাশ। আবহমান কাল ধ'রে মানুষের হৃদয়-আর্তি লোকসঙ্গীতের সুর ও বাণীর পথ ধ'রে মুক্তি লাভ করতে চেয়েছে। ফলে জীবনের সঙ্গে লোকসঙ্গীতের প্রত্যক্ষ ও অকৃত্রিম সম্পর্ক, লোকসঙ্গীতের প্রতিটি পংক্তিতে তাই মানব হৃদয়ের উষ্ণতা। মাটির সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ায় লোকসঙ্গীতের মধ্যে তাই সহজেই লোকজীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিচিত্র সংস্কৃতিকে প্রত্যক্ষ করা যায়। কিন্তু এখন আমরা লোকসঙ্গীতের কতিপয় দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়ে উপর্যুক্ত বিষয়টি অন্বেষণ করার চেষ্টা করব,— অর্থাৎ দেখব কত সহজভাবে এখানেও নদী-গঙ্গা-গাঙের প্রসঙ্গ আসে।

কৌতুক রসই উপজীব্য—এমন একটি 'আলকাপ' জাতীয় লৌকিক পাঁচালীতে দরিদ্র স্বামী তার স্ত্রীকে বলছে যে নবদ্বীপে গিয়ে তারা গোঁসাই ও বৈষ্ণবী সেজে বসবে, তাতে উদরপূর্তির সুবিধে এবং সম্মান দু'টিই সহজলভ্য হবে। তখন স্ত্রীর বিদ্রূপে গঙ্গার কি সহজ প্রয়োগ—

'বাতুল হয়ে গেলি গঙ্গাভরা ধুকো,
কেমনে টানি ওরে আখড়ায় বাসি হুঁকো,
ওরে উল্টো চোখে কুপ্পলাতে থেকো

তোর মতের মুখে পড়ুক, ওরে, ছাই।।'[২]

পাটকাটার গানেও প্রত্যক্ষভাবে নদী ও বন্যার উপস্থিতি,—

'পুবের থনে আইল বাতাস নদী অইল তল।
দ্যাশ পিরথিমি সাগর ভাইসা চরায় নামল জল।'

ভিন্ন ভিন্ন অর্থে বাংলার বিশিষ্ট স্থানীয় নদীর উল্লেখ পাতানাচের গানে—

'কোন নদী বহে নিরাধার
কোন নদী বহে হবকি, ভবকি, প্রিয়া, হায়রে।
কোন নদী বহে নিরাধার, তারা কোন বহে নিরাধার
সুবর্ণরেখা বহে নিরাধার
কাঁসাই নদী বহে হবকি ভবকি প্রিয়া, হায়রে,
তারা কোন বনে নিরাধার।'

নদীই কখনো কখনো শেষপর্যন্ত মানুষের চরম আশ্রয় হয়ে ওঠে—

'ঘর করি মীনার বাপের সঙ্গে
ঝাঁপ দিব গাঙ্গে...।'

বাংলাদেশ নদীমাতৃক ব'লে চর্যাগানের মত বাউল গানেও (আমাদের অলোচনায় কেবলমাত্র লৌকিক বাউল গানই অন্তর্ভুক্ত হতে পারে) নদী এবং তার বিবিধ অনুষঙ্গের সহজ ব্যবহার লক্ষ্য করা যায। যেমন---

'আমার মন-মীন সুখে কর খেলা ভবক্ষেত্রের জলে.....,
...তোর যত কিছু আছে পড়বে পিছলে
কাল ধীবরের জালে।'...

কিংবা

'...এই না দেহে নদী আছে, মাঝে মাঝে জাহাজ গেছে,
ছ'জনা তার মাঝি আছে, হাল ধরে কালসোনা।' বাউল

গঙ্গার প্রসঙ্গ—

'ওরে নিত্য গঙ্গায় স্নান করি, কূলে বসে ঐ রূপ হেরি,
ওর নদীর ধারে ধারে বুলি আমি, পাইনা ঘরের ঠিকানা...'

সাধারণভাবে গঙ্গার প্রসঙ্গ-বাউলগানে—

'একজনার মন অনলে, গঙ্গার জলে আক্ষর জ্বেলে আছে বসে।'

বা—

'তোমার গঙ্গার ধারে ঘর-কাঁপে থর থর—'

নিম্নোদ্ধৃত 'উল্টা বাউলে'র এই গানটিতে পরিচিত বন্যার কথা—

'বন্যা আইল ধান শুকাইল আগ্‌না ভাসিত স্রোতে,
গঙ্গা মৈল জল পিপাসায় ব্রহ্মা মৈল শীতে।।'

গঙ্গাজল বিভিন্ন পুণ্য অনুষ্ঠানে অপরিহার্য, কারণ তা হিন্দুর কাছে পবিত্র। বিবাহের একটি আনুষ্ঠানিক গানের অংশবিশেষ উদাহরণ হিসেবে উদ্ধারযোগ্য; গানটি অধিবাসের আগে গীত হয়—

'আকাশে উঠল তারা, অধিবাসের পড়ল সাড়া।
বল শুনি, ও রোহিণি, অধিবাসের আয়োজন।
ভরি ঘটে গঙ্গাজলে, সাজায়ে কদলী ফলে,
কর শীঘ্র অধিবাস. পুরইত রইছেন উপবাস।'

পুরুলিয়ার বিখ্যাত নদী কাঁসাই। অতএব এই অঞ্চলেব লোকসাহিত্যে এই নদীর কথা থাকবেই। কুইলাপাল থেকে সংগৃহীত একটি বিজয়া গান—

'আমাকে মা বিয়া দিলে কাঁসাই নদীর পারে,
এতগুলো পরব ছেড়ে রাখলে পরের ঘরে।'

কংসাবতী—

'কংসাবতীর নদীর বান্ধনে
ও আমায় যেতে হবে, রইল ভাই কোন বনে
কংসাবতী নদীর বান্ধনে...'[২]

বিবাহের গান (বাঁশপাহাড়ী)

প্রবাদ-প্রবচন :

নদী প্রবাদেরও বিষয় হয়ে ওঠে। নদীর চরিত্র, তার গতিপ্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য মানুষের বিপুল জীবন-অভিজ্ঞতার বহু বিষয়ের সঙ্গে অঙ্গীভূত হয়ে গেছে। তাই মানব জীবনের বিভিন্ন অসঙ্গতি বা ধ্যান-ধারণা অতি সহজেই নদীর উপমা-রূপকে প্রকাশ পেয়েছে।

যেমন :

নদীর একূল ভাঙে আর ও কূল গড়ে।
নদী, নারী, শৃঙ্গধারী,— এ তিনে না বিশ্বাস করি।
নদীকূলে বাস, ভাবনা বারো মাস।
নদী শুকালেও রেখা থাকে।
নদী থাকলেও চড়া পড়ে।
জাতের নারী কালাও ভাল,
নদীর পানি ঘোলাও ভাল।

আমাদের জীবনের সঙ্গে গঙ্গা ওতপ্রোত বলেই গঙ্গা পৃথকভাবে প্রবাদেরও

উপজীব্য বিষয়—

দুগ্ধ, শ্রম গঙ্গাধারী/এ তিন বড় উপকারী।
গঙ্গায় সারি গাইলে গঙ্গা হয় না তুষ্ট,
দুষ্টের গুণ গাইলে দুষ্ট হয় না শিষ্ট।
ভাগের মা গঙ্গা পায় না।
না রাম, না গঙ্গা।
মরণকালে গঙ্গা মুখে পা।[৩]

উপরের নদী সংক্রান্ত প্রবাদগুলি একটু অভিনিবেশসহ লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, নাদীমাতৃক বাংলাদেশে মানব জীবনের সঙ্গে নদী কতটা একাত্ম। নদীর উপর মানুষের সার্বিক নির্ভরশীলতার কথা প্রত্যক্ষভাবে এই প্রবাদগুলিতে আছে। তাই জন্যই নদীর কূল ভাঙার তাৎপর্য সে বোঝে,— বোঝে নদী কেমন ক'রে অগম্য নারীহৃদয়ের ব্যঞ্জনা হতে পারে। আবার 'জাতের নারী' প্রসঙ্গে নদীর ঘোলা জলের শ্রেষ্ঠত্ব তার যেমন অজানা নয়, তেমন অজানা নয় পার্থিব জীবন কি অনিশ্চিত ! তাই লোককবি নদীর পাশে থেকে নদী ও জীবনকে একইভাবে দেখে। লোকমানসের এই বৈদগ্ধ্য ও জীবনবোধ, তার প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ ও দার্শনিকতা শুধু লোকজীবনের নয়,— চিরন্তন মানব জীবনের বৈভব নিঃসন্দেহে। জীবনের অন্যান্য বিষয়ের মত নদীকেন্দ্রিক এই ভাবনাচিন্তা অনিবার্যভাবেই বাংলার এই বিশিষ্ট ভৌগোলিক প্রকৃতির দান।

নদীমাতৃক-সংস্কৃতির প্রতিফলন

বঙ্গ-সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রেই নদীর অখণ্ড প্রভাব। সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিছক নদীর উল্লেখ নয়, নদীর সামগ্রিক রূপটিই বেশি প্রভাব বিস্তার করেছে। নদীর জলস্রোত, তার বঙ্কিম চলন, তার দুকূলের তাৎপর্য, নদীর বেলাভূমিতে চরে বেড়ানো বক, এমনকি মকর-মৎস্য-নৌকা-জাল সবই মানুষের অভিজ্ঞতায় সঞ্চিত হয়ে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উপমা-রূপক হিসেবে স্বচ্ছন্দে ব্যবহৃত হয়েছে। কিছু দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা যেতে পারে—

ধাঁধা :

'যমুনার জল টলমল করে,
একটুকু কুটা পাইলে সর্বনাশ করে।' (উত্তর : চোখ)

গঙ্গার সঙ্গে যমুনা এবং সরস্বতীর উল্লেখ স্বভাবতই এসে পড়ে। বাউল তার গূঢ় তত্ত্বের কথায় অনায়াসে বলে : 'দশমী পঞ্চমী তিথি গঙ্গা যমুনা সরস্বতী হয়ে বেগবতী সহস্রধারে।' হিন্দু সংস্কৃতিতে এই ত্রয়ী নদীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। পৌরাণিক প্রসঙ্গ সংযুক্ত হওয়ায় বাংলা দেশের মানুষ এই নদীগুলি সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল। এখানে ধাঁধা রচয়িতা যমুনার স্বচ্ছ নীল জলের খবর হয়ত রাখতেন। তাই চোখে তিনি দেখেছেন যমুনার স্বচ্ছতা! প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, চোখ সংক্রান্ত এই জাতীয় ধাঁধায় বাংলা দেশে যা

সহজলভ্য-সেই পুকুরের উল্লেখই বেশি। যেমন, 'এক ফোঁটা পুকুরে। মাছ খরখর করে........' বা 'এতটুকু পুকুরটা টলমল করে.........' ইত্যাদি। কিন্তু নদী এমনকি যমুনা নদী এই পুকুরের রূপকের পরিবর্তে যে আসতে পারে তা আমরা দেখলাম। বলাবাহুল্য, এটি নদীমাতৃক সভ্যতারই অবশ্যম্ভাবী প্রতিফলন।

নদীর দু'পার,— তার দুকূল বিভিন্ন অর্থে আমরা ব্যবহার করি। অথচ কোনো গভীর ভাব বোঝাতে নয়, সাধারণ উপমা হিসেবে নদীর দু-কূল কীভাবে এসে পড়ে তা দেখার মত:

'এই কূলেও ঝাড়, অই কূলেও ঝাড়
ঝাড়ে ঝাড়ে বাড়ি খার।' (চোখের পাতা)

আবার, উত্তর হ'ল লাঙ্গল, এমন একটি ধাঁধায় নদীতীর ধ'রে উড়ে যাওয়া টিয়াপাখির কথা এসে পড়ে কি অনাবিল ভাবে!

'গাঙপাড় দিয়া যায় টিয়া
সোনার টোপর মাথায় দিয়া।
যদি টিয়া ইচ্ছা করে
সাত হাত মাটি খোচ্ করে।'

হুঁকো বঙ্গসংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। হুঁকোকে উপজীব্য ক'রে বহু ধাঁধা রচিত হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, হুঁকোর বর্ণনা দিতে গিয়েও নদী বা গাঙ বাদ যায় নি। সেখানে নদী হয়েছে হুঁকোর যে অংশে জল ভরা হয় অর্থাৎ মূল নারকেলের আধারটি। যেমন:

'ঢাকা দি লাগ্যে আগুন
কেল্‌গাতা গেই এ পোড়া
শঙ্খ নদী ভুট ভুটাইএ
নল্ উলা দি ধাইএ ধুয়াঁ।'

নদীর চলন সরল নয়। সে এঁকেবেঁকে চলে। নদীর এই আঁকাবাঁকা রূপটি আমাদের সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকে প্রতিফলিত হয়েছে। লোকনাট্য, ধাঁধা, আলপনা, উপমা-রূপক এবং আরো বহু ক্ষেত্রে নদীর এই বক্রগতির কথা বারবার এসে পড়েছে। এ প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত ধাঁধাটি উল্লেখযোগ্য—

'আঁকা-বাঁকা নদীটি দিক-বরণে যায়,
সাত রাজার কপাট খুলি কাট কলাই খায়।' (ঘুন পোকা)

উত্তর যাঁতা—এমন একটা ধাঁধায়—নদীর উল্লেখ—

'আঁকা বাঁকা নদীটি বেল চরে যায়,
হাজার টাকার গুলি খায় আরো কত খায়।

ঘুন পোকা, যাঁতি, বন্দুক প্রভৃতি বিষয়কে নিয়ে অনুরূপ ধাঁধা আছে।

ঘুনপোকার চলন বঙ্কিম,— যদি বা তা মেনে নেওয়া যায়, কিন্তু বন্দুক, যাঁতি বা যাঁতার ক্ষেত্রে আঁকাবাঁকা নদীর প্রসঙ্গ কীভাবে আসে, তা বলা দুরূহ। আসলে অতি

পরিচিত ছবি, অতি পরিচিত অলঙ্কার-ধ্যানধারণা স্থানে-অস্থানেও স্বতোৎসারিত হয়। সুতরাং নদীর দেশে, নদীর বিভিন্নরূপ বা চরিত্র, সেই দেশের মানুষের ধ্যান ধারণায় প্রবলভাবে স্থানে-অস্থানে, আবশ্যক বা অনাবশ্যকভাবে প্রতিফলিত হবে তা অত্যন্ত স্বাভাবিক।

নদী কখনো কখনো গভীর অর্থদ্যোতনা লাভ করে। নদীমাতৃক সংস্কৃতিতে নদীর এই মাত্রালাভ সঙ্গত। সে ক্ষেত্রে নদী নিছক নদী নয়, জীবনের সঙ্গে,— মানুষের পাপ-পুণ্য, ইহকাল-পরকাল-সবকিছুর সঙ্গেই অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। তাই নদী মানে ভবনদী, নদী মানে বৈকুণ্ঠ নদী। যেমন নৌকা সংক্রান্ত একটি ধাঁধায় বলা হয়েছে—

'এক শালুকের দুই মাথা
শালুক গেল কলিকাতা
শালুক যদি মন করে
ভবনদী পার করে।'

—যে ভাবে চর্যাকাররা প্রাচীন যুগ থেকেই নদী বা নৌকাকে দেখেছেন—পরবর্তীকালেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি, লোক সমাজেও সেই ভাবনা একই ভাবে রয়ে গেছে— অনিবার্যভাবেই যা নদীমাতৃক সভ্যতার ফলশ্রুতি। শুধু নদী বা নৌকা নয়, মানবদেহের বিভিন্ন প্রত্যঙ্গ নিয়ে রচিত ধাঁধাতেও নদীর এইভাবটি অনাবশ্যকভাবে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে; কিন্তু স্মর্তব্য, অনাবশ্যক হলেও তা অত্যন্ত স্বাভাবিক :

'বৈকুণ্ঠ নদীর গোর গোরা ঘাট
বত্রিশটা গাছের একটা পাত।' (জিহ্বা)

নদীর তীর বকের আদর্শ বিচরণভূমি। একটি দু'টি কিংবা অসংখ্য বক শান্ত নির্জন নদীতীরে মাছের প্রত্যাশায় ঘুরে বেড়ায়। মানুষের সাড়া পেলে বিশেষ একপ্রকার শব্দ ক'রে তারা উড়ে চলে যায়। নদীতীরবর্তী পল্লীবাসীর এ এক প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা। এই সহজ অভিজ্ঞতাও প্রকাশ পায় নিম্নলিখিত ধাঁধায়; ধাঁধাটি ধান কোটার ঢেঁকি নিয়ে সৃষ্ট। ঢেঁকিতে পা দিলে যে যান্ত্রিক আওয়াজ নির্গত হয়, তার সঙ্গে বকের ঐ আকস্মিক ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে উড়ে যাওয়ার সময়কার ডাকের সাদৃশ্য আছে:

'নদী নদী বক চরে।
পা দিলে ক্যাঁক্ করে।।'

আকাশের তারাকে কেন্দ্র ক'রে বহু ধাঁধা রচিত হয়েছে। একটি ধাঁধা লক্ষ্য করা যাক : •

'এক নৌকা সুপারি
গুনতে না পারে ব্যাপারী।'

—নদীর কথা নেই বটে, কিন্তু নদীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নৌকা, কত স্বতঃস্ফূর্তভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। এই ধাঁধাটিতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে 'থালা' ব্যবহৃত হয়েছে (এক থাল সুপারি। গুণতে লাগে ব্যাপারী')—কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের কাছে নৌকাও

থালার মত প্রায় সর্বক্ষণের ব্যবহার সামগ্রী; তেমনই নদীর সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে আছে মাছ ধরার জাল, বঁড়শী ইত্যাদি। তাই সূর্যকে নিয়ে রচিত একটি ধাঁধায় বঁড়শীর উল্লেখ :

'নদী সে পাখরু আইলা জনে বড়শী কাঁধে করি
শুকনো গাছে ফুল ফুটেছে কাটমু কেমন করে।'

প্রদীপ তেল পুড়িয়ে জ্বলে। এই তুচ্ছ প্রদীপ যখন ধাঁধার বিষয় হয়ে ওঠে তখন প্রদীপের আগুন হয় 'হাসি', প্রদীপের তেল হয় 'গঙ্গাজল'—

'এতটুকু বাবাজী গঙ্গাজলে ভাসে
পিছনে খুঁচে দিতে ফিক্ করে হাসে।'

বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ধাঁধা রচনা করতে গিয়ে যেমন অনায়াসে নদী বা নদী-সম্পৃক্ত বিষয়ের ছবি ধাঁধা রচয়িতার মনে ভেসে ওঠে, তেমনি নদীর সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন—বস্তু সমূহ,—যেমন জাল, নৌকা, মাছ, কুমীর-ইত্যাদি নিয়েও অবাধে লোককবি বহু ধাঁধা রচনা করেন। যেমন নৌকা নিয়ে—

'মৎস্য মকর নহে পানী পানী বুলে।
হাঙ্গর কুম্ভীর নহে দেখিলে সে গিলে।।
গিলিয়া উগারে সেই দেখে
হিঁয়ালী প্রবন্ধে পণ্ডিত দেহ মন।।'

এমন বহু দৃষ্টান্ত আছে, যেমন—

জাল :

আধা আধা আধা
তিন ঘর খাদা।
কেন্ দুয়ারে শেমাইল
সকল আগল বাঁধা।

জাল ও মাছ :

'মড়াটা বসে আসে,
জ্যান্তটাকে খেয়ে যাচ্ছে।'

জাল বাওয়া :

'মস্তক উপরে একবার দণ্ডপাক খাই
যাইবার কালে একটি ল্যাজ রেখে যাই।'

জলে জাল ফেলা :

'ও আল্লা হল কি
উপর থেকে পড়ল কি,
ঘর বেরুলো দুয়ার দিয়ে
আমরা বেরুবো কোথাদিয়ে।'

ঝাঁকি জাল :

'ছোট মাগি লম্বা চুল
কূলে বসে মারে ঝুল।'

এই রকম নৌকা বা জাল সংক্রান্ত বহু ধাঁধা রচিত হয়েছে। ডোঙ্গা নিয়েও অনুরূপ কারণে বহু ধাঁধার সৃষ্টি হয়েছে। একটি উদাহরণ দেওয়া গেল :

'এক হাত বল্লা, দশ হাত শিং।
নাচে বল্লা হিং হিং হিং।'

পলো মাছ ধরার যন্ত্র বিশেষ। স্রোতেব মুখে পেতে রাখতে হয়। এই নিয়েও বহু ধাঁধা তৈরী হয়েছে। একটি দৃষ্টান্ত :

'আচির পাচির ছাচিরে ঘর
মড়কচা দিয়ে দুয়োরে কর।'

মাছ ধরার জন্য যে বঁড়শী, তাও লোককবির দৃষ্টিতে ধরা পড়ে :

'অনলে জনম যার, কারিগরে গড়ে।
মাংসের ভিতরে থাকে, জলে যাহা চরে,
বার হাত লেজ তার, যে খায় সেই মরে।।'

শুধু পলোই নয়, মাছ ধরার অন্যান্য হাতিয়ারও ধাঁধার বিষয় হয় :

ঘুঘী : ('মাছ ধরার জাল, ঘাসের তৈরী।)
'দেখ্যে আল্যম বিলে।
মায়া (মেয়ে) জিয়ন্তে গিলে।।'

ঘুনি : 'মরায় খায়, জীয়ন্ত তার পেটে থাকে।'

সেঁওতি বা সেঁউতি নৌকার জল সেচন করার পাত্র বিশেষ। এটি সাধারণত কাঠেরই তৈরী। তাই নিয়েও ধাঁধা রচিত হতে পারে :

'এক বুড়ি ডুবলো
দু'বুড়ো তুল্‌লো।'

নৌকা চালাতে গিয়ে নদীর স্রোত, গভীরতা ইত্যাদির বৈচিত্র্য হেতু হাল, বৈঠা, লগি ব্যবহার করা হয়, তেমনি দড়ি বেঁধে নৌকা টেনে নিয়ে যাওয়ার পদ্ধতিকে বলে গুণ টানা। এই নিয়ে রচিত একটি ধাঁধা :

'যেখানে করে মাঝি টানে লোকটির নেই,
এক কথায় উত্তর দাও।'

লোকসঙ্গীত :

লোকসঙ্গীতেও অনুরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নেই। যেমন :

চণ্ডীঃ 'বলব কি মনের ভুলে. ফাতনাটা নড়ছে জলে
এই কেবল ঠোকর দিলে, ঢেউ দিও না ফতনাটা নড়ে।

রামী ঘাটে কাপড় কাচতে আসে এবং চণ্ডীদাসকে 'আমি গাঁয়ের মেয়ে, অনেক যাচ্ছি সয়ে। তুমি ছিপ ফেলিয়ে তাকাও কেন আড়ে আড়ে'—এই প্রশ্ন করলে চণ্ডীদাস ঐ উত্তর দেন। (বিবিধ পুরাণ)

ময়ূরাক্ষীর সর্বনাশা বন্যা নিয়েও রচিত হয় লৌকিক পাঁচালী. চাষীদের দুর্ভাগ্য, রাজনৈতিক দলের রিলিফ, 'সর্বনেশে জরীপ'—ইত্যাদি পরিচিত ছবি এখানে ফুটে উঠেছে—

'এবার বাংলা দেশে ঘটে গেল দায়।
চাষী লোকের ভাঙ্গল বাসা আশায় পল ছায়।।
সৃষ্টি ছাড়া শনির দৃষ্টি বৃষ্টিছাড়া নাই।
ময়ূরাক্ষীর বন্যা সে জগতও ভাসায়।।'

বাঙালীর প্রিয় পাবদা, বোয়াল ও কই মাছ লোকগানে অনুল্লিখিত থাকে না—

'বিহাস বিকাল দিব খাওন পাবদা বোয়াল কই।
তাহার লগে পাইবা আরও হাটের সরস দই।।'

পুঁটিমাছও প্রাসঙ্গিকতা পায়—

'বড় বাঁধের বড় মাছ ছোট বাঁধের ছোট মাছ,
রাজার পখুরে, দিদি, হিঁসল পুঁটি মাছ।।'

নদীর সঙ্গে কুমীরের সম্পর্ক এবং বাঙালীর কাছে তা অতি পরিচিত, ফলে লোকসাহিত্যেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার অনিবার্য উপস্থিতি। একটি লৌকিক প্রেম সঙ্গীতের অংশ বিশেষ—

'সখী রে, তোমরা সবে ঘরে যাও গো, ভরা কলসী লইয়া।
কইও খবর সবার আগে মোরে কুম্ভীরে গেছে লইয়া।।'

উপমায় মাছ—

'বন্ধু রে মাছের মত ডুব্‌ব্যা রইলাম তোমার আশায়।
সে আশা নৈরাশ হইল, বন্ধু, তুমি রইলে কোথায়।।'

নদী, মাঝি, ঘাট ইত্যাদির অনুষঙ্গে মানুষের প্রেম, মাঝিকে নারীর হার্দিক আবেদন, অথবা অতিথি পরায়ণতা—

'ঘাটে নাও লাগাইয়া, রে তুমি, পান খাইয়া যাও।
পান খাইয়া যাও রে, বন্ধু, কথা শুইনা যাও।
কোন দেশের মানুষ, গো তুমি, কোন বা দেশে যাও,
একখান কথা কও বা না কও, পান খাইয়া যাও।
বিনয় কৈরা ডাকছি তোমারে গো, একবার ফিইরা চাও,
ঘাটে নাও লাগাইয়া তুমি পান খাইয়া যাও।'

বাউল গানে জোয়ার-ভাঁটা ও কুমীরের রূপক—

'ডুব দিও না পারে থেকো, না জোয়ার ভাঁটার খবর রেখো,
বিবেক হলদি গায়ে মেখো কুম্ভীর ছোঁবে না আর।।'

গুণটানা ছিল অতি পরিচিত দৃশ্য। বাউল গানেও তার উল্লেখ—
'ছ'জনা তারা দাঁড়িমাঝি দশজনা তার গুণ টানা।'

মাছ ধরাব বিভিন্ন প্রসঙ্গ ও অনুষঙ্গ—
'আমি বঁড়সী ফেলেছি, সাঁই, জলে,
যাওনা যাও ঠোক দিয়ে, যাও, বেঁধে যাবে গলে।।
ছিপ সূতো মনের মত যাওয়ার বেলায় এক গুঁতো মারে।
ছেঁড়া বঁড়শী ছেঁড়া সূতো তাই নিয়ে টানাটানি।'

বা—
'মন পাগলা, বঁড়শী ফেলা
বড়শী খেয়ে কল ডুবালো বিনে কাতলা।।'

ইলিশ বাঙালীর সর্বাপেক্ষা প্রিয় মাছ, কাজেই লোকসঙ্গীতে তার উল্লেখ তো অবশ্যম্ভাবী—
'ইলিশি মাছকি ছাই তোলিয়া
সঙ্গে হইতেলি খরা বেলিয়া...'

প্রবাদ-প্রবচন :

পূর্বে আমরা যে প্রবাদগুলির উল্লেখ করেছি, সেগুলিতে নদী প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত থাকলেও মানুষের বিভিন্ন জীবন-অভিজ্ঞতাই মূলত নদীর রূপক-উপমার মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। এখন আমরা যে প্রবাদগুলির দৃষ্টান্ত দেব তাতে নদী সংক্রান্ত বিভিন্ন বস্তু ও বিষয়ই কেমনভাবে প্রবাদের অর্থদ্যোতনা প্রকাশ করেছে তা দেখব। যেমন, কুমার, নৌকা, মাছ, মাঝি— ইত্যাদি নদীর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বিষয়গুলি কত স্বচ্ছন্দে গূঢ় বক্তব্য প্রকাশে সহায়ক হয়ে উঠেছে—

মাছ :
জল ঘোলা ক'রে মাছ ধরা।
ধরি মাছ না ছুঁই পানি।
অল্প জলের মাছ বেশি ফরফরায়।
মাছের তেলে মাছ ভাজা।
শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায় না।

কুমীর :
খাল কেটে কুমীর আনা।
জলে কুমীর ডাঙায় বাঘ।
জলে বাস ক'রে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ।

নৌকা :

তীরে এসে তরী ডোবে।
দু' নৌকায় পা দেওয়া।
পিরীতের নৌকা পাহাড়ে চলে।

মাঝি :

পার হয়ে মাঝিকে সালাম।
চালাক মাঝির ঘোপায় লা। (ঘাটে নৌকা)
তুফানেতে হাল ধরে না, সেই বা কেমন নেয়ে।
কথা পাড়িলে বুঝে না, সেই বা কেমন মেয়ে।

—এইভাবে মাছ, কুমীর, নৌকা প্রভৃতি বিষয়গুলি খাল-বিল-নদ-নদীর দেশে জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী হয়ে ওঠে স্বভাবতই। বস্তুত বাংলাদেশের জীবন ও সংস্কৃতি নদী সভ্যতার জলবায়ুতেই পরিপুষ্ট।

অরণ্য-উদ্ভিজ্জ

বঙ্গদেশে অরণ্যভূমি মূলত পার্বত্য-তরাই অঞ্চলে, সমুদ্র উপকূল ভূমিতে এবং কিছুটা রাঢ় ভূমির আশেপাশে। তবু প্রায় সমস্ত বঙ্গভূমিতেই সবুজের সমারোহ। নদীব সংখ্যা ও বিস্তারের সঙ্গে তুলনা করলে অরণ্য অপেক্ষাকৃত অপ্রতুল। তাই পুরোপুরি অরণ্য কেন্দ্রিক জীবন বঙ্গদেশে তুলনামূলকভাবে কম। আসলে অরণ্যও ততটা নয়, যতটা শস্যশ্যামল বঙ্গভূমিতে শস্য ও অন্যান্য উদ্ভিজ্জ মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের নিকটবর্তী হতে পেরেছে। তাই সর্বত্র গহন অরণ্যের আধিক্য না থাকলেও এদেশের সভ্যতা বছরের পর বছর ধরে কৃষি ও অরণ্য-উদ্ভিজ্জ কেন্দ্রিক। বাংলার জীবন যাত্রার কথা ভাবলেই যে ছবি আমাদের অনুভবে ভাস্বর হয়ে ওঠে তা নিঃসন্দেহে শান্ত-স্নিগ্ধ-মসৃণ এক আবণ্যক সভ্যতার ছবি। কাজেই এদেশের বিভিন্ন শস্য, ফল-ফুল, গাছপালা এবং ঝোপঝাড়-বন-বাদাড়কে বাংলার লোকসাহিত্য সবসময়েই স্মরণ করেছে। প্রথমে প্রত্যক্ষভাবে বন বা অরণ্যের উল্লেখ আছে— এমন কতকগুলি বিষয়ের উল্লেখ করা যাক :

ধাঁধা :

'দুই বর্ণে নাম, জীবজন্তুর আশ্রয়স্থল।
উলটিয়ে দিলে নামটি পুরাতনের দাম কমল।। (বন)

ইঁদুর সংক্রান্ত ধাঁধাতেও বনের উপস্থিতি :

'আমার এক ছাগল ছিল
বনের পাতা খায়
সাত শত কোঠা ভেঙ্গে
লড়াই করতে যায়।''

কাঠবেড়ালী বাঘের রূপকে বন থেকে বেরোয়—

'বন থেকে বেরুল বাঘ
বাঘের গায়ে ছড়ির দাগ।'

গরু নিয়ে রচিত ধাঁধায় অনাবশ্যক বনের উল্লেখ—

'তরোয়ালকে ঝিকমিক
বনকে বাদার
তিনমাথা দশ পা দেখেছো কি কোথা? (উত্তর: গরু ও কৃষক)

বনের সঙ্গে সম্পৃক্ত বাঘ। বহু অঞ্চলেই মানুষকে বাঘের সঙ্গে সংগ্রাম করে বেঁচে থাকতে হয়। তাই বাঘও ধাঁধার বিষয় হয়ে ওঠে—

'বনকে বাইরাল মুড়া,
গায়ে বেল মহাজন বুড়া।'

কাঠ কুড়ানীও বন থেকেই আসে—

'বন থেকে বেরুল বুড়ী
বুড়ীর পা আঠ্‌ঠার কুড়ি।'

কুরকুট— যা কিনা মানুষেব খাদ্য— বড় পিঁপড়ের মত আকৃতি, তার সন্ধান বনেই মেলে—

গভীর বনে বাঁধা রইছে
সরু চাউলের আউটি।'

কলমের সৃষ্টি নলখাগড়া থেকে। তা চাষের জিনিষ নয়, বনেরই সম্পদ। ধাঁধা রচয়িতা তা ভোলেন নি—

অরণ্যেতে জন্ম তার বইসে রাজস্থানে।।
সকলের কথা সে তুলে দেয় কানে।।
সেই বা কাটিয়া তারে করে খান খান্।
তথাপি মুখেতে তার আগম পুরাণ।।

ডোঙাকে উপজীব্য করে ধাঁধা রচনা করতে গিয়ে লোক কবি তার উৎসের কথাও ভোলেন নি—

'বনরে বাড়ে বনরে ছিঁড়ে
সেই ধারে তার বাস,
ঘরকুনা সে কুটুম পুষে

তার নাম ধরম দাস।'

অনুরূপ নৌকা, লাঙ্গল প্রভৃতি বস্তুকে উপজীব্য করে রচিত ধাঁধায় 'বনে'র উপস্থিতি :

নৌকা—

'দারুণ বনে জন্মস্থান, জলে হয় স্থিতি,
দুই দিকে মাথা তার, মানুষের মাঝে বসতি।'

লাঙ্গল—

'বনে তার জন্ম ত্রিভঙ্গ তার নাম,
বুকেতে শেল মারে মুখে জিহ্বা বাণ।'

দাবানল—

তরু নয় বনে রয় নাহি ধরে ফুল।
ডাল পল্লব তার অতি সে বিপুল।।
পবনে করিয়া ভর করয়ে ভ্রমণ।
বনেতে থাকিয়া করে বনের পীড়ন।।

'চিরুণী' নিয়ে রচিত ধাঁধায় অরণ্য ইত্যাদির কথা—

'দীর্ঘকায় শরীর তার বহুদন্ত ধরে,
শিকার করিতে গেলে অরণ্য মাঝারে।
অরণ্য মাঝারে নিয়ে ভাঙ্গে বহু বন,
দন্ত দিয়ে চাপি, বাঘে না মারে কখন।'

'যাঁতা' গ্রামবাংলায় আগে অপরিহার্য বস্তু হিসেবে পরিগণিত হত। যাঁতা নিয়ে বহু ধাঁধা রচিত হয়েছে। ধাঁধা রচনা করতে গিয়ে 'যাঁতা' গাছের সঙ্গে উপমিত হয়েছে—

'ঐ গাছটা আঁকাবাঁকা ঝুপ ঝাঁপিয়ে পড়ে।'

অরণ্য উদ্ভিজ্জের উপর নির্ভরশীল মানুষের সংস্কৃতির প্রতিফলন

ধাঁধা

এখানে প্রত্যক্ষভাবে অরণ্য-উদ্ভিজ্জ বৃক্ষকে নিয়ে রচিত নয় কিন্তু বিভিন্ন বিষয় বা বস্তুকে উপজীব্য করে ধাঁধা রচিত হবার সময় কীভাবে তাতে রূপক-প্রতীক বা উপমা হিসেবে বাংলার বিশিষ্ট গাছ-পালা, ফুল-ফল, খাদ্যাভ্যাস, পারিবারিক সম্পর্ক ও কৃষিজীবন, এমনকি ঘাটবাঁধানো পুকুরের ছবি আছে তা লক্ষণীয়। কয়েকটি দৃষ্টান্ত পর্যবেক্ষণ করা যাক।

মানুষের ছায়ার মধ্যে বনের কল্পনা—

'বন থেকে বেরুল বুড়ো
কোদাল কুড়োল নিয়ে
মরা গাছে ফুল ফুটছে
কাটন কেমন করে।'

'চোখের পাতার রোম' সহজেই দূর্বা হয়ে যেতে পারে—

'এ-পারের দূর্বাগুলি টলমল করে,
ও-পারের দূর্বাগুলি নমস্কার করে।'

'দাঁত' ও 'জিভে'র বর্ণনায় ধানের প্রসঙ্গ—

'এতটুকু বিলে বত্রিশ হালের চায,
কি ধান বুনছো রাজা রাম-সীতাশাল।'

'পদচিহ্ন' ধাঁধার বিষয় হতে পারে সেখানেও গাছ-পাতার রূপক—

'বনে গেলাম বনফল খেতে

কিংবা

সোনাব খড়ম ফেলে।'
'গাছটা চলে গেল পাতাটা পড়ে রইল।'

'ছাগলেব ল্যাজ নাড়া' এবং 'তার মল ত্যাগের দৃশ্যটি' ধাঁধার উপজীব্য হলেও জাম এর প্রসঙ্গ—

'ফিটিক লড়ে,
জাম পাকা পড়ে।'

ডিম ধাঁধার বিষয় হতে পারে, কিন্তু সেখানে তরমুজের কথা আসে—

'হায় তরমুজ করি কি,
বোঁটা নাই তার ধরি কি।'

উকুনের বর্ণনায় কচুবন—

'কাল কচুবনে
কাল হাঁস চরে।'

'কাঁকড়া'ও বনে চরে—

'আর বনে চড়ই চাঁই
চোখ ডিম ডিম মাথা নাই।'

'কেন্ন' বাঙালীর কাছে হয়ে যায় অতিপ্রিয় লাল শাক—

'লাল শাকের ডাঁটাটা
টুক্‌কা দিলেই টাকাটা।'

'গুটিপোকা'র বর্ণনায় শালপাতার উল্লেখ—

'শালপাতার খালাদোনা
নয়ন পাতার কেশ।
চন্দনে ঘেরিছে কন্যা
যাবে কোন দেশ।'

জোঁক নিয়ে রচিত ধাঁধায়, আমড়া গাছ রূপক হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে—

''আমড়ার গাছে বাঁধলাম দামড়া,
হাড় নাই তার খালি চামড়া।'

ক্ষৌরকারের চুলদাড়ি কামানো ধাঁধার বিষয় হয় বটে, লোককবির উপমায় চুল-দাড়ি হয় বাঁশ বা বাঁশ ঝাড়—

'এখান থেকে মারলাম ছুরি,
বাঁশ কাটলাম (চুল বা দাড়ি) আঠার বুড়ি।'

'কেরোসিন ল্যাম্প'— যাকে আমরা চলতি কথায় লম্ফ বলি, তা নিয়ে ধাঁধা রচনার সময় পল্লীকবির দোপাটি ফুলের কথা মনে হয়েছে—

'এতটুকু দোপাটি,
ফুল ফোটে শোভাটি।'

কোনো বস্তু নয়, ভয়ঙ্কর ঘূর্ণি ঝড়— তাই নিয়েও ধাঁধার সংখ্যা কম নয়। এই ঘূর্ণির বর্ণনা দিতে গিয়ে লোককবি পুঁইগাছের রূপক ব্যবহার করেছেন—

'অলক পুঁই, বৃহৎ গাছ, তার পাতা বার হাত।'

দুপুরের সূর্য নিয়ে ধাঁধা রচনা করতে গিয়ে পরিচিত কুমড়ো পাতাই স্মর্তব্য—

'খস খস কুমড়া পাত
দেখতে লাগে উৎপাত।'

ভাত, ভাতরাঁধা বা খাওয়া নিয়েও ধাঁধার প্রাচুর্য কম নয়। এখানেও ঐ প্রসঙ্গ বাদ যায়নি—

'হাঁটু জলে ফোটে ফুল,
জল শুকালে ফোটে ফুল।'

আবার বাংলার অতি পরিচিত এবং প্রিয় মল্লিকা ফুল বা মল্লিকার ঝাড়ও ভাত নিয়ে রচিত ধাঁধায় সহজভাবে এসে পড়ে—

'হুড়গড়ানি দীঘির পাড়, তাতে একটি মল্লিকা ঝাড়,
মল্লিকা ঝাড় ফুটলো, ছেলে বুড়ো জুটলো।'

নদী-নালা-গাছপালা বাংলার যে বিশিষ্ট ভৌগোলিক বাতাবরণ সৃষ্টি করেছে, বঙ্গ -সংস্কৃতি বহুলাংশে সেই পরিবেশেরই দান। বাংলার মানুষের শান্তশ্রী, অলস মনোভঙ্গী, সৌন্দর্যবোধ, কল্পনা প্রবণতা, তার সাহিত্য শিল্প কাজ-কর্ম সব কিছুতেই এই প্রকৃতি বিশিষ্ট মাত্রা দিয়েছে। আবার বিপরীতক্রমে তাদের আচরণ কর্ম, শিল্প-সাহিত্য ইত্যাদি বিশ্লেষণ করলে বাঙালীর সেই বিশিষ্ট মনোভঙ্গীর উৎস আবিষ্কার করা যায়। লোকসাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার কিঞ্চিৎ অনুসন্ধানে একথার সারবত্তা প্রমাণ করা সম্ভব।

'মামাদের গড়ানে ঘাট,
বত্রিশটি কলাগাছ
একখানি পাত।'

— মানুষকে উপজীব্য করে রচিত এই ধাঁধায় রূপক হিসেবে গ্রাম বাংলার মামাবাড়ির কথা আছে। আছে ঘাটবাঁধানো ঘেরা পুকুরের ছবি। জিভ নিয়ে রচিত আর একটি ধাঁধা—

'সর বড় দিঘিটি মনোহর গাছটি
বত্রিশখান ডালে একটি পাতা ঝোলে।'

—এখানে মামাবাড়ির আদর-আব্দার না থাকলেও সেই মনোহারিত্ব বজায় আছে। বাঙালীর ঐ শান্ত স্নিগ্ধ প্রকৃতি, মানুষ বা অঙ্গপ্রতঙ্গের কথা বলতে গিয়েও তাই লোককবি অনাবিল স্নিগ্ধ রূপের আশ্রয় নেয়।

গ্রামবাংলায় অপর্যাপ্ত ফল। তাল, নারকেল, আম ইত্যাদি কুড়ানোর মধ্যে যে আনন্দ আর তৃপ্তি তা বহু ধাঁধায় লক্ষ্য করা যায়। একটি উদাহরণ—

'ধূম পড়ল বনে
দেখল দুজনে
কুড়াল পাঁচ জনে
ভাঙলো দশ জনে
খেল বত্রিশ জনে।

ছেলে বাপ নাতিকে নিয়ে রচিত একটি ধাঁধা—

'এরা বাপ ব্যাটা, ওরা বাপ ব্যাটা
তাল তলা দিয়ে যায়,
একটি তাল পড়ল পরে
সবাই মিলে খায়।'

এখানে একান্নবর্তী পরিবারের ইঙ্গিত আছে। প্রত্যেকের প্রতি স্নেহ মমতা

ভালোবাসার বন্ধন নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের যৌথ পরিবারের মধুর চরিত্রকেই ফুটিয়ে তোলে। এখানে কোনো রূঢ়তা, প্রতিযোগিতা কিছুই নেই।

লোকসঙ্গীতে

কদম গাছ বাংলাদেশের সঙ্গে ওতপ্রোত। বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন, লোকসঙ্গীতেও তার বহুল ব্যবহার; তবে রাধা-কৃষ্ণ প্রেম, বা নর-নারীর লৌকিক প্রেম সংক্রান্ত ক্ষেত্রেই কদমগাছের উল্লেখ বেশি। বাংলাদেশের এই বৃক্ষটি বস্তুত শুধু এই সংকীর্ণ ক্ষেত্রে উচ্চারিত হয়। তেমনই 'তমালবন' :

'তমালেরি বনে সেই তরু কদম তলে
সদাই বাঁশী বলে রাধে রাধে,
গো সেই বৃন্দাবনে।' (পাতানাচের গান)

আম, তেঁতুল, কোঁড়াধান— ইত্যাদির উল্লেখ—

'আম ধরে ঝোঁকা ঝোঁকা তেঁতুল ধরে বাঁকা
ফুল ধরে পাতা পাতা তবু লাগে চ্যাকা।' (পাতানাচের গান)

ঝাড়গ্রাম শাল বনের জন্য বিখ্যাত। কাজেই স্থানীয় লোকসাহিত্যে তার উল্লেখ স্বাভাবিক। বেলপাহাড়ীর একটি পাতানাচের গানে শালগাছের প্রাসঙ্গিক অনুপ্রবেশ লক্ষ্য করার মত—

'শাল গাছে শুঁয়ো পোকা ওইটাই বটে ছেলের কাকা,
মার বুধা, বলে দিবে দয়ালকে, কি দোষে ছাড়িছে আমাকে।'

এক কণা চাল, ভাতের মাড়, বাসি ভাত বাঙালী জীবনে অনেক মূল্যবান—

'এক কণা চাল দিব মাড়ে ভাতে বুঝে নিব,
পেট না ভরিলে তোকে গাল দিব, আজ তোকে রাঁধুনি শিখাব।'

— সেই সঙ্গে সজনে শাকেরও গুরুত্ব—

'সজনা শাগে নূতন মাড়ে রাঁধ ছোট্‌কি, চাঁড়ে চাঁড়ে,
দেখনা ছোট্‌কি চাল গিলামে বাঁইগে
বড়্‌কারা আসিছে সিনাই।'

আমতলার মাটিও বিশেষ তাৎপর্য পায়—

'আম তলের মাটিয়া আর হৃদকে উঠে ছাতিয়া,
আ মনে পড়ে— আ শ্যামের পুরানো পিরীতি, আ মনে পড়ে।'

বুনো তিল ফুল, তিক্ত কলমী বাঙালীর অতি অপ্রিয় নয়—

'বনে ফুটে বুনো তিল ফুল বন হলো আলো।
বিছি ছানা মিছা জনম শ্বশুর ঘর আলো।।'

এবং—

'রাধি দিও বাঁটি দিও গো

তিতা কলোমী শাক্ রাঁধি দিও।'

গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষ প্রত্যক্ষভাবে রোজকার শাক ইত্যাদি তুলে আনতো, শাক তুলতে যাওয়া ছিল একটি নিত্যকর্ম। ফলে গানেও তার উল্লেখ—

'শাক তুলতে গেলি মিনা তুললি লতা পাতা,
কি শাক তুললি মীনা বুড়ার সঙ্গে দেখা।
ওরে মীনা মইরা গেলো,
এমন সুন্দর মীনার বর হইল বুড়া।'

কৃষি জীবন, অরণ্য জীবন— ও তার বিবিধ অনুষঙ্গ বাউল গানেও বারংবার এসেছে বিভিন্ন প্রতীক, রূপক হিসেবে। লৌকিক বাউলগানেও তার ব্যতিক্রম দেখতে পাওয়া যায় না। যেমন—

'হরি, এবার আসা যাওয়া সার,
সর্ব সুখ চাষে, চাষ করিতে এলাম আমি মনের উল্লাসে,
আসমান ছাড়া জমি বীজের নাই গোড়া
বাঙ্গা কাঁটায় উগাল হল না।'

পরিচিত বাঁশ ঝাড়ের উল্লেখ—

'কেহ কাটে ঝাড়ের বাঁশ কেহ পাকায় দড়ি।'

আখ, জাম ইত্যাদির সহজ উল্লেখ—

'একটি সাদনার গাছেতে দুটো আম ধরে আছে,
আমের ভিতর জামের চারা জন্ম ধবে তাথে।'

স্বামীগৃহ থেকে পিতৃগৃহে যেতে উৎসুক কন্যা তার 'বারমাস্যা'-তে জ্যৈষ্ঠ মাসের আম-কাঁঠালের কথা বিস্মৃত হয় না। বলে—

'আম পাকে কাঁঠাল পাকে, জেঠ মাসের রোদে,
সোনা ভাইরে খাইতে দিও, রস করা দুধে।'

তেমনই ভোলে না—

'আঘন মাসে নতুন ধান মরাই এতে ভরে,
নতুন চাউলের পিঠাপুলি পৌষ মাসেতে করে।

কিংবা—

'চৈতেতে মধু মিষ্টি বৈশাখেতে আম,
আহা জ্যৈষ্ঠেতে আম মিষ্টি শোলমাছে আম।।'
'...আষাঢ়ে কাঁঠাল মিষ্টি শ্রাবণে খৈ-দৈ,
ভাদরে পাকা তাল, গো তারামণি।'
খেলিতে মন সরে না নীল সরোবরে।
আশ্বিনে গুড় মিষ্টি আর কার্তিকে ওল গো
তারামণি, খেলিতে মন সরে না নীল সরোবরে খেলতে গো।

অগ্রাণেতে নতুনান্ন চ্যাং মাছের ঝোল গো,
তারামণি, খেলিতে মন সরে না নীল... গো।
পৌষেতে মূলা মুড়ি দুদ্ আউটা
কলাপাকা আরো বাঁকা পিঠা গো,
তারামণি, খেলিতে...
মাঘেতে শিম মিষ্টি ফাল্গুনে দ্বিগুণ মিষ্টি,
বুড়া বেগুন নিম গো, তারামণি,
খেলিতে মন সরে না নীল সরোবরে।।'

(বারমাসী গান)

ডালিমের উল্লেখ—

'দাঁড়িয়ে আছে ডালিম গাছটি ডাল হৈল মেলান্তি গো,
ফুল যে ফুটিল, ধান হলুদ বরণ গো,
বাসাতে তো জীবন উড়ে যায়।

অথবা—ব্যঙ্গার্থে—

হেদে হে, নাগর, ডালিম ডাগর, আমাদের পাড়া যেও,
কত ডাঁসা ডাঁসা ডালিম তুলিয়া রাখিব দুয়ারে বসিয়া খেও...'

এইভাবে কৃষি ও অরণ্য সংস্কৃতি সার্বিক দিক থেকেই বাংলার লোকসাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে। বলাবাহুল্য এই কৃষি ও অরণ্য সংস্কৃতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী, বাংলার বিশিষ্ট ভৌগোলিক বাতাবরণ জাত নদী, অরণ্য ও কৃষিসংস্কৃতি শুধু লোকসাহিত্যেই প্রতিফলিত হয়নি, বাঙালীর আচার-আচরণ, বিশ্বাস-সংস্কার, বিচিত্র প্রথা অনুষ্ঠান—এমনকি বাঙালীর বিশিষ্ট মনন ও মানসিকতাকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে চলেছে, যুগ যুগ ধরে তাকে গড়ে চলেছে যেভাবে নদীর উর্বর পলি যুগযুগান্তর ধরে তিল তিল করে গড়ে চলেছে বঙ্গতিলোত্তমাকে।

প্রবাদ-প্রবচন :

বাংলার নিজস্ব গাছ-পালা, ফুল-ফল বা বাঙালীর প্রিয় শস্যাদিও বিভিন্নভাবে তার প্রবাদে স্থান লাভ করেছে। যেমন—

বনের উল্লেখ :

আদার বনে শিয়াল বাঘ।
মাসি পিসি টাটকা বাসি, বনের ধারে ঘর।
কখনো মাসি বলেন নাক খই-নাড়ুটা ধর।

শাক পালা :

এক তোল কচুশাক, এক তোল পানি
বাপে পুতে শলা ক'রে পেয়েছে রাঁধুনী।
পুঁই, কচু, ঘেসো— তিন আমাশার মেসো।

মাছের মধ্যে রুই, শাকের মধ্যে পুঁই।

অন্যান্য :

আমে ধান, তেঁতুলে বান।
অকাজের বউ লাউ কুটতে দড়।
বাঁশ বনে ডোম কানা।
যেখানে বাঘের ভয়, সেখানে সন্ধ্যা হয়।
কত ধানে কত চাল।
নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমনো।
গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল।
বেল পাকলে কাকের কি?
আঙুল ফুলে কলাগাছ।
তাল তেঁতুলের মান্দার, তিনে দেখায় অন্ধকার।
বক বকুল চাপা, তিন পুঁতো না বাপা।
আমড়া চালতা তাল, আবাল বৃদ্ধ ভাল।
লজ্জাবতী লতা।
অমানুষের বোল, তিত পটলের ঝোল
তাল পড়ে ধুপ করে, না ধুপ ক'রে তাল পড়ে?
ডালের মধ্যে খেঁসারী, দেবতার মধ্যে বিষহরি।
ওল ধরেছে নিজের গুণে।
তরকারীর উঁচু ঝিঙা, পাখির উঁচু ফিঙা।
ফলের মধ্যে কদলী নারীর মধ্যে ফেদলী। ইত্যাদি।

উপরের এই প্রবাদ-প্রবচনগুলি আম-জাম-কাঁঠালের বাংলাদেশকেই স্মরণ করায় যেখানে মানুষের প্রিয় খেঁসারীর ডাল, ফলের মধ্যে প্রিয় কদলী কিংবা অম্লের মধ্যে চালতা-আমড়া। মধ্যযুগের চণ্ডীমঙ্গলের কবিও শিবের মুখ দিয়ে তাঁর যে খাদ্যপ্রিয়তার কথা ব্যক্ত করেছিলেন, এই প্রবাদগুলিতে যেন তারই প্রতিধ্বনি। আবার 'যেখানে বাঘের ভয়, সেখানে সন্ধ্যা হয়', 'জলে কুমীর ডাঙায় বাঘ' বা 'বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা'— ইত্যাদি বাঘ সংক্রান্ত প্রবাদগুলি যে, কোনো কোনো অরণ্য শ্বাপদ সংকুল অঞ্চলে বাঙালীর কঠিন জীবন-সংগ্রামের ইঙ্গিতকে দ্যোতিত করে সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না।

মৈমনসিংহ-পূর্ববঙ্গগীতিকা : নদী ও অরণ্য সম্পৃক্ত মানুষের জীবনালেখ্য

দীনেশচন্দ্র সেন পূর্ব-মৈমনসিংহ গীতিকাগুলি সম্পর্কে বলেছেন :

"বাঙ্গালার চাঁপা, বাঙ্গালার নাগেশ্বর ও কুমুদ ফুল, বাঙ্গালার কুটীরে কুটীরে

কি সুন্দর দেখায়, এই সাহিত্যের পথে ঘাটে তাহার নিদর্শন আছে। বর্ষার কদম্ববৃক্ষ, মান্দার গাছের ডালে-ঘেরা কদলী বন, নদীর ধারে কেয়া ফুলের ঝাড়, মুক্তাবর্ষী প্রস্রবণ প্রতিম বৃহৎ তরুশাখা হইতে অজস্র বকুল ফুলের দান—কাব্যবর্ণিত কর্ম্মশালার মাঝে মাঝে উঁকি মারিয়া আমাদের শ্রম অপনোদন ও চোখের তৃপ্তি ঘটাইয়া যায়।''

এমন গাছ-গাছালি আর নদী-নালা-খাল-বিলে ঘেরা পটভূমিতে গীতিকার যে বিভিন্ন চরিত্রগুলিকে আমরা দেখি, তারা বস্তুত এই জলবায়ুতেই শুধু গড়া নয়, এই প্রকৃতিও যেন তাদের ভাগ্যবিধাতা। মানুষ যেমন এই প্রকৃতির উপর নির্ভর করেছে ঠিক তেমনি গীতিকার ঘটনাগতিও প্রকৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। এমনকি গীতিকার কবিরা রূপক-উপমা-অলঙ্কার রচনা করতে গিয়ে এই প্রকৃতিকে—বিশেষত, বাংলার নদী ও অরণ্য-উদ্ভিজ্জকে বারংবার আশ্রয় করেছেন। আমরা কয়েকটি গীতিকা অবলম্বনে বিষয়টি লক্ষ্য করতে পারি।

প্রথমে নদী প্রসঙ্গ দিয়েই শুরু করা যাক। নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তগুলিতে নদীর ভূমিকা লক্ষণীয় :

ক. 'মহুয়া' পালায় মহুয়ার রূপমুগ্ধ নদের চাঁদ 'জলের ঘাটে' মহুয়ার সঙ্গে নিভৃত প্রেমালাপের সুযোগ পেল। শেষপর্যন্ত নদের চাঁদ মহুয়াকে বিবাহ করার ইচ্ছা জ্ঞাপন করলে কপট ক্রোধের সঙ্গে মহুয়া তাকে গলায় কলসী বেঁধে ডুবে মরতে বলে। প্রত্যুত্তরে নদের চাঁদের সেই বিখ্যাত উক্তি—

''কোথায় পাব কলসী কইন্যা কোথায় পাব দড়ি।
তুমি হও গহীন গাঙ্গ আমি ডুব্যা মরি।।''

বেদের দল চলে গেলে নদের চাঁদ উন্মাদের মত পথে পথে মহুয়ার সন্ধান করতে থাকে। অবশেষে কংসাই নদীর ধারে সে মহুয়ার দেখা পায়।

হুমরা বেদের কথামত মহুয়া নিদ্রিত নদের চাঁদকে হত্যা না ক'রে তার সঙ্গে পালিয়ে যায়। কিন্তু বাধা পায় এক নদীর তীরে : 'বিস্তার পাহাড়ীয়া নদী ঢেউয়ে মারে বাড়ি। / এমন তরঙ্গ নদীর কেমনে দিবাম পাড়ি।।' এইখানে এক বণিকের নৌকায় তারা নদী পার হতে গেলে, মহুয়ার রূপে বিমোহিত বণিক চাঁদকে জলে ফেলে দেয়। পালার শেষে নদের চাঁদ ও মহুয়ার মিলন সুখে অতর্কিতে নেমে আসে বিষাদের ছায়া—

'কত দূরে নদী আরে ঢেউয়ে খেলায় পাখী।
এমন সময় কন্যা শুনে বংশীর ধ্বনি।।''

খ. মলুয়া পালায় কাজী চক্রান্ত ক'রে বিনোদকে ধরে নিয়ে গেল। বিনোদকে উদ্ধার ক'রে মলুয়ার পাঁচ ভাই ফিরে এসে দেখল কাজী মলুয়াকে ধরে নিয়ে গেছে। মলুয়া ব্রত প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির অজুহাতে তিন মাস সময় নিয়ে কৌশলে দেওয়ানকে দিয়ে কাজীর প্রাণনাশ করায়। অতঃপর রূপলুব্ধ দেওয়ানকে মলুয়া নৌকা নিয়ে

কুড়া শিকারে নিয়ে যায়। তার আগেই কোড়ার মাধ্যমে সে তার পাঁচ ভাইদের সব কিছু জানিয়ে দেয়। ফলে যথাসময়ে মলুয়া উদ্ধার পায়। দীনেশচন্দ্র এ প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

"...জাহাঙ্গীপুর হইতে জাহাঙ্গীর দেওয়ান ধনু নদীর একটা উপশাখা বাহিয়া একদা দ্বিপ্রহর বেলা ধলাই বিলে কুড়া শিকার করিতে আসিয়াছিলেন— সঙ্গে মলুয়া। সহসা ঝুপঝাপ শব্দে তরুণী নর্ত্তকীর ন্যায় ক্ষিপ্রবেগে কয়েকখানি পানসি আসিয়া দেওয়ান সাহেবের তরীখানি ঘিরিয়া লইল। মলুয়ার ভ্রাতৃগণের সেই সকল পানসি নৌকা; পিঞ্জরের দ্বার মুক্ত পাইলে বিহঙ্গী যেমন স্ফূর্ত্তিতে উড়িয়া যায়—মলুয়া তেমনই অপূর্ব্ব ক্ষিপ্রতার সহিত ভ্রাতাদের একটা নৌকায় লাফাইয়া পড়িল—তখন "আট দাঁড়ী নৌকা" পদ্মবন ভাঙ্গিয়া নক্ষত্রবেগে আবালিয়ার অভিমুখে রওনা হইল। এগুলি সত্যঘটনা, অথচ অপূর্ব কবিত্বময়। সেই আবালিয়া, সেই ধলাই বিল, জাহাঙ্গীপুর ও সূত্যা নদী এখনও আছে..."।[৪]

বিনোদ সর্প দংশণে মৃতপ্রায় হলে মলুয়া গাড়রী ওঝার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তার প্রাণ বাঁচায় :

"ঘাটেতে আছে বাঁধা ঐ মন-পবনের নাও।
শীঘ্র লইয়া তারে ওঝার বাড়ী যাও।।
পাঁচ ভাইয়ে পাঁচ দাঁড় নায়েতে উঠিল।
মরা স্বামী কোলে লইয়া মলুয়া বসিল।।"

এই পালার শেষ অংশে মলুয়ার আত্মবিসর্জনে যে কাব্যসৌন্দর্য লক্ষ্য করা যায়, তা অন্যত্র দুর্লভ। ঘাটে বাঁধা ভাঙা মনপবনের নৌকা নিয়ে মলুয়া মাঝ নদীতে চলে যায়, প্রিয়জনদের সমস্ত আকুতি ব্যর্থ ক'রে সে কালসলিলে আত্মাহুতি দেয়। মলুয়া পালার শুরুতে আছে দুর্ভিক্ষ ও জলপ্লাবন আর শেষেও আর এক প্রকার প্লাবন :

"ডুবুক ডুবুক নাও আর বা কত দূর।
ডুইব্যা দেখি কতদূরে আছে পাতালপুর।।
পূবেতে গর্জ্জিল দেওয়া ছুটল বিষম বাও।
কইবা গেল সুন্দর কন্যা মন-পবনের নাও।।"

গ. কঙ্ক ও লীলা পালায় দেখা যায় লীলা কঙ্কের বিচ্ছেদে আহার নিদ্রা ত্যাগ ক'রে অবশেষে শয্যাশায়ী হ'ল। এমতাবস্থায় জনরব—

'জনরব এই মাত্র সর্ব্বলোকে বলে।
ডুবিয়া মরেছে কঙ্ক দরিয়ার জলে।।'

এই জনরব শুনেই লীলার প্রাণপাখি পিঞ্জর ত্যাগ করল : "সব আশা মিছারে হইল লীলার প্রাণমাত্র বাকী। / একদিন উইরা গেল পিঞ্জরের পাখী।।" উল্লেখ্য, জয়ানন্দও (চন্দ্রাবতী) শেষপর্যন্ত নদীতেই আত্মবিসর্জন করে।

—এইভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে প্রায় সমস্ত পালাগুলি বাংলার যে ভৌগোলিক অঞ্চলে গ'ড়ে উঠেছে, সেখানকার প্রধান যাতায়াতের পথ নদী ও নৌকা, দ্বিতীয়ত অধিকাংশ পালাগুলির ঘটনাগতিকে কমবেশি নদীই যেন নিয়ন্ত্রিত করেছে, তৃতীয়ত, মানুষের ভাবনা-চিন্তা, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, ও অলঙ্কারউপমা—সমস্ত কিছুর সঙ্গেই নদীর অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক।

অনুরূপভাবে অরণ্য-উদ্ভিজ্জও যেন গীতিকার পটভূমিকাটির অর্পরার্ধ অংশ জুড়ে আছে। নদীর মত এখানেও অরণ্য শুধু জীবন-সংস্কৃতির অঙ্গাঙ্গী নয়, ভাগ্য ও ঘটনাগতিরও নিয়ন্ত্রক। হুমরা বেদের হাত থেকে নদের চাঁদ ও মহুয়া বারংবার এই বনের মধ্যেই আত্মগোপন করেছে। আবার এই বনভূমির অপূর্ব প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে তাদের মিলন হয়েছে। পালাটির অন্তিমে সেই মিলন মেলা চিরতরে ভেঙে যাওয়ার যে বর্ণনা, সেখানে 'বন' যেন বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত :

> "আইজ নিশি থাকরে বন্ধু আমার বুকে শুইয়া।
> আর না দেখিব মুখ পরভাতে উঠিয়া।।
> বনের খেলা সাঙ্গ হল যাব যমের দেশ।
> এই কথা কহি আমি শুনহ বিশেষ।।"

মহুয়া সম্পর্কে তাই বলা হয়েছে : 'সে ব্রাহ্মণ কন্যা শুদ্ধা একব্রতা; সে বেদিয়ার পালিত কন্যা—এই জন্য সে বনে বনামার্জারের ন্যায় ক্ষিপ্র, বিপদে বন্যব্যাঘ্রীর ন্যায় ভীষণ,...'।[৫]

মলুয়ায় নায়ক-নায়িকার প্রথম পরিচয় কদমগাছের নিচে। বিনোদ শিকার (কুড়া) করতে গিয়ে মলুয়াকে পায়, মলুয়াও শিকারের বন্দোবস্ত করেই দেওয়ানের হাত থেকে পলায়ন করে। এই পালার সর্বত্র প্রকৃতি ও নিসর্গ সৌন্দর্যের যে চিত্র আছে তা অনবদ্য। 'কাজলরেখা'য় সন্ন্যাসী প্রদত্ত শুক পাখির নির্দেশে কাজলরেখাকে বনেই আশ্রয় দিতে হয়; তেমন 'দেওয়ানভাবনা', 'কমলা', 'চন্দ্রাবতী' সর্বত্রই অরণ্য-গাছগাছালি নির্ভর মানুষের ছবি;— সর্বত্রই মানুষের সঙ্গে অরণ্য-প্রকৃতির গভীর অন্বয়।

গীতিকার উপমা-অলঙ্কারগুলিও লক্ষ্য করার মত। গীতিকার কবিরা তাঁদের অতি পরিচিত জীবন থেকেই এইসব অলঙ্কার-উপমা চয়ন করেছেন। এর মধ্যে নদী বারংবার উপস্থিত হয়েছে। আছে বাংলার অতি পরিচিত অপরাজিতা, ধুতরা, চাঁপা, রক্তজবা, মল্লিকা—এমনকি মহুয়াফুলও বাদ পড়েনি। (এছাড়া নাম না জানা বনফুল, বৃক্ষ-বৃক্ষলতা ইত্যাদির উল্লেখও নেহাৎ কম নয়।) যেমন— 'শাউনিয়া নদী যেমন কূলে পানি' (কঙ্ক ও লীলা), 'যৈবন আইল দেহে জোয়ারের পানি' (চন্দ্রাবতী) বা ' 'সুন্দর বদন যেন মহুয়ার ফুল' (মহুয়া) ইত্যাদি। এমন বিভিন্ন বিষয় নিয়ে অজস্র অলঙ্কার আছে, কোনো কোনো গবেষক পৃথকভাবে তা নিয়েও বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।[৬]

নদী ও অরণ্যজীবনকে কেন্দ্র ক'রে বাঙালীর বহু আচার-অনুষ্ঠান বা পুজো-

পার্বণ দীর্ঘদিন ধ'রে গ'ড়ে উঠেছে। পূর্ববর্তী সপ্রাণবাদ, ধর্ম ইত্যাদি অধ্যায়ে এ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। এখন নদীকেন্দ্রিক আরও কয়েকটি অনুষ্ঠান, ক্রীড়া ও লোকসঙ্গীতের কথা উল্লেখ করা সমীচীন, সেগুলির সঙ্গে ধর্ম-যাদুর যোগ নেই বললেই চলে। এর মধ্যে দু'একটি উল্লেখযোগ্য। যেমন :

ভাটিয়ালি : ভাটিয়ালি বিশেষ একপ্রকার সুর। পূর্ববঙ্গের ভাটির সময় মাঝি বৈঠা ছেড়ে দিগন্ত প্রসারিত নদী বা হাওয়া (< সাগর)-য় নিঃসঙ্গ অলসভাবে ভেসে চলে। তখন সে ভাটিয়ালি গান করে। অলস-মন্থর এই যাত্রায় মাঝির মনের বিষণ্নতা গানের সুরে ও বাণীতে প্রকাশিত হয়। বিষাদ, বৈরাগ্য ও বিরহই এ গানের মূল সুর। এই বিরহ কখনো লৌকিক প্রেম, কখনো বা অধ্যাত্মপ্রেম থেকে উৎসারিত। বাদ্যযন্ত্রহীন এই গানে কণ্ঠস্বরই অবলম্বন মাত্র। বিস্তীর্ণ নদীবক্ষে বচিত ব'লে এর সুরেও বৈচিত্র্য এবং উচ্চারণে প্লুতস্বর লক্ষ্য করা যায়। একটি গান দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা গেল :

'বন্ধু, কই রইলা রে—
অকূলে ভাসাইয়া, বন্ধু, কই রইলা রে।
লহর দরিয়ার বুকে মইলাম সাঁতারিয়া,
কি দুখ বুঝিবে, বন্ধু, কিনারায় দাঁড়াইয়া।
বন্ধু, কই রইলা রে।
বন্ধুরে কূল নাই কিনারা নাই, উঠছে কত ঢেউ,
এমন নিদানকালে, সঙ্গী নাই মোর কেউ
বন্ধু, কই রইলারে।।'[৭]

ঘাটু :

পূর্ববাংলায় বালিকাবেশী বালককে কেন্দ্র ক'বে রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক বিরহ বিচ্ছেদের একপ্রকার গানই ঘাটু গান বলে পরিচিত। বর্ষাকালে ঘাটে নৌকার পাটাতনের উপর এই গানের আসর বসে, অতঃপর ঘাটে ঘাটে ঘুরে ঘুরে এই গান গাওয়া হয়। এই কারণেই সম্ভবত এব নাম ঘাটু।

নৌকাবাইচ ও সারিগান :

সারিবদ্ধভাবে ব'সে যে গান গাওয়া হয় তাই সারি গান। মূলত পূর্ববঙ্গে নৌকা বাইচ— যা নদীকেন্দ্রিক অন্যতম লোকক্রীড়া,—এই ক্রীড়ানুষ্ঠানেই এর উৎপত্তি ব'লে পণ্ডিতদের ধারণা। সমবেতভাবে দাঁড় টানতে গিয়ে বৈঠার দ্রুত তালে তালে কর্মোদ্দীপনামূলক এই গানের সুর ও বৈশিষ্ট্য ভাটিয়ালির বিপরীত।[৮]

এছাড়া নদীজীবনকে কেন্দ্র ক'রে কতকগুলি বিষয় হল প্রতিমা নিরঞ্জন, মনসা ইত্যাদি দেব-দেবীর ভাসান অনুষ্ঠান, বিবাহ ইত্যাদি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে 'জলভরণ'

প্রভৃতি— যেগুলিকে উপজীব্য ক'রে অনেক ছড়া-গান-ধাঁধা-প্রবাদ রচিত হয়েছে। ইতিহাস ও জীবনযাত্রার কিছু কিছু বিষয়ও এর মধ্যে অনুসন্ধানযোগ্য। যেমন 'সাম্পানগান'।

"চট্টগ্রাম অঞ্চলের সমুদ্রগামী নৌকার নাম সাম্পান। এই সাম্পানে করিয়া চট্টগ্রামের সঙ্গে অকিয়াবের বাণিজ্য চলিত। সাম্পানের মাঝিরা বাণিজ্য ব্যপদেশে দীর্ঘকাল প্রবাস-জীবন যাপন করিত। গৃহে পরিত্যক্তা তাহাদের নবপরিণীতা বধূর অন্তর্বেদনায় এই অঞ্চলের লোক-সঙ্গীত করুণ করিয়া রহিয়াছে।" যেমন—

"অ ভাই, চাঁদমুখে মধুর হাসি।
দেবাল্যা বানাইলি সাম্পানের মাঝি।
বাহার মারি যারগৈ সাম্পানরে।
ন মানে উজান ভাড়ি। ...[৯]

মানবসভ্যতার অনেক বিবর্তন, অনেক উত্থান-পতন অনেক আশাভঙ্গ-ব্যর্থতা-প্রাপ্তির যথার্থ ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে আছে মূক নদী। আর সেই ইতিহাস সরব হয়ে মানুষের এক পুরুষ থেকে অন্য পুরুষে সঞ্চারিত হয়ে চলেছে,—সঞ্চারিত হয়ে চলেছে আবহমান কাল থেকে বয়ে চলা লোকসাহিত্যের মধ্য দিয়ে। লোকসাহিত্যের এই নদী তাই মূক নয়; সে কথা বলে, বারংবার বলে, সত্য বলে। সেই বারংবার বলা সত্যের একটুকরো উদ্ধার ক'রে আমরা আলোচনা শেষ করব। তা হল:

মধ্যযুগে আরাকান জলদস্যুরা নদীপথে নদীতীরবর্তী অঞ্চলগুলিতে হানা দিয়ে আক্রমণ, লুঠতরাজ ও নারীহরণ করত অবাধে। মানুষের সেই যন্ত্রণার প্রকাশ আছে অজস্র গানে। এমন একটি গানের অংশবিশেষ—

আগা নায়ে রিমিঝিমি,
আমার পাছা নায়ে পানি,
    ও — আমি ক্যান্ বা আছলাম নাইতে।
আস্তে আস্তে মা—রো বইঠা,
ওই যে আমার পতির কাঁদন শুনি।
    ও — আমি ক্যান্ বা আইলাম নাইতে।
একো ডুবে দু'য়ো ডুবে তিনো ডুবের কালে,
কোনঠিকার এক ময়ফুল রাজা আস্যা তুল্যা লিলো নায়ে।
    ও — আমি ক্যান বা আইলাম নাইতে।... [১০] (রাজসাহী)

সপ্তম অধ্যায়

জাত ও জাতি

সামাজিক স্তরবিন্যাস (social stratification) পৃথিবীর বহু দেশেই চলে আসছে। যেমন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানব সমাজে একসময় দাস, প্রভু, যাজক, অভিজাত ও জনসাধারণ— এমন বিভিন্ন স্তরবিভাগ ছিল এবং সেই সম্পর্কিত সংবাদ আমরা ইতিহাসে পেয়ে থাকি। এই স্তরবিন্যাস অর্থনীতি ভিত্তিক এবং প্রতিটি স্তরের মানুষের ছিল বিশেষ মর্যাদা (status)। স্তরভেদে মানুষের স্বাধীনতা ও সম্মান ছিল ভিন্ন ভিন্ন।

কিন্তু ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় মানুষের যে স্তব ভেদ, তা মূলত জাতি-প্রথাকে কেন্দ্র ক'রে সৃষ্ট, এই স্তরভেদ অর্থনীতিভিত্তিক নয়। বস্তুত ভারতের জাতি-প্রথা ও তার বিশিষ্টতা পৃথিবীর অন্যত্র বিরলদৃষ্ট।

পর্তুগীজ 'casta' (অর্থ বংশ, প্রজাতি ইত্যাদি) শব্দ থেকে ইংরাজি প্রতিশব্দ 'caste' শব্দটি নিষ্পন্ন—যা আমরা ভারতীয় 'জাতি' বোঝাতে ব্যবহার কবি; এই জাত বা জাতির সংজ্ঞা নির্ণয় করতে গিয়ে বহু নৃতাত্ত্বিক বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন— তবুও বিতর্ক অবসিত হয়নি। সুতরাং আমরা সেই দুরূহ প্রয়াস থেকে বিবত থেকে, নৃবিজ্ঞানী এ. ডবলিউ গ্রীন, হারবার্ট রিসলে, ধীরেন্দ্রনাথ মজুমদার, এ. কে. দত্ত— প্রমুখের সংজ্ঞা থেকে যে বক্তব্য পেশ করতে পারি তা হল:

বৈদিক যুগের চতুর্বর্ণ প্রথাকে অবলম্বন করে গঠিত ও বর্ধিত, বিশিষ্ট পেশার অধিকারী ও উচ্চ-নীচ মর্যাদাসম্পন্ন অন্তর্বিবাহকারী বহু পরিবার ও দলের গোষ্ঠী, যারা পিতৃতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পথে বংশ পরম্পরায় জন্মসূত্রে ঐ পেশার অধিকারী— ভারতীয় সভ্যতার সেই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গবিন্যাসকারী কাবণ বা শক্তিই হল জাত (caste)।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র— এই চতুর্বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ প্রথম এবং প্রধান বর্ণ, সমাজে শীর্ষস্থানীয়। ব্রাহ্মণের কাজ পুজো-অর্চনা ও অধ্যয়ন অধ্যাপনা করা। তার পরেই ক্ষত্রিয়র স্থান। এঁদের কাজ রাজ্য শাসন, রাজ্যরক্ষা, যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা ইত্যাদি। অতঃপর তৃতীয়ত, বৈশ্য। কৃষিকার্য, কারুশিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদিতে এঁরা অংশগ্রহণ করে থাকেন। বলা বাহুল্য ক্ষত্রিয়ের পরেই বৈশ্যর স্থান। সবশেষে চতুর্থ বর্ণ হল শূদ্র। পূর্বোক্ত তিন বর্ণকে এঁরা বিভিন্নভাবে সেবা করতেন। এই চারটি বর্ণের সংমিশ্রণেই বিভিন্ন জাতির উদ্ভব।

এই বিভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা। তা সত্ত্বেও সনাতনকাল ধরে এই বিভিন্ন জাতির সহাবস্থান। উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ, —এমনকি অস্পৃশ্যতা থাকলেও প্রত্যেকে একে অপরের উপর গভীরভাবে নির্ভরশীল ছিল। বৃত্তি বা কর্ম নির্দিষ্ট হওয়ায় পারস্পরিক অনিবার্য নির্ভরশীলতার মধ্য দিয়ে যে ভারতীয় সমাজব্যবস্থা

অগ্রসরমান ছিল — তা যে কোন আদর্শ রাষ্ট্র ব্যবস্থার অনুপন্থী। এই কারণেই ভারতের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা একটি দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং ঐ একই কারণে যুগ যুগ ধরে বহু বিদেশী আক্রমণ ও সভ্যতার চাপেও সনাতন ভারতীয় সভ্যতা (যা মূলত হিন্দু সভ্যতা) সহজে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েনি।

কিন্তু ভারতের মধ্যযুগের ইতিহাস একটু ভিন্ন ধরনের ইঙ্গিত দেয়। উচ্চবর্ণের অতি-রক্ষণশীলতা বা গোঁড়ামি, ক্ষমতালিপ্সা ও ব্যভিচার নিম্নবর্ণের মানুষের সুস্থ-জীবন যাপনের পরিপন্থী হয়ে ওঠে। তাই ঐ সময়ে জাতি বৈশিষ্ট্যের স্বদ্বন্দ্ব প্রবহমান ধারাটি ব্যাহত হয় এবং নতুন পথে মুক্ত হতে চায়। ফলে জাতির সংরক্ষণশীলতা কমে যায়। এছাড়া ঊনবিংশ শতকের নবজাগরণ— ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ সমাজকে প্রভাবিত করে, ব্রাহ্মণ্য অনাচার-অত্যাচারের হাত থেকে অত্যাচারিত নিম্ন-জাতির মানুষ মুক্তি পেতে চায়। প্রতিভাবান গুণসম্পন্ন মানুষ তার জাত ব্যবসা বা জাত-কর্ম ছেড়ে, নিছক মানুষ হিসেবে আরো উন্নত কর্মে লিপ্ত হতে থাকেন। আবার দক্ষতাহীনতার কারণে উচ্চবর্ণও নিম্নবর্ণের পেশাকে নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেন। তাই 'মুচি চাষী হইয়াছে, ব্রাহ্মণ ঔষধের দোকান করিতেছে, কায়স্থ, সদগোপ্, উগ্রক্ষত্রিয় কোথায় চাকরি করিতেছে, কোথাও ছুতারেব কারখানা কোথাও জুতার দোকান খুলিযাছে।'[১]

সুতরাং বাংলা লোকসাহিত্য পর্যবেক্ষণ করলে একদিকে যেমন বাঙালির জাতিগত 'রিজিডিটি' ও সংস্কার লক্ষ্য কবা যাবে, তেমনি জাতির পরিবর্তিত চলিষ্ণুতাও (mobility) অদৃষ্ট থাকবে না।

জাত বা জাতির (caste) সামাজিক ও ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য বস্তুত এখনো বহুলাংশেই বজায় আছে। যা পরিবর্তন তা মূলত— অর্থনৈতিক দিকটির মধ্যেই ঘটেছে। সুতরাং আমাদের লোকসাহিত্যেব বিচার বিশ্লেষণে জাতির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলিও বিশেষভাবে স্মর্তব্য।

জাতির সর্বাপেক্ষা বড বৈশিষ্ট্য, জাতি গোষ্ঠীব অন্তর্বিবাহের প্রবণতা। অর্থাৎ এক জাতিব ব্যক্তি স্বজাতির মধ্যেই বিবাহ করে। তা না করলে সমাজ তাকে দোষী সাব্যস্ত করে। প্রতিটি জাতির খাদ্যাভ্যাস ও জীবনচর্যায় মৌলিক পার্থক্য আছে। উচ্চ-জাতি নিম্ন-জাতির স্পৃষ্ট খাদ্যকে গ্রহণ করে না। জাতির এই অধিক্রম (hierachy) বা উচ্চ-নীচভেদ প্রকট হলেও প্রত্যেক জাতি স্বাধীনভাবে আপন আপন কর্মে প্রবৃত্ত থাকত এবং একই পাড়ায কতকগুলি পাড়ায় দলবদ্ধ হয়ে প্রত্যেক জাতি যেমন বসবাস কবত তেমন পরস্পরের মধ্যে প্রীতি-সৌহার্দ্যও বজায় থাকত — এখনো তা বিরলদৃষ্ট নয়। জাতির অধিক্রমে ব্রাহ্মণ সর্বোচ্চে, অতঃপর পর্যায়ক্রমিকভাবে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। যেসব জাতির কাছ থেকে ব্রাহ্মণ জল গ্রহণ করতে পারেন তাঁরা হলেন 'জলচল' আব তা না হলে হয় 'অজলচল' জাতি।

কুল যেমন প্রায় সর্বত্রই জন্মসূত্রে অর্জিত, জাতি সবসময়েই জন্মসূত্রে লভ্য। হিন্দু গোত্রেব মত জাতিরও পিতৃতান্ত্রিক চবিত্র (কুল মাতৃতান্ত্রিক ও পিতৃতান্ত্রিক— দুই-ই হতে পারে।) এবং গোত্রের মত জাতিও সারাজীবন অপরিবর্তিত থাকে।

প্রতিটি জাতির নির্দিষ্ট পেশা থাকায়, প্রত্যেকে শ্রদ্ধার সঙ্গে নিজ নিজ পেশাকে গ্রহণ করত এবং এই কারণে জীবিকার্জনের পথ তাদের খুঁজতে হত না। আবার পেশা নির্দিষ্ট হওয়ায় প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্মে দক্ষ হয়ে উঠত। তবে পেশাগুলির মধ্যেও উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ কিছু ছিল। ময়লা পরিষ্কার — ইত্যাদি কোনো কোনো পেশা নিম্ন- মান দ্যোতক হওয়ায় উচ্চপেশার লোকেরা তাদের এড়িয়ে চলতেন। সমাজের নিম্নমার্গীয় জাতিগুলিরই মূলত এই জাতীয় পেশা ছিল এবং ব্রাহ্মণ বা উচ্চজাতি তাদের স্পর্শ করতেন না — ফলে তাঁরা ছিলেন অস্পৃশ্য।

ভারতে, জাতপ্রথার উদ্ভব এবং বিকাশ সম্পর্কে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বহু নৃবিজ্ঞানী আলোচনা করেছেন এবং মোটামুটি তাঁদের সিদ্ধান্ত ও মতের বিশেষ অমিল নেই।[২]

বৈদিক বা নর্ডিক আর্যরা ভারতে আসার আগে, এদেশে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীর নরগোষ্ঠী (races) ছিল। তারা হল— আল্পীয় আর্য, দ্রাবিড় ভাষাভাষী ভূমধ্য সাগরীয় নরগোষ্ঠী এবং দেশজ অষ্ট্রলয়েড জাতি। আল্পীয় আর্যদের প্রাচীন সাহিত্যে 'অসুর' বলে অভিহিত করা হয়েছে। মধ্যমাকার দ্রাবিড় ভাষাভাষীরা বহির্বাণিজ্য করত, বৈদিক সাহিত্যে তারা 'পণি' বলে চিহ্নিত এবং খর্বাকায় দেশজ অষ্ট্রলয়েড গোষ্ঠীরা প্রাচীন সাহিত্যে 'নিষাদ' বলে চিহ্নিত। সম্ভবত আর্যরা নিজেদের ব্রাহ্মণ, আল্পীয়দের ক্ষত্রিয়, 'পণি'দের বৈশ্য এবং নিষাদদের শূদ্র বলে চিহ্নিত ক'রে চতুর্বর্ণের সৃষ্টি করেছিল। উল্লেখ্য, প্রত্যেক গোষ্ঠীরই আকৃতি, স্বভাবগত ও বর্ণগত পার্থক্য ছিল। এবং সম্ভবত এই কারণেই বর্ণ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, যেহেতু বর্ণের অর্থ রঙ। ঋক্‌বেদের দশম মণ্ডলের পুরুষ সূক্ত (১০।৯১।২২) এই উৎপত্তি সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করেছে এবং এথেকে এটাও বোঝা যায় এই চতুর্বর্ণ হল অন্তত ঋক্‌বেদের সময়কার অর্থাৎ আর্যদের ভারতে আসার অনেক পরের ঘটনা, কেননা ঋক্‌বেদ অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন বেদ।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে যুদ্ধবাজ আর্যদের নারী ও সম্পদের অভাব ছিল। তারা যতই পূর্বদিকে অর্থাৎ বাংলাদেশের দিকে অগ্রসর হতে লাগল, ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে ততই সম্পৃক্ত হতে থাকলো। সংস্কৃতি ও রক্তের মিশ্রণ হেতু তারা আর সেই আর্য রইল না, এবং স্বাভাবিক কারণে এই মিশ্রণ অন্যান্যদের মধ্যেও হতে লাগল। যার ফলশ্রুতি হল বিভিন্ন 'জাত' বা সঙ্কর জাতি (caste)-র উদ্ভব, আর সেই সূত্রেই বলা চলে— বর্ণ সম্বন্ধে তখন মানুষের মধ্যে বিশেষ কোনো নিষেধ (rigidity) ছিল না, থাকলে এই মিশ্রণ সম্ভব হত না। এমন কি পরবর্তীকালের অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহের অস্তিত্বও রক্ষিত হত না।

কোন্ কোন্ বর্ণের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে বিভিন্ন সঙ্কর জাতির উদ্ভব হয়েছিল, বিভিন্ন পুরাণ, বৌধায়ন ধর্মসূত্র, জাতিমালা, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, যাজ্ঞবল্ক্য— ইত্যাদি বিভিন্ন জায়গা থেকে তার হদিস পাওয়া যায়। দু-একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে :

ব্রাহ্মণ (পিতা) শূদ্র (মাতা) = নাপিত (পরাশর সংহিতা)
শূদ্র (পিতা) ব্রাহ্মণ (মাতা) = চণ্ডাল (মহাভারত)
শূদ্র (পিতা) ক্ষত্রিয় (মাতা) = তন্তুবায় (বৃহদ্ধর্মপুরাণ) ইত্যাদি

এই চতুর্বর্ণসমূহের মধ্যে বা তার বিভিন্ন সঙ্কর জাতির মধ্যেও কঠোর অন্তর্বিবাহকারী গোষ্ঠীর (rigid endogamous groups) মনোভাব বা প্রবণতা ছিলনা। বস্তুত তখন পদাধিকার-ঘটিত বৃত্তি পার্থক্যের নিরিখেই সমাজভেদ ছিল, আবার পালযুগে বৌদ্ধধর্মের প্রসারে জাতি-ধর্মের মেলামেশার প্রবণতা আরো বৃদ্ধি পেয়েছিল, তখন বহু সংকর জাতির সৃষ্টি হয়েছিল। পরবর্তীকালে সেনরাজাদের সময়ে (১১৬০-১২২৮) পুনরায় ব্রাহ্মণ্য র্ম প্রতিষ্ঠিত হলে জাতিভেদ ও তজ্জনিত গোঁড়ামির (rigidity) সৃষ্টি হয় — উচ্চ-নীচ ভেদজ্ঞান তীব্র আকার ধারণ করতে থাকে এবং সেই সঙ্গে আরো বহুবিধ জাতির সৃষ্টি হতে থাকে — যেমন নবশাখ বিভাগ, শাকদ্বীপী বিভাগ ইত্যাদি। এছাড়া এই সময় থেকেই বাংলার সমস্ত সংকর জাতি মূল তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত হয়— উত্তম সংকর, মধ্যম সংকর এবং অন্ত্যজ। উত্তম সংকরের মধ্যে কয়েকটি জাতি যেমন— কুম্ভকার, তন্তুবায়, কর্মকার, নাপিত, মালাকার ইত্যাদি। মধ্যম সংকরের মধ্যে রজক, স্বর্ণকার, ধীবর ইত্যাদি এবং অন্ত্যজ'র মধ্যে চণ্ডাল, চর্মকার ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।[৩] লক্ষণীয়, এই সমস্ত জাতির নামকরণ হয়েছে মূলত তাদের বৃত্তির ভিত্তিতে। আসলে এ থেকে বোঝা যায় এই নামকরণের অন্তরালে একটি ট্রাডিশন কাজ করে গেছে, যা পূর্বের বৃত্তি বা পেশাভিত্তিক জাতি-বিভাগকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।

সামাজিক মর্যাদার দিক থেকে ভেদাভেদ থাকলেও প্রত্যেক জাতি পরস্পরের উপর বিশেষভাবেই নির্ভরশীল ছিল, কেননা প্রত্যেক জাতি নিজ নিজ বৃত্তিকেই গ্রহণ করতো— যাকে অন্যভাবে বলা যায় 'জাত-ব্যবসা'। আর পারস্পরিক এই অপরিহার্যতার কারণে বিভিন্ন জাতি নিয়ে এক একটি গ্রাম গড়ে উঠত। বাংলা লোকসাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতিব এই অপরিহার্যতার বিষয়টি প্রচ্ছন্ন থাকেনি। বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান ছাড়াও, নিত্যদিনের প্রয়োজনে মানুষকে বিভিন্ন জাতির দ্বারস্থ হতে হত। বাংলা লোকসাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগ থেকে আমরা সেইসব উদাহরণই সন্ধান করব।

লোকসঙ্গীত :

দেশে ক্যানেল কাটা হলে তা যেমন কৃষকের সুযোগ-সুবিধের কারণ হয়ে উঠেছিল, তেমন সমস্যাও সৃষ্টি করেছিল। ক্যানেল কাটার সেই ক্ষতিকর দিকটি নিয়ে রচিত একটি লৌকিক পাঁচালিতে বিশেষ বিশেষ 'পাড়া'র কথা আছে— যা বন্যা প্লাবন থেকে রেহাই পায়নি :

'কেঁচুনে কোরগাঁ ঘোষপাড়া ছিল সালিন্দের বিলে সাহারা,

টিয়া বরুট বদ্যিপাড়া গেলরে ভেসে।'

ঘোষ পদবীধারী জাতি মূলত দুগ্ধ এবং দুগ্ধজাত দ্রব্য প্রস্তুত করেন। পক্ষান্তরে বৈদ্য বা বদ্যি জাতির পেশা ভেষজ চিকিৎসা করা। প্রতিটি গ্রামে বিভিন্ন জাতির বাস। কিন্তু তারা সাধারণত ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকেন না, এক একটি জাতের মানুষেরা দলবদ্ধভাবে গ্রামের এক একটি দিকে বাস করতেন। আর সেই কারণে পাড়া ছিল জাতিভিত্তিক।

বন্যার ভয়াবহতা ও ক্ষয়-ক্ষতি নিয়ে রচিত আর একটি পাঁচালিতে (লৌকিক) প্রাসঙ্গিকভাবে আধুনিকতার ছোঁয়ায় সনাতন সমাজ ও প্রচলিত নিয়মকানুনগুলি ভেঙে যাচ্ছে বলে ক্ষোভ প্রকাশিত হয়েছে, ব্যঙ্গ করে তাই বলা হয়েছে —

'জাতির বিচার আচার ব্যবহার চলবে নারে, ভাই।
হাড়ি মুচি কায়েত ধোপা এক হতে সব চাই।'

বিভিন্ন জাতির সামাজিক মর্যাদার ভিন্নতা যুগধর্মের প্রবণতার কারণে বিলীন হচ্ছে। ফলে সামাজিক সংস্কারের বশীভূত প্রাচীনপন্থী লোক কবির অনিবার্য ক্ষোভ ও বিস্ময় প্রকাশিত হয়েছে পংক্তিদ্বয়ের মধ্যে।

বস্ত্রবয়ন তাঁতির জাত-ব্যবসা। বস্ত্রের জন্য স্বভাবতই গ্রামের মানুষ তাঁতির উপরেই নির্ভর করত। তাঁতিরাও দলবদ্ধভাবে বাস করতেন — সমজাতির মানুষেরা এইভাবেই 'পাড়া' সৃষ্টি করত। নিম্নলিখিত গানটিতে 'কুলি মুড়া' সেই ইঙ্গিত বহন করছে এবং 'নীল শাড়ীর' বায়না তাই প্রকারান্তরে তাঁতির কাছেই—

'কুলি মুড়ায় তাঁতির ঘর কাপড় বুনে ছর ছর।
শুন্, তাঁতি, বলে দিবে তাঁতনকে,
নীল শাড়ী চরখায় বুনিতে।'

বাউল গানেও বিভিন্নভাবে জাতের প্রসঙ্গ এসেছে। বাউলের কোনো জাত নেই। তবু জীবনের স্বাভাবিক বিষয়গুলিই বাউলগানে রূপক-উপমা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে:

'আমি যদি পাপ না করি, কে ডাকিবে তোরে,
নীরাগীরে বৈদ্য বড়ী খাওয়াইতে নারে।'

বা—

'তুমি হও রোগীর ব্যাধি, তুমি বৈদ্যের ওষুধী।'

চিকিৎসা ও ঔষধ প্রস্তুত বৈদ্যেরই একচেটিয়া বৃত্তি ছিল। এই পংক্তি তারই প্রমাণ।

চর্মদ্রব্য নির্মাণ এবং জুতো প্রস্তুত করার অধিকার ছিল একমাত্র চর্মকারের। কিন্তু বাউল জাত মানেন না। সামাজিক দিক থেকে মুচির মর্যাদা নিম্নমানের দিকে,

নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিতে তারই ইঙ্গিত —

'দেশে রামদাস মুচি ছিল সাধনে তার বুদ্ধি সিদ্ধি হৈল
ও আমি শুনি গুরুর ঠাঁই।'

বিভিন্ন নিত্য প্রয়োজনীয় লৌহদ্রব্য নির্মাণের অধিকার ছিল কামারের। এ ছাড়া লাঙলের ফলা ইত্যাদি তাদের দ্বারাই নির্মিত হত, কাজেই কামারের কথা লোকসাহিত্য কোনোভাবেই এড়িয়ে যেতে পারে না :

'ফাল থাকল কামারের বাড়ী বলদ থাকল গাভীর পেটে।
কিষাণের জনম না হৈতে তার পান্তা গেল মাঠে।'

চণ্ডাল অন্ত্যজ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এবং তাঁরা, অজলচল সম্প্রদায়ের মধ্যে পড়েন। কাজেই ব্রাহ্মণের কাছে চণ্ডাল অস্পৃশ্য। বিরোধ অলঙ্কারে এই সত্যই নিম্নলিখিত পংক্তিতে ব্যক্ত হয়েছে :

'চণ্ডালে রাঁধিয়ে অন্ন ব্রাহ্মণে খায়'

চুল দাড়ি কামানো নাপিত জাতির জাতিগত বৃত্তি। সুতরাং প্রত্যেকের কাছেই তার গুরুত্ব। এছাড়াও, শ্রাদ্ধ এবং বিবাহ ইত্যাদি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বা যেকোনো মাঙ্গ লিক লৌকিক অনুষ্ঠানে নাপিতের অপরিহার্যতা। নিম্নলিখিত বিবাহের গানটি নাপিতের ক্ষৌরকর্ম অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র ক'রেই রচিত —

'আমার সোনার চাঁদকে কামাইতে, নবদ্বীপের নাপিত আইসাছে।
হাত ভালা কামাও, নাপিত, হাতের দশ নৌখ রে।
পাও ভালা কামাও, নাপিত, পায়ের দশ নৌখরে।
মুখ ভালা কামাও, নাপিত, পূর্ণিমার চান্দ রে।
মাথা ভালা কামাও, নাপিত, ডাব নারিকেল রে।
ভালা কইরা কামাইলে, পাইবে জমি বাড়ী রে।
ভালা না হইলে, নাপিত, খাইবে জুতার বাড়ি রে।'

নাপিত জাতির অন্যতম পদবি শীল—

'বসাইয়া রামেরে — ডাক দাও শীলেরে,
কামাইতে রামের হাতে।'

বিবাহের সময় স্নানের অনুষ্ঠানে গীত মহিলাদের একটি গানের অংশবিশেষ

'বাদ্যকর ডেকে আনরে, ধোপার ছেলে ডেকে আন,
ছুতারের পিঁড়ি আন, নব গঙ্গার জল আন।'

অনুষ্ঠানে ঢাক-ঢোল বাজানোর অধিকার বাদ্যকারের। কাপড় কাচার অধিকার ধোপার, কাঠের বস্তু-সামগ্রী তৈরির অধিকার ছুতোরের, এখানে আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ায় এঁদের উপস্থিতি অপরিহার্য। অর্থাৎ এ থেকে বোঝা যায় উৎসবে বিভিন্ন জাতির মধ্যে যথেষ্ট সম্প্রীতি বজায় ছিল।

বিবাহের সময় ব্যবহৃত বিশেষ বস্ত্র 'জোড়'-এর কথা বলতে গিয়ে তাঁতি উচ্চারিত হয় সমভাবে —

'তোমার তাঁতিয়ার জোড় দিয়া রাম সাজাইতে জান না'

অথবা

'একে রামের চিকন মাঞ্জা, তাইতে শোভা করে তাঁতির জোড়।'

বা ফুলের সঙ্গে মালীর—

'তোমার মালীয়ার পুষ্প দিয়া, রাম সাজাইতে জান না।'

লৌকিক মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে নাপিতের গুরুত্ব যে কতখানি তা বোঝাতে একটি গোর্বচনের গান লক্ষ্য করার মত :

'চন্দ্র সূর্য দেবগণ, চিন্তাযুক্ত হৈল মন।
না হইলে নাপিতের জন্ম, শুদ্ধ হয় না কোন কর্ম।
বেদে আছে বিধি নাই, চল যাই ব্রহ্মার ঠাঁই।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, সূর্যদেবে দিল বর।
সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা যিনি, নাপিত সাজিলেন তিনি।
নাভিতে নাপিতের জন্ম হইল, শিলাতে নিয়া রাখিল।
অষ্ট অঙ্গ শুদ্ধ হইল, কুলশীল নাম থুইল।' ...ইত্যাদি

ব্রাহ্মণের পৈতে থাকা অপরিহার্য, গানে সেই প্রসঙ্গও বাদ যায়নি—

'ব্রাহ্মণের পৈতা শোভা, যোগীর শোভা জটা'

অনেক সময়েই সমাজের উচ্চ-মর্যাদাসম্পন্ন জাতির কোনো কোনো মানুষ মর্যাদা ও ক্ষমতার জোরে বিভিন্নভাবে কম মর্যাদাসম্পন্ন মানুষকে বা দরিদ্র জাতিকে বিভিন্ন প্রকারে শোষণ করে আসে, নিজের হীন স্বার্থকে চরিতার্থ করতে তারা কোনো ন্যায়-নীতিকে গ্রাহ্য করেন না। এমন কি তাঁরা তাদের যথাযোগ্য আচরণও পালন করেন না। নিম্ন জাতির প্রতি উচ্চ জাতির এই শোষণ ও লাঞ্ছনায় অনেক নিম্নবর্ণের হিন্দু শেষপর্যন্ত মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন তা কারোর অবিদিত নেই। বস্তুত বেশিরভাগ বাঙালী মুসলমান আসলে ধর্মান্তরিত মুসলমান। উচ্চজাতির এই ব্যভিচার ও শোষণ লোকগানে প্রতিবাদের রূপ নিয়েছে; এমন একটি উদাহরণ—

'বলি ও কলির ব্যবহার বলব কি আর,
কলির শেষে হবে দেশে ব্রাহ্মণ চেনা ভার ...

....
হিন্দু হয়ে নাপিত না পান, কাল যদি হয় সে মুসলমান,
সোজা হয়ে দিবে কামান পেতে দিয়ে ঘাড়।
সমাজপতি যত হিন্দু, বিচার তাদের নাই এক বিন্দু,
সেই দোষে শুকালো সিন্ধু, নদী তো কোন ছার।'

(বোলান)

বিবাহ অনুষ্ঠানে কন্যার বাড়ি 'তেল-কাপড়' আসলে গান হতে পারে। এমন একটি গানে বিভিন্ন দ্রব্যের সঙ্গে তৎ সংশ্লিষ্ট জীবিকা নির্বাহী মানুষের কথাও উক্ত হয়েছে—

'আনন্দে মাতিল সর্বপুরী।
চল রঙ্গ দেখি, সহচরী।
মৎস্য আইছে ভারে ভারে, জালুয়া সহকারে
ঝাঁকায় ঝাঁকায় পূর্ণ করি,
তৈল কাপড় আইস্যাছে ঋষির বাড়ী।
দধি আইছে ভারে ভারে, গোয়ালা সহকারে ...

শঙ্খ আইছে ভারে ভারে, শঙ্খারু সহকারে ...

শাড়ী আইছে ভারে ভারে, তাঁতিয়া সহকারে ..

পান আইছে ভারে ভারে, বারুই সহকারে ...
তৈল আইছে ভারে ভারে, কুলুয়া সহকারে ...

সামাজিক মর্যাদার দিক থেকে বিভিন্ন জাতের হেরফের থাকলেও অপেক্ষাকৃত নিম্ন মর্যাদার জাতিদের মধ্যে সাধারণত হীনমন্যতাবোধ থাকত না। উচ্চ জাতিকে সম্মান দেওয়ার বিষয়টি সংস্কারের মধ্যে চলে আসত। কিন্তু নিম্নজাতিকে হীন বলে উল্লেখ করা বা জাত তুলে গালি দেওয়া ছিল অত্যন্ত অসম্মানজনক এবং আপত্তিকর। একটি ব্যঙ্গ গান উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপিত হতে পারে—

'জাত তুলে গাল দিও না গো ও ময়রা খুড়ো,
স্বীকার করে নিচ্ছি, চাচা, তুমি মাথার চুড়ো।' ইত্যাদি

(ব্যঙ্গ গান)

(১৬) 'বর্ধনকুটীর রাজা আইল মনে হয়া হৃষ্ট
সুমঙ্গল রাজা আইল কুলীনের শ্রেষ্ঠ।'

(লৌকিক পাঁচালি)

গুপ্তযুগে (৩২০-৪৬৭ খ্রীঃ পর্যন্ত) উত্তর ভারত থেকে দলে দলে ব্রাহ্মণরা বাংলায় এসে বসবাস করতে শুরু করেন এবং তাঁরা সামাজিক প্রতিষ্ঠা পান। পরবর্তীকালে এরাই 'সপ্তশতী' বা 'সাতশতী' ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত হন। এঁদের মধ্যে যাঁরা রাঢ় দেশে বসবাস করছিলেন তাঁরা সাতটি গোত্রে বিভক্ত ছিলেন এবং বরেন্দ্রদেশে বসবাসকারী ব্রাহ্মণরা পাঁচটি গোত্রে বিভক্ত ছিলেন। গুপ্তযুগের পর পালযুগে বৌদ্ধধর্মের প্রসার ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। ফলে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি বস্তুত চাপা পড়ে ছিল। পরবর্তীকালে, সেন রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হলে— বিশেষত বল্লান সেনের সময়ে (১১৬০-১১৭৬) পুনরায় ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত হয় — কেননা সেনরাজারা ছিলেন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের গোঁড়া পৃষ্ঠপোষক। বাংলায় নানা শ্রেণীর ব্রাহ্মণেব অস্তিত্ব থাকায় (যেমন রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বৈদিক, শাকদ্বীপী প্রভৃতি) বলা হয় বল্লাল সেন মুখ্য এবং প্রধান ব্রাহ্মণদের 'কুলীন' বলে চিহ্নিত করেন। তেমন ঐতিহাসিক প্রমাণ না থাকলেও বলা হয়ে আসছে যে তিনি পাঁচটি গাঁইকে (লাহিড়ী, বাগচী, মৈত্র, সান্যাল ও ভাদুড়ী) কুলীন বলে স্বীকৃতি দেন। যদিও এ যুগে 'মুখ্য কুলীন' বলে চিহ্নিত ছিলেন— বন্দ্যো, চট্ট, মুখোটী, ঘোষাল, পতিতুণ্ড, গাঙ্গুলী, কাঞ্জিলাল এবং কুন্দলাল। এছাড়া রায়ী, গুড় মাহিন্ত, কুলভী, চৌতখণ্ডি, পিপ্পলাই, গড়গড়ি ইত্যাদি ছিলেন গৌণকুলীন।, জাতিভেদে সর্বাপেক্ষা বেশি সামাজিক মর্যাদাভোগী এই কুলীনেরা।[৪]

কুলীন সমাজের চোখে বিশেষ সম্মানীয় হলেও পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণের সংখ্যা বৃদ্ধি, পরিবর্তিত সমাজ প্রতিবেশ, সংস্কার বা আচার সর্বস্বতা, অজ্ঞানতা— ইত্যাদির কারণে অপেক্ষাকৃত নিম্নজাতির গরিষ্ঠ-সংখ্যক মানুষ তাদের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। আর লোকসাহিত্যের বিভিন্ন আঙ্গিকে কুলীন সম্পর্কে মানুষের ঐ মিশ্র ধারণা প্রতিফলিত হয়েছে। উপর্যুক্ত দৃষ্টান্তে রাজা কুলীন শ্রেষ্ঠ বা মুখ্য কুলীন বলে বিশেষ শ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয়েছে।

কুলীন ব্রাহ্মণ সন্তান বহু বিবাহ করত। এমন কি নিম্নজাতির মেয়েকে বিবাহ করা তাদের কাছে অশাস্ত্রীয় ছিল না। (পক্ষান্তরে কুলীন কন্যাকে কুলীন বংশেই বিবাহ করতে হত)। পরবর্তীকালে অর্থাৎ উনিশ শতকে, বহুবিবাহ আইন ক'রে বন্ধ করার পর এবং নবজাগরণের ফলে মানবিকতার বাতাস ছড়িয়ে পড়ায় ব্রাহ্মণ সন্তানের বিবাহ ব্রাহ্মণ বংশেই হতে লাগল। অর্থাৎ পুনরায় জাতির মধ্যে বিবাহ-সংক্রান্ত বিধিনিষেধ সৃষ্টি হ'ল। ফলে অসবর্ণ বিবাহ মানুষের চোখে নিন্দনীয়। বিশেষত কুলীন ব্রাহ্মণের এই প্রকার বিবাহ নিন্দনীয় বলে পরিগণিত হল। নিম্নলিখিত ব্যঙ্গ গানে তাই চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে—

'কি খিটকাল করলাম রে, পাকিস্তানের মেয়ে বিয়ে করে।
আমি যে কুলীনের ছেলে একথা বলবো কাহারে।'

মানুষের অন্তর্জগতের আনন্দ-বেদনা-ক্ষোভ ইত্যাদি ব্যষ্টিগত বা সমষ্টিগত যাই হোক

না কেন, লোকসঙ্গীতের মধ্যে তা প্রকাশ পায়; কখনো সহজভাবে উঠে আসে, কখনো তার প্রকাশভঙ্গী হয় তির্যক, পূর্বে উদ্ধৃত লোকসঙ্গীতগুলিতে তা আমরা দেখেছি। সুতরাং মানুষের ব্যক্তিজীবন ও সমসাময়িক সমাজ জীবন লোকসঙ্গীতের মধ্যেই সর্বাপেক্ষা বেশি প্রতিফলিত হয়—বিশেষত তাতে যদি ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ ও মানবেতিহাসের অজস্র মূল্যবান স্বর্ণকণা খুঁজে পাওয়া যায়—তাও কারোর অবিদিত নয়। কিন্তু ধাঁধা প্রবাদ লোকসাহিত্যের এমন কতকগুলি প্রকরণে ছড়া, লোকসঙ্গীত বা লোকনাট্যের মত চলিষ্ণুতা (mobility) তুলনামূলক ভাবে বহু সত্য ও অসঙ্গতি কখনো অকপটভাবে কখনো বা তির্যকভাবে ধর্ম রচনায় জাত, জাতব্যবসা ও জাতিবৈশিষ্ট্য অনুল্লিখিত থাকে না। যেমন—

(ক) ধাঁধা

ক্ষৌরকর্ম নাপিতের জীবিকা। তাই নিয়ে ধাঁধায় বলা হয়েছে—

ঢাকা জেলায় বাড়ি তোমার কাজী বাড়ির কাছে
অনুমানে বোঝা যায় ক্ষুরের কারবার আছে। (ঢাকা)

পরামাণিকের ক্ষুরও ধাঁধার উপজীব্য হয়—

উপর হতে পইল্ ছুরি/ল্যাত কাটা লেইল্ আঠারো কুড়ি।
(জলপাইগুড়ি)

কলুর বৃত্তি তেল প্রস্তুত করা/কলুর মেয়ে তার বংশ ও বৃত্তির পরিচয় দিতে গিয়ে তাই বলে—

বৃষ্টি নাই ঘর ঘর করে নদীনালা নাই স্রোতে ধারা বয়,
এই কুলের কন্যা আমি দিলাম পরিচয়।
মেয়েটির বংশ কি? (ঢাকা)

শিবের গাজন উপলক্ষে প্রশ্নোত্তর মূলক ধাঁধায় ঢাকের জন্ম কথা বলতে গিয়ে কামার, ছুতোর মুচি প্রভৃতি বৃত্তিধারী মানুষের কথা আসে—

বাঁধন : ঢাকি ভায়া ঢাকি ভায়া ঘন নাড় মাথা
সত্যি করে কন্ ঢাকি তোর ঢাকের জন্ম কোথা?
কাঁটন : সীতা অন্বেষণে হনু গেলেন লঙ্কায়।
তথায় পেলেন হনু।। আম্রের সন্ধান।।
সেই আম্র খেয়ে হনু আঁটি ফেলে ক্ষেতু।
সেই থেকে বাংলা মুল্লুকে হল স্থিতু।।
যাইতো যাই আমরা কামার বাড়ি যাই।
কামার বাড়ির কাটিকুটি ছুতোর বাড়ি কুঁদি।।
সেই কুঁদি লয়ে আমরা গেলাম মুচি বাড়ি।
বাঁয়েতে ছাগলের চামড়া, ডাইনে পরিপাটী।।
ঢাকের জন্ম কয়ে দিলাম, ভাই, ঢাকের মান কাটি।'

এমনই বিবাহাচার মূলক আসর বন্দনার ধাঁধায় কুল, জাত ও বর্ণ

প্রসঙ্গ :

প্রশ্ন : "... জল গ্রহণ করিয়াছ কাহার তুমি ঝি ?
কুলে বট উত্তম বর্ণ জাইতে বট কি?

উত্তর : "... জল গ্রহণ করিয়াছি জগন্নাথ মাহাতোর ঝি
জাতে বটি কুড়ুম মাহাতোর কুলে পাশরিয়া।" (আংশিক)

আবার অন্যান্য বিষয়কে উপজীব্য ক'রে রচিত ধাঁধার মধ্যে স্বভাবতই জাত বা বৃত্তির প্রসঙ্গ সহজভাবেই আসে। যেমন চিংড়িমাছ নিয়ে একটি ধাঁধা—

'জলেতে জন্ম যার জলে ঘর বাড়ি
ফকির নহে ওঝা নহে মুখে আছে দাড়ি।
খোদার নিবন্ধি এক খড়গ আছে,
কামার নহে কুমার নহে হাঁড়াস ধরে রাখে।' (কুষ্টিয়া)

তেমন চরকা ও সুতো কাটার বিষয়কে উপজীব্য ক'রে রচিত ধাঁধায় পৈতে বা বামুনের কথা থাকে—

ভন্ ভন্ করছি ভোমরা নই,
পৈতা আছে, বামুন নই। (পুরুলিয়া)

(খ) প্রবাদ :

বিভিন্ন জাত ও তার বৃত্তিকে উপজীব্য ক'রে বহু প্রবাদ সৃষ্টি হয়েছে। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রবাদের বৈশিষ্ট্যানুযায়ী তার প্রকাশ ভঙ্গীই যে তির্যক তা নয়, বৃত্তিধারী বা তার চরিত্র বৈশিষ্ট্যকে তির্যকভাবে আক্রমণ করা হয়েছে। যেমন—

তাঁতী : তাঁতী রাগে কাপড় ছেড়ে,/আপন ক্ষতি আপনি করে।
জেলে : খাচ্ছিল তাঁতী তাঁত বুনে/কাল করল এঁড়ে বাছুর কিনে।
ছুতোর : ছুতোরের তিন মাগ ভানে কাটে খায়।
তত তার থাকে নাক যত তার যায়।।
গোয়ালা: আশী বছরেও গোয়ালা সাবালক হয় না।
চাষা : চাষা কি জানে কর্পূরের গুণ।
শুঁকে শুঁকে বলে সৈন্ধব নুন।।
কলু : কলুর ছেলে, গয়লার গাই, গৃহস্থকে পুষতে নাই।
বিভিন্ন : ধোপা, নাপিত, কুমার কামার
যে বিশ্বাস করে সেও চামার।

বিভিন্ন বর্ণ, জাত ও তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য প্রবাদের উপজীব্য :

ব্রাহ্মণ : বামুন, বাদল, বাম-দক্ষিণা পেলেই যান
বামুন, বাকশ, বাঁশ-তিনে বাস্তু নাশ।
কায়স্থ : কায়েতের বুদ্ধি আঁতে, / বানরের বুদ্ধি দাঁতে।
কলমে কায়স্থ চিনি গোঁফে রাজপুত।
চিকিৎসক চিনতে পারি, যার ঔষধ মজবুত।।

বাগ্দি : এক কলসী জল তুলে কাকালে দিলে হাত।
এই মুখে খাবে তুমি বাগ্দিনীর ভাত।।

শূদ্র, বামুন
ইত্যাদি : কালা বামুন, কটা শূদ্র, বেঁটে মুসলমান,
ঘর জামাই, পোষ্য পুত্র পাঁচ জনই সমান।।

মানুষের জাত ব্যবসা ও জাত সংক্রান্ত ধ্যান-ধারণা—
জাত ব্যবসা নবের ভূসা, আর সব ফাসাফুসা।
জাতও গেল, পেটও ভরল না। [৬]

—এমন দৃষ্টান্তেব অভাব নেই। সুতরাং অন্য প্রসঙ্গে যাওয়া যাক।

রূপকথা, উপকথা বা পশুকথায় এই জাতবর্ণ ও তৎশ্লিষ্ট বৃত্তির উল্লেখ বহুল। তাঁতী, কামার কুমোর, ব্রাহ্মণ বৈদ্য, জেলে, নাপিত, কর্মকার, চর্মকার, কারোর ভূমিকাই সেখানে কম নয়। পূর্ববঙ্গ-ময়মনসিংহ গীতিকাতেও এই বর্ণ বিভক্ত সমাজের ছবি আছে;—আছে জাত-বর্ণ-কর্ম সংক্রান্ত বিভিন্ন অভ্যাস রীতি-নীতি ও দায়বদ্ধতার কথা।

যেমন 'মলুয়া' গীতিকায় দেওয়ানের গৃহ থেকে প্রত্যাবর্তন করলে ভাগ্নে-বৌ এর হাতে বিনোদের মামা ভাত খেতে চায় না, কারণ মুসলমানের স্পর্শে মলুয়ার জাত গিয়েছে ব'লে তার ধারণা। তার নির্দেশে এই জন্য বিনোদকে প্রায়শ্চিত্ত ক'রে মলুয়াকেও ত্যাগ করতে হবে : ''জাতিতে উঠুক বিনোদ পরাচিত্তি করি।'' শেষপর্যন্ত বিনোদ 'ব্রাহ্মণের পাতি দিয়ে' বিনোদকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হল। মামার কথা বিনোদকে রাখতেই হয় কেননা 'বিনোদের মামা সে যে জাতিতে কুলীন।/হালুয়া দাসের গুষ্টির মধ্যে সেই ত প্রবীণ।।' 'কঙ্ক ও লীলা'য় পীরের কাছে গোপনে দীক্ষা নেওয়ায় কঙ্কের 'জাতি ধর্ম্ম নাশ হল রটিল বদনাম।' এবং পন্ডিত সমাজ মাথা নেড়ে বলেছিল : ''জ্ঞান মানে নাহি বয়, চণ্ডালের অন্ন খায়'' অতএব কঙ্ককে ঘরে তুললে গর্গেরও জাতি নষ্ট হবে। তাদের বক্তব্য 'অনাচারে জাতি নষ্ট, নষ্ট হয় কুল।' 'রূপবতী' গীতিকায় দেখা যায় রাজচন্দ্র নবাবের হাতে কন্যা সম্প্রদান করতে অপারগ; তাই ধর্ম ও জাত রক্ষার্থে রাজ্যসুখও বিসর্জন দিতে চায় : 'জাতিনাশ ধর্মনাশ বাইচ্যা কাজ নাই।/রাজত্ব ছাড়িয়া চল জঙ্গলাতে যাই'।

এইভাবে জাত ও বর্ণ-প্রথা কিংবা জাতি সংশ্লিষ্ট বৃত্তি ও সংস্কার বাংলা লোকসাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে। লোকসাহিত্যের বিভিন্ন প্রকরণের বাইরেও যে অজস্র উদাহরণ আছে তা বলাই বাহুল্য।

অষ্টম অধ্যায়

কুলচিহ্ন : গোত্র— ইতিহাসের মূক উপাদান

(ক)

মানব সমাজ যূথবদ্ধভাবে বসবাস করে। এই প্রবণতা আদিম মানুষেরও ছিল। ছিল পরিবার গঠনেরও প্রয়াস। সম্ভবত এরই মিশ্র প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্টি হয়েছে কুল বা গোত্র (clan)। বস্তুত কুল শুধুমাত্র 'বন্থ' দল নয়, কুল একপ্রকার সামাজিক সংস্থা। রিভাস, হোবেল, ফ্রস্ট, ওয়েবস্টার, ফ্রেজার— প্রমুখ সমাজ ও নৃবিজ্ঞানীরা কুলের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে যা বলেছেন তা এই যে, কুল হল এক বৃহত্তর বহির্বিবাহকারী সামাজিকমণ্ডলী, যার সদস্যারা এক সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে নিজেদের উদ্ভব বলে মনে করে এবং এই ভিত্তিতেই নিজেদেরকে পারস্পরিক সম্পর্ক যুক্ত বলে মনে করে। নিজেদের ঐ উদ্ভবের বিষয়টি বস্তুত কাল্পনিক।

কুলের ইংরিজি প্রতিশব্দ Clan (ব্রিটিশ), কোনো কোনো আমেরিকান নৃবিজ্ঞানী clan-এর পরিবর্তে 'Sib' শব্দটি ব্যবহার করেন। মাতৃবংশীয় ও পিতৃবংশীয় কুলকে যথাক্রমে 'Clans' ও 'Gens' বলা হলেও সাধারণত 'ক্ল্যান' শব্দটিই বেশি ব্যবহৃত হয়। কুল (clan) এবং হিন্দুদের গোত্র (Gotra) সমার্থক হলেও সূক্ষ্ম একটা পার্থক্য আছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই একটি কুলচিহ্ন (Totem) থাকে, কিন্তু গোত্রের ধারকদের কোন টোটেম থাকে না। দ্বিতীয়ত, কুল মাতৃবংশীয়রা বা পিতৃবংশীয় হলেও গোত্র কেবল পিতৃবংশীয় এবং পিতৃস্থানিক (patrilocal)। বৈদিক যুগের কোনো মুনি ঋষিকে পূর্বপুরুষ ধ'রে নিয়ে, পুরুষানুক্রমে সেই সম্পর্ক ধারা এখানে অনুসৃত হয়। এছাড়া, কুল এবং গোত্রের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য অভিন্ন।

কুল বা গোত্রের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। তার মধ্যে অন্যতম হল— বহির্বিবাহ প্রথা। একই কুল বা গোত্রের নারী পুরুষ তার কুল বা গোত্রেব কাউকে বিবাহ করতে পারে না, কেননা তাদের বিশ্বাস একই পূর্বপুরুষ থেকে তারা উদ্ভূত ব'লে, তাদের সম্পর্ক ভাই-বোনের। হিন্দুদের মধ্যেও একই গোত্রের সাধারণত বিবাহ হয় না। বিবাহের সময় পুরোহিত কন্যার 'গোত্রান্তর' ঘটান। এছাড়া কুল যে পুরুষের অস্তিত্বকে ঘিরে গড়ে উঠেছে, সেই পূর্বপুরুষ মুখ্যত কাল্পনিক। অন্যদিকে কুল একপার্শ্বিব (Unilateral)। অর্থাৎ কোনো কুল কেবল পিতৃপক্ষের আবার কোন কুল কেবল মাতৃপক্ষের পরিবারগুলিকে নিয়ে সৃষ্ট হয়। সুতরাং কুল হয় পিতৃতান্ত্রিক, নতুবা মাতৃতান্ত্রিক। এই ভিত্তিতেই কুলের প্রকারকে দু'ভাবে বিভক্ত করা হয়— মাতৃবংশীয় কুল (matrilineal) ও পিতৃবংশীয় কুল (patrilineal clan)। এছাড়া গঠনগত কারণে কুলের কয়েকটি প্রকার ভেদ লক্ষণীয়। যেমন— (১) পূর্বজকুল (Ancestral clan), বিশেষ এক পিতা বা মাতা থেকে উদ্ভূত কুল, (২) কুলচিহ্নমূলক কুল (to-

temic clan),— বিশেষ একটি কুলচিহ্নকে অবলম্বন ক'রে এবং নিজেদের তার সঙ্গে সম্পর্কিত ক'রে সৃষ্ট কুল, এবং (৩) ক্ষেত্রীয় কুল (territorial clan),— বিশেষ কোনো ক্ষেত্র-স্থান বা লক্ষণের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে যে কুল গড়ে ওঠে।

আমরা আগে উল্লেখ করেছি, মানবসমাজের ধর্ম বিশ্বাসের উৎসভূমিতে জীবাত্মাবাদ, সর্বপ্রাণবাদ, ইন্দ্রজাল প্রভৃতির মতই কুলচিহ্নবাদ (totemism) বিদ্যমান। আমাদের লোকসাহিত্যের আলোচনার ক্ষেত্রে এই কুলচিহ্ন সংক্রান্ত বিষয়গুলি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা অপরিহার্য, কেননা মানুষের বহু সংস্কার বিশ্বাস ও আচার আচরণে এর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব আছে।

আমেরিকার কয়েকটি আদিবাসী গোষ্ঠী ও আন্দামানী ব্যতিরেকে কুল সর্বত্রই প্রত্যেক সমাজে বিদ্যমান। এবং প্রায় সবক্ষেত্রেই প্রতিটি কুলের বিশেষ একটি কুলচিহ্ন বর্তমান। প্রত্যেক কুলের সদস্য তাদের বিশেষ কুলচিহ্নের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে নিজেকে সম্পর্কযুক্ত বলে মনে করে। কোথাও সদস্যরা টোটেমের বংশধর বলে বিশ্বাস করে। কোনো কোনো কুলের সদস্যরা পূর্বপুরুষের সঙ্গে টোটেমের কোনো সম্পর্ক ছিল কিংবা ঐ টোটেম পূর্বপুরুষকে সাহায্য করেছিল এমন ধারণা পোষণ করে। কুলচিহ্নের প্রতি প্রত্যেক সদস্যের গভীর শ্রদ্ধা ভক্তি বিদ্যমান থাকে। কুলচিহ্ন যদি খাদ্য হয় তবে তা গ্রহণ করা ভয়ঙ্কর অপরাধ— এমন কি আঘাত করা বা তাকে অসম্মান করাও সমান অপরাধ বলে গণ্য হয। যদি কেউ কোনো কারণে বা ভ্রমবশত কুলচিহ্নকে হত্যা করে, আঘাত করে বা অসম্মান করে তবে সমাজ,— সেই নির্দিষ্ট কুলের সমাজ দোষীকে শাস্তি দেয় বা কঠিন প্রায়শ্চিত্ত করতে বাধ্য করে। কিংবা বহু ক্ষেত্রে তারা বিশ্বাস করে এই অন্যায়ের ফলে দোষীর কঠিন ব্যাধি এমনকি মৃত্যুও হতে পারে।[১]

কুলচিহ্ন বিভিন্ন প্রকার, যেমন জড় পদার্থ, উদ্ভিদ, পশুপাখি— সবকিছুই হতে পারে। নৃবিজ্ঞানীর ভাষায় —"A totem is generally an animal, more rarely a plant, still more rarely a cosmic body of force like the sun or wind, which gives its name to a class and may be otherwise associated with it."[২]

যুগযুগ ধরে এইভাবে টোটেম কেন্দ্রিক সমাজে যে আচার-আচরণ, বিশ্বাস, সংস্কার চলে আসছে, আজকের সভ্য সমাজেও তার অনেক চিহ্ন আমরা দেখতে পাই। বাংলার হিন্দুদের আচার-আচরণে বা ধর্মসংস্কারে প্রাক্‌হিন্দু সভ্যতার বেশ কিছু লক্ষণ আমরা দেখব, যেখানে টোটেম ঐতিহ্যের সন্ধানও দুর্লভ হবে না। এবং বলা বাহুল্য বাংলার লোকসাহিত্যের ভাণ্ডার থেকেই আমরা তা অন্বেষণ করব।

ভারতবর্ষে হিন্দুদের গোত্র টোটেম থেকেই জাত, আমরা আগেই তার উল্লেখ করেছি। সম্ভবত ধর্মপ্রথার উদ্ভব ও বিকাশের ফলেই টোটেম বৈশিষ্ট্যগুলি ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়ে। আর্যদের আগমনের পূর্বে ভারতবর্ষে গোত্র প্রথা ছিল না বলে নৃতাত্ত্বিকদের মত। বস্তুত 'গোত্রবিভাগটা বৈদিকযুগের একেবারে অন্তিমকালে অথর্ববেদের যুগে প্রথম অবলম্বিত হয়েছিল'।[৩] আর্যপূর্ব সিন্ধু সভ্যতা থেকে প্রাপ্ত বহু

'মুদ্রা'তে বিভিন্ন প্রাণীর মূর্তি খোদিত আছে এবং বোঝা যায় এইসব পশু তাদের কাছে যথেষ্টই শ্রদ্ধার্হ ছিল। ভারতবর্ষে বিভিন্ন আদিবাসী কৌমে এখনো টোটেম বা কুল প্রতীক বিদ্যমান এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে তারা সেইসব টোটেমীয় পশুদের স্মরণ করে।

'গোত্র' শব্দটির সঙ্গে পশুসংক্রান্ত বিষয়ের যোগ আছে। আর্যরা ছিল পশুপালক যাযাবর। কাজেই অনুমান করা যায়, প্রথম অবস্থায় দেশীয় অনার্য মানুষের সঙ্গে মিশে গিয়ে সংখ্যায় ক্রমে বৃদ্ধি পেলে তারা নিজেদের মধ্যে পশুচারণযোগ্য ভূমি বন্টন করে নেয় এবং সেই অনুযায়ী বিভিন্ন আর্যদল নিজেদের চিহ্নিত করে। ক্রমে যতই তারা পূর্বদিকে আসতে আরম্ভ করে অর্থাৎ অনার্য মানুষের সঙ্গে মিশে যেতে থাকে, ততই অনার্য সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ে। ফলে অনার্য কুলপ্রতীক সম্পর্কিত ধারণার রূপান্তর ঘটে 'গোত্র' চিন্তায়। সেই সঙ্গে ঐ মিশ্র জাতির মধ্যে টোটেম সংক্রান্ত প্রত্যক্ষ ক্রিয়াচার লুপ্ত বা রূপান্তরিত হতে থাকে।

বিভিন্ন গোত্রের নামকরণের মধ্যেও সে ইতিহাস প্রচ্ছন্ন আছে। যেমন বাজপাখি থেকে 'ভরদ্বাজ', গুরু থেকে 'গৌতম', পেঁচা (কুশিদ) থেকে 'কৌশিক', কচ্ছপ থেকে 'কাশ্যপ', কুকুর থেকে 'শুনক', মাগুর মাছ থেকে মৌদগল্য ইত্যাদি। আর্যীকরণের ফলে এইসব প্রাণীনাম সংস্কৃত হয়েছে ও প্রাণীর পরিবর্তে একজন মুনির কল্পনা করা হয়েছে। এমনকি বিভিন্ন হিন্দু অবতারও পশুর নামে, যেমন মীন, কূর্ম, বরাহ ইত্যাদি। বেশ কিছু পদবী যা কিনা বংশের পরিচয়বাহী, সেখানেও প্রত্যক্ষভাবে পশুর নাম, যেমন বাগ (বাঘ) সিংহ, হাতী, নাগ ইত্যাদি। সুতরাং এ কথা বলা যায় যে, যেহেতু আর্য অনার্য মিশ্রণে অনার্য সংস্কৃতিই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পরিবর্তিত, বিবর্তিত ও রূপান্তরিত হয়ে নিজেকে প্রবলভাবে বজায় রেখেছে, তাই অনার্য টোটেম বৈশিষ্ট্যও বিলুপ্ত হয়নি, একইভাবে গোত্রের মধ্যে নিজেকে টিকিয়ে রেখেছে।

হিন্দুদের বিভিন্ন দেবদেবীর বাহন হিসেবে টোটেম পরোক্ষভাবে এখনো দেব মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। লক্ষ্মীর পেঁচা, সরস্বতীব হংস, কার্তিকের ময়ূর, দুর্গার সিংহ, গণেশের ইঁদুর— এমন কি এখনো পর্যন্ত ব্রাহ্মণ্য সংস্কার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হননি যে সমস্ত লৌকিক দেবদেবী (যেমন শীতলা, ষষ্ঠী প্রভৃতি) তাঁদের সঙ্গে বিভিন্ন পশুবাহন হিসেবে বিরাজ করে।

এই সমস্ত পশুপাখি যেগুলি অনার্য সমাজে কুলকেতু হিসেবে শ্রদ্ধার্হ ছিল, আর্য অনার্যের সাংস্কৃতিক সংশ্লেষণ ও সংমিশ্রণে তারা দেবতার বাহন হিসেবে দেবত্বপ্রাপ্ত হল, সে বিষয়ে নৃতাত্ত্বিক ও সমাজবিজ্ঞানীবা একমত। তাই বলা যায় এই সাংস্কৃতিক সংশ্লেষণে আর্যসমাজে প্রবেশ করল অনার্য প্রাচীন লৌকিক দেবতাসমূহ, সেগুলি নিম্নকোটির লোকেদের মধ্যে জনপ্রিয় ছিল। অনেক নারী দেবতা এল পুরুষ দেবতার স্ত্রী হিসেবে। তা ছাড়া তাদের বাহন দেওয়া হল। বাহনগুলি আর কিছুই নয়, অনার্য নিম্নকোটির সমাজের কুল প্রতীক মাত্র।[৪]

আবার টোটেম সরাসরি পূজিত হয়েছে কোন কোন ক্ষেত্রে। যেমন সর্প। নাগপূজা মনসাপূজার সঙ্গে সমীকৃত হয়ে গেছে। আমরা অন্যত্র উল্লেখ করেছি যে মাতৃদেবীর

(অর্থাৎ উর্বরাতন্ত্র) বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সর্পপূজা সংযুক্ত হয়ে মনসা এক মিশ্রদেবীতে রূপান্তরিত। আবার চব্বিশ পরগণার ব্যাপক অঞ্চলে থেরিওমর্ফিক রূপেই কুমির পূজিত হয়।

আমরা উল্লেখ করেছি যে সমস্ত টোটেম ভুক্ত মানুষেরা তাদের কুলপ্রতীককে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করে টোটেম, প্রাণী বা গাছ যাই হোক, তাকে আঘাত করে না, অবমাননা করে না, করলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। এছাড়া সমটোটেমের মানুষরা একে অন্যের রক্তপাত করে না এবং যৌন সম্পর্ক বা বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে না। এই সমস্ত নিষিদ্ধ বিষয়গুলি এখনো লক্ষ্য করা যায়। যেমন হিন্দুরা একই গোত্রে বিবাহ করে না। টোটেম— প্রাণীর মতই দেবদেবীর বাহনের অনিষ্ট করে না। যেমন সর্পকে আঘাত করতে নেই বলে তাদের বিশ্বাস। কিংবা মা ষষ্ঠীর বাহন বলে বিড়াল মারতে নেই। 'অরণ্য ষষ্ঠীর ব্রত' কথায় তাই দেখা যায় বিড়াল মারার ফলে সংসারে কি বিপর্যয় নেমে এসেছে এবং তা থেকে মুক্তির জন্য পুজো ও প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছে। তেমনি বাস্তু সাপ ধরতেও নেই। মারা তো ঘোরতর অমঙ্গলজনক। বরং বাস্তু সাপের অনুগ্রহ যাচ্ঞা করা হয়। সাদা পেঁচাই লক্ষ্মীর বাহন। ফলে এই লক্ষ্মীপেঁচা যদি কারোর বাড়ির চালে বসে তবে লক্ষ্মীর অপার অনুগ্রহ বলে তা ধরা হয়।

আদিম নরগোষ্ঠীর সঙ্গে প্রকৃতির ছিল অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক। প্রকৃতি-নির্ভর এই মানুষেরা ঝড়-ঝঞ্ঝা— ইত্যাদি প্রাকৃতিক রোষ থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য যেমন প্রকৃতি অর্চনা করেছিল প্রাথমিক স্তরে, কৃষি কার্য উন্মেষের পূর্ব পর্যন্ত, খাদ্যের দিক থেকে পশু মাংসের উপব নির্ভরশীল হওয়ায় পশুর সঙ্গেই ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। তারা শুধু পশু শিকারই করেনি, পশুকে পোষ মানিয়েছে, প্রতিপালন করেছে আত্মস্বার্থে। ক্রমে সভ্যতার অগ্রগতি ও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পশুর প্রতি কৃতজ্ঞ মানুব নিজ নিজ গোষ্ঠীকে পশুব নামেই চিহ্নিত করেছিল। আবার পশুবৃদ্ধিকারী অদৃশ্য শক্তি বা পশু শিকারের সহায়ক শক্তি— যা আদিতে 'মানা' তা-ই ক্রমে পশুমূর্তিতে (জুয়োমরফিক) পশুদেবতায় রূপলাভ করল সে বিষয়ে নৃতাত্ত্বিকরা একমত। ফলে এইভাবে ধীরে ধীরে টোটেম পশুগুলি শ্রদ্ধার্হ হয়ে উঠলো এবং সার্বিকভাবে শুভাশুভ শক্তির আধাব হিসেবে কল্পিত হল নিঃসন্দেহে, পরে তার মানবমূর্তির (অ্যানথ্রোপোরফমিক) রূপায়ন ঘটল। এই বিবর্তন স্তবের ইতিহাস সংগুপ্ত আছে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের অর্ধপশু অর্ধমানব রূপ দেব বিগ্রহে। এই বিষয়টির প্রতিফলন যেমন রূপকথার 'মৎস্যকন্যা' পরিকল্পনায়, তেমন হোরাস, স্ফীংক্স, নৃসিংহ, গণেশ প্রভৃতি তারই সাক্ষ্য প্রমাণ। পৃথিবীর প্রাচীন যাদুকরের প্রাপ্ত চিত্রটি পশুর মুখোশধারী মানুষেরই মূর্তি,— এবিষয়ে তা স্মর্তব্য।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, যাদু অধ্যায়ে আমরা দেখেছি মুখোশ, লোকনাট্য বা নৃত্যের উৎপত্তির ক্ষেত্রে মানুষের যাদু বিশ্বাস মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিল। তেমন মুখোশ নৃত্য প্রভৃতির উদ্ভব ও বিশেষভাবে বিকাশের ক্ষেত্রে টোটেমের ভূমিকা যথেষ্ট বলা যেতে পারে। কেননা টোটেমের মুখোশ পরে নৃত্যের মধ্য দিয়ে কুলকেতুর আশীর্বাদ প্রার্থনা

করা হয় বা টোটেম সম্পৃক্ত উৎসব অনুষ্ঠানে এভাবে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাও জ্ঞাপন করা হয়। বাংলার ছৌ এর মুখোশে কিংবা এ সাং-এ তারই বিবর্তিত বা বিকৃত প্রতিকৃতি দুর্লক্ষ্য নয়।

রূপকথায় ঐন্দ্রজালিক রূপান্তরে (ম্যাজিক্যাল ট্রান্সফরমেসন) মানুষের পশুতে রূপান্তরিত হওয়া, অথবা রূপকথায় পশুর সঙ্গে মানুষের সখ্যতা প্রভৃতি বিষয়গুলি অনিবার্যতই টোটেম এবং মানুষ ও প্রাণীর নিবিড় সম্পর্কের দ্যোতক। 'পোস্তমণি' গল্পে ইঁদুরের মানুষে রূপান্তরিত হওয়া, 'সর্পকন্যা' গল্পে রাণীর সর্পে রূপান্তরিত হওয়া, 'শিকড়ের গুণ' গল্পে ছোটরাণীর কচ্ছপে রূপান্তরিত হওয়া— এমন অজস্র দৃষ্টান্ত রূপকথায় সহজলভ্য। আবার 'শঙ্খকুমার' গল্পে রাণীগর্ভে শঙ্খের জন্ম, 'বাঁদর স্বামী' গল্পে বাঁদরের সঙ্গে ব্রাহ্মণকন্যার বিবাহ, 'বাঘের সাধ' গল্পে পশুর সঙ্গে মানুষের বিবাহ কিংবা 'অশোকা' গল্পে হরিণের মানব সন্তান প্রসব করা (এবং যে সন্তান আবার এক মুনির) প্রভৃতি ঘটনাগুলি পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায়, রূপকথা জগতের এই অস্বাভাবিক ভাবনাগুলি প্রকৃতই তা নয়। ভিন্ন ভিন্ন কুলপ্রতীক সম্পন্ন মানুষকে সংশ্লিষ্ট পশুর নামেই ডাকা অসম্ভব ছিল না।

দ্বিতীয়ত, যেহেতু একই টোটেম ভুক্ত মানুষের আন্তর্বিবাহ হত না, তাই বাঁদরের সঙ্গে কোনো কন্যার বিবাহ হওয়াই সম্ভব। যখন দেখা যায় সেই বাঁদর শেষ পর্যন্ত মানুষ, ভূমিষ্ঠ শঙ্খেরও পরিণতি মানুষে, তখন আর সংশয় থাকার কথা নয়।[৫]

কোনো কোনো লোকক্রীড়ার মধ্যেও কুলপ্রতীক সংক্রান্ত ভাবনা প্রচ্ছন্ন আছে। এ বিষয়ে কোনো কোনো গবেষক যথেষ্ট সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গী ও তথ্যপ্রমাণ দাখিল করেছেন। এপ্রসঙ্গে 'কুকুর-শকুনী', 'বাঘছাগল', 'ছি ছত্তর' 'পুকুরের ব্যাঙ' ইত্যাদি খেলার নামোল্লেখ করা যায় যেখানে পশুনামের মধ্যে আসলে ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীর টোটেমের নামই ঘোষিত হয়েছে।

'কুকুর-শকুনী' খেলায় মৃতবৎ কুকুরটিকে ঘিরে শকুনীদের নৃত্য। হঠাৎ কুকুররূপী বালকটি শকুনীরূপী যে কোনো খেলোয়াড়কে স্পর্শ করতে ছুটে যায়। ছুঁতে পারলে, স্পৃষ্ট খেলোযাড় কুকুরে রূপান্তরিত হবে। এই খেলার সময় শকুনীরূপী বালকেরা যে ছড়াটি আবৃত্তি করে তা লক্ষ্য করার মত :

'আমরা যত শকুনী
মরা দেখি যখনি
উইড়া পালাই তখুনি
শোঁ-শোঁ-শোঁ।'

উল্লেখ্য, মরা দেখে শকুনীর উড়ে পালানো স্বাভাবিক নয়, এখানে শকুনী টোটেমের গোষ্ঠী কুকুর কুলপ্রতীক সম্পন্ন গোষ্ঠীর দ্বারা চিহ্নিত বলেই এই পলায়নপর মনোবৃত্তি। গবেষক বিক্রমপুরের রাজা শ্যামলবর্মা বা তাঁর পূর্বে আসাম শ্রীহট্টের রাজা অধিধর্মপার শকুন বলি যজ্ঞের ঐতিহাসিক তথ্যাদি পেশ করে প্রমাণ করেছেন ঐ নামেই নয় শ্যেনপক্ষী, সুপর্ণপক্ষী ইত্যাদি নামে আরো টোটেম বিশ্বাসী ও টোটেমের

পরিচয় পাওয়া যায় যাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘাত লেগেই থাকত। প্রাগুক্ত খেলায় এমনই দু'টি টোটেমগোষ্ঠীর সংঘাত ও জয় পরাজয়ের ইতিহাসই প্রচ্ছন্ন। তেমন বাঘ-ছাগল, ছি ছত্তর ও প্রাগুক্ত ক্রীড়াগুলির ঐসব পশু নাম আসলে টোটেমেরই নাম এবং এইসব ক্রীড়া আসলে ভিন্ন ভিন্ন টোটেমভুক্ত গোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব সংঘাত— জয়-পরাজয়ের ইতিহাসের প্রতীকী ক্রীড়ারূপ মাত্র।[৬]

বস্তুত এইভাবে কুল ও কুলচিহ্ন আর্যীকৃত হয়েও বাংলার লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন প্রাঙ্গণে— বিভিন্ন প্রথায় অনুষ্ঠানে মূক ঐতিহাসিক উপাদানের মত এখনও বেঁচে আছে।

লোকঔষধ— বিজ্ঞান সংস্কারের লৌকিক মেলবন্ধন

(খ)

মানুষ ব্যাধির হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে চায়। যুগ যুগ ধরে তাই রোগ নির্ণয় ও তার উপশমের পথ আবিষ্কারে মানুষ মগ্ন। মানব সমাজে— ইতিহাসে ও সংস্কৃতিতে মানুষের এই প্রয়াস সবিশেষ প্রভাব বিস্তার করে আসছে।[৭] ফলে ব্যাধির চিকিৎসা পদ্ধতি মানব সমাজে একটি সংস্থা বা institution বলে পরিগণিত হতে পারে।

মানব সমাজে রোগ নির্ণয় ও তার প্রতিকার পদ্ধতির দুটি প্রধান ধারা অস্তিত্ববান। একটি যাদুধর্মীয় (Magico-religious) বা লৌকিক ঐতিহ্যের (Folk Tradition) এবং অন্যটি বিজ্ঞানভিত্তিক আধুনিক ঐতিহ্যের (modern scientific tradition) ধারা। বলাবাহুল্য প্রথম ধারাটিই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যবাহী— প্রাচীন এবং সমাজ সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের আলোচ্য। এই ধারাটি মানুষের বিভিন্ন প্রাচীন বিশ্বাস সংস্কার, যাদুধর্মী ক্রিয়াচার যেমন ঝাড়ফুঁক, তুকতাক, বিভিন্ন ঔষধ প্রদান ও পূজা-অনুষ্ঠান ইত্যাদি নিয়ে সমৃদ্ধ। এর মধ্যে মানুষের সাধারণ বাস্তব বা কার্য-কারণ জ্ঞানও প্রযুক্ত হয়। ফলে এই ধারাটি সম্পূর্ণই মিথ্যা, অবৈজ্ঞানিক বা ভিত্তিহীন নয়— আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা পদ্ধতির উন্মেষ ও বিকাশে ঐ প্রাচীন ধারাটিরও যথেষ্ট দান আছে।[৮]

নৃবিজ্ঞানী W.H.R. Rivers— যিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রথম নৃবিজ্ঞানী, তিনি তাঁর বিখ্যাত 'Medicine, Magic and Religion (1924) গ্রন্থে পৃথিবীর আদিম মানবগোষ্ঠীর জীবনধারা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা ক'রে সিদ্ধান্তে এসেছেন যে আদিম মানবগোষ্ঠী যেসব কারণে রোগের সৃষ্টি হয় বলে মনে করে, তা মূলত তিনটি পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, যেমন— প্রাকৃতিক মাধ্যম (natural agency), অতিপ্রাকৃত মাধ্যম (supernatural agency) এবং মানব মাধ্যম (human agency)।

বিভিন্ন ব্যাধি ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃতিক কারণে সৃষ্টি হতে পারে। জলবায়ু ও

আবহাওয়ার তারতম্য, অত্যধিক বৃষ্টিপাত, শীত ইত্যাদি মানুষের রোগের কারণ। জল, বায়ু, খাদ্য— ইত্যাদির মধ্যে বিভিন্ন জীবানু বা ক্ষতিকারক পদার্থ প্রভৃতি মানব শরীরে বাহিত হয়ে রোগ সৃষ্টি করে। ক্ষতিকারক বিষাক্ত পদার্থ দর্শনে বা তা স্পর্শ করলেও রোগ হয়। সুতরাং বিশ্রামের স্বল্পতা, অত্যধিক পরিশ্রম, অনিয়মিত বা দূষিত খাদ্য গ্রহণ, সংযমহীন অবাধ ও অপর্যাপ্ত যৌন মিলন, বিভিন্ন ব্যাধির সৃষ্টি করে। বিশেষ বিশেষ কীট-পতঙ্গ বা প্রাণীর দ্বারাও রোগব্যাধির সৃষ্টি হয়।

অতিপ্রাকৃত মাধ্যমভিত্তিক ব্যাধি ও তার প্রতিকার পদ্ধতিগুলি বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মত, কেননা এখানে মানুষের বিশ্বাস— সংস্কারই মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে, যেমন নিয়েছে মানব-মাধ্যমভিত্তিক ব্যাধির ক্ষেত্রেও। অতিপ্রাকৃত মাধ্যমগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ট্যাবুর অবমাননা, অশুভ ভৌতিক শক্তির ক্রোধ বা প্রভাব, দেব-দেবীর ক্রোধ, গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব, কোথাও কোথাও পূর্বজন্মের কর্মফল ইত্যাদির বিশ্বাস প্রভৃতি।

লোকসমাজে 'নিষেধ' (ট্যাবু) অমান্য করা ভয়ঙ্কর অপরাধ। জ্ঞানত বা অনবধানতাবশত যদি কেউ ট্যাবু লঙঘন করে তবে তার বিভিন্ন ব্যাধি হয় বলে তাদের বিশ্বাস। ট্যাবুর ভিন্নতা ও গুরুত্ব অনুযায়ী রোগ কঠিন বা সরল হতে পারে। উল্লেখ্য ট্যাবু লঙঘনকারীর শাস্তি অনিবার্য, তবে সব ট্যাবু লঙঘন করলেই যে মানুষকে রোগ-ব্যাধির কবলে পড়তে হয় তা নয়।

লোকসমাজের বিশ্বাস মৃত্যুর পর মানুষের আত্মা কখনো কখনো বিভিন্ন কারণে ভূত-প্রেত বা ভৌতিক শক্তি হিসেবে সূক্ষ্ম শরীরে সর্বত্র বিরাজ করে, এবং বিশেষ বিশেষ কারণে— বিশেষত অপঘাতে মানুষের মৃত্যু হলে সেই আত্মা জীবিত মানুষের ক্ষতি সাধনে প্রয়াসী হয় এবং বিশেষ পরিস্থিতি বা সুযোগে সেই বিদেহী আত্মা মানুষের অভ্যন্তরে প্রবেশ ক'রে তার রোগ সৃষ্টি করে। অনবধানতাবশত আত্মাকে অবমাননা করলেও একইভাবে আত্মা মানুষের ব্যাধি সৃষ্টি করে।

দেব-দেবী কোনো কারণে অসন্তুষ্ট হলে তাঁদের ক্রোধও মানুষের ব্যাধি সৃষ্টির কারণ হয়। আবার বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্র ও তার কুপ্রভাবেও মানুষের ক্ষতি হয় বা বিভিন্ন রোগে মানুষ আক্রান্ত হয় বলে লোকসমাজের বিশ্বাস।

ভারতবর্ষের মানুষ জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী। তাই লোকসমাজের বিশ্বাস বর্তমান জন্মে মানুষের কোনো কোনো ব্যাধি আসলে তার পূর্বজন্মের কু-কর্মেরই শাস্তি। বিশ্বাস এই যে, কু-কর্মের ফল এ জন্মে না হলেও অন্তত পরজন্মেও তাকে ভোগ করতে হবে।

লোকসমাজে যাদুকর, গুণিন— এদের কদর কতখানি তা আমাদের অবিদিত নয়। আদিম সমাজ থেকেই যাদুকর সমাজের শীর্ষস্থানে অবস্থান ক'রে আসছে, কারণ তাঁদের বিভিন্ন হিতকারী ও অহিতকারী ক্ষমতা করায়ত্ত। মধ্যযুগেও সর্বত্রই রাজার উপরে যাদুকরের স্থান ছিল— ইতিহাস সেই সাক্ষ্যই দেয়। যাদুকর বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও অতিপ্রাকৃত শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম— লোকসমাজের এই বিশ্বাস ছিল

মজ্জাগত। সুতরাং সর্দার, যাদুকর এরা প্রয়োজনে প্রভূত ক্ষতিসাধন ও রোগ সৃষ্টি ক র . ে ত ও
পারঙ্গম;তারা বিভিন্ন যাদুবিদ্যা বা মায়াবিদ্যার (sorcery) মাধ্যমে অর্থাৎ অশুভ শক্তি ও ক্ষমতা প্রয়োগ ক'রে মানুষের মৃত্যু ঘটাতে বা রোগ সৃষ্টি করতে সক্ষম হত।

আবার সমাজের কোনো কোনো মানুষ 'অপয়া' বলে লোকগোষ্ঠীর বিশ্বাস। সেই সব মানুষের স্পর্শ, দৃষ্টি বা কথা সুস্থ মানুষের— বিশেষত শিশুদের দেহে রোগের সঞ্চার করে।

ডাইনী বা ডাকিনীর অস্তিত্ব পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি আদিম জনগোষ্ঠীতে বিদ্যমান ছিল— এমন কি আমাদের দেশে এখনো ডাইনীর অস্তিত্ব লুপ্ত হয়নি, সংবাদপত্রে ডাইনী সন্দেহে নরহত্যার দৃষ্টান্ত দুর্লভ নয়। তাদের রহস্যময় কার্যকলাপ গভীর রাত্রে যত্রতত্র সংঘটিত হয়। তাদের রক্তলোলুপতা প্রবাদ-প্রতিম। ডাইনীর কবলে পড়লে মানুষের— বিশেষত শিশুদের নিস্তার পাবার কোনো পথ নেই,— সুস্থ সবল মানুষ রক্ত বমি করে, প্রবল জ্বরে পড়ে এবং ধীরে ধীরে রক্তশূন্য হয়ে মারা যায়। বিশ্বাস,— এইভাবে ডাইনী দূর থেকেও বিশেষ ক্ষমতা বলে মানুষের রক্ত পান ক'রে নিজের তৃষ্ণা মেটায়। পৃথিবীর বহু দেশেই এমনভাবে লোকসমাজে ডাইনী বিশ্বাস ছিল, এ যুগেও কোথাও কোথাও আছে।

লোকসমাজের এই বিশ্বাসগুলি যেমন মানুষের বিভিন্ন ব্যাধির কারণ আবিষ্কারে তৎপর, তেমনি ব্যাধির অপনোদনেও ক্রিয়াশীল। কাজেই আদিম চিকিৎসা পদ্ধতিতে (primitive treatment procedures) স্বভাবতই অতিপ্রাকৃত ঘটনাবলীই মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। তাই লোকগোষ্ঠীতে এখনো ডাক্তার বদ্যির চেয়ে ওঝা, পুরোহিত, গুনিণ বা যাদুকরের প্রাধান্য ও প্রভাব অনেক বেশি। এবং এদের উপর লোকমানসের বিশ্বাস ও নির্ভরতাও অপরিমেয়। এরা বিভিন্ন উপায়ে তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী মানুষের দেহাভ্যন্তরস্থ রোগসৃষ্টিকারী দুষ্ট আত্মা বা কুপ্রভাবকে দূরীভূত করে। কখনো ভেষজ চিকিৎসায় রোগের উপশম ঘটায়। তবে হাত সাফাই, যাদুমূলক কৌশল, মন্ত্র-তন্ত্র ইত্যাদিই তাদের চিকিৎসা পদ্ধতির বেশিরভাগ স্থানটি জুড়ে আছে। লোকসমাজে বেশিরভাগ রোগই তাদের আধিভৌতিক বিশ্বাসের কারণে ঘটে থাকে। ফলে ওঝা, যাদুকর এদের উপস্থিতি ও ক্রিয়াকলাপে রোগী আশ্বস্ত এবং সুস্থ হয়। বস্তুত লোকসমাজের বহু ব্যাধি নিরাময় পদ্ধতি মূলতঃ মনঃসমীক্ষণ ভিত্তিক (psychotherapy) চিকিৎসা পদ্ধতি হিসেবেই কার্যকরী হয়। এ বিষয়ে সিগমুন্ড ফ্রয়েড তাঁর 'টোটেম ও ট্যাবু' গ্রন্থে বিস্তৃত এবং বিশ্বস্ত আলোচনা করেছেন। লওই ও দেখিয়েছেন যাদুকরদের চিকিৎসাপ্রণালী নিয়ে কারোর কোনো প্রশ্ন তোলার প্রয়োজন হয় না কেননা রোগীর কাছে ফল লাভই বড় কথা। তাঁর ভাষায়, ''Unsophisticated people want results, and if they get well they do not ponder the problems of scientific pathology.''[১]

গ্রাম বাংলায় আজও এই জাতীয় চিকিৎসার মূল্য বিন্দুমাত্র কমেনি। বিভিন্ন

ভেষজ— অর্থাৎ লতা-পাতা-ফল-মূল ইত্যাদি প্রয়োগে যেমন চিকিৎসা হয়, তেমন বিভিন্ন দেব-দেবীর পুজো-আর্চার মাধ্যমেও মানুষ ব্যাধি নিরাময় করতে চায়। বিভিন্ন ব্যাধি নিরাময়ের জন্য বিশিষ্ট সব দেব-দেবী বিদ্যমান। তাঁদের অনেকেরই বিশেষ জাগ্রত। মনসা, চণ্ডী, শীতলা, বিপদতারিণী, ওলাবিবি— এমন বহু দেবতা নিয়মিত পূজিতা হন। এঁদের পুজো করেন সমাজের অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের বা অব্রাহ্মণ কোনো পুরোহিত— যারা সাধারণতঃ দেয়াশী নামে খ্যাত। দেয়াশীর 'ভর' হয়। দেয়াশী বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন বলেই তার ভর হয়। এই সময় খানিকটা হিস্টিরিয়াগ্রস্ত রোগীর মত তার অবস্থা হয়। ভর নামার অর্থ দেয়াশী কিছুক্ষণের জন্য অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন হয়ে পড়ে এবং সরাসরি কোনো বিশিষ্ট দেব-দেবীর সঙ্গে যোগাযোগ সক্ষম হয়ে 'সর্বদ্রষ্টা' হয়ে ওঠে। সাধারণ মানুষের জটিল সমস্যার উত্তর বা রোগের প্রতিকার কীভাবে হবে তা দেয়াশীর মুখ দিয়ে প্রকাশ পায়। আবার নির্দিষ্ট সময়ে বিশেষ মন্ত্রপূত জল তার গায়ে ছিটিয়ে দিলে সে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। 'ভর' বিশেষ বিশেষ দিনে, তিথিতে এবং দেবস্থানে হয় এবং এর জন্য দেয়াশীকে বেশ কিছু নিয়ম নিষ্ঠার মধ্যে থাকতে হয়।

বিভিন্ন সমস্যা বা রোগ উপশমের জন্য দেয়াশী বা পুরোহিত মন্ত্রপূত ফুল, ফল, পাতা বা প্রসাদ রোগীকে দেয়। রোগী গভীর শ্রদ্ধা ভক্তি ও বিশ্বাসের সঙ্গেই তা খায়, দেহে 'স্পর্শ' বা 'ধারণ' করে। বিশ্বাস রাখে এতেই তার রোগ দূরীভূত হবে।

গ্রাম-বাংলার ওঝা বা গুণিন যে সমস্ত পদ্ধতিতে রোগ নিরাময় করে তার অনেকটাই যাদুমুলক আচার, তুকতাক মন্ত্রতন্ত্র এবং কিছুটা ভেষজ দ্রব্যগুণের সাহায্যে সংঘটিত হয়। সাপেকাটা বা 'ভূতে পাওয়া' মানুষকে বাঁচানোর জন্য তাদের ডাক পড়ে। এছাড়াও বিভিন্ন ক্ষেত্রে লোকগোষ্ঠীর কাছে তারা অপরিহার্য।

হিন্দু মুসলমান উচ্চ নীচ নির্বিশেষে লোকায়ত মানুষ পীরের দরগায় যায়। পীরের দেওয়া 'জলপড়া' বা মন্ত্রপূত জল রোগীর গায়ে ছিটিয়ে বা পান করিয়ে রোগ উপশম হয় বলে তাদের বিশ্বাস। এছাড়া তাবিজ কবজ মাদুলি তো আছেই। শুধু মানুযেব ক্ষেত্রেই নয় সমগ্র লোক ঔষধ মানুষ বা গৃহপালিত প্রাণীর উপরেও প্রযুক্ত হয়। লোকসাহিত্যে এই সমস্ত লৌকঔষধের প্রসঙ্গ বা উল্লেখ কোথাও কোথাও লক্ষ্য করা যায়। আমরা তার কতিপয় দৃষ্টান্ত উপস্থিত করতে পারি। আমাদের রূপকথাগুলির রাজারা প্রায়শই নিঃসন্তান। বিশাল সাম্রাজ্য, প্রভূত বিত্ত, অসংখ্য দাস-দাসী, হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া— সবকিছু থাকা সত্ত্বেও রাজার মনে সুখ নেই, শান্তি নেই। কেননা তাঁর কোনো উত্তরাধিকার নেই। অহোরাত্রই তাঁর মনে প্রশ্ন, তাঁর পর কে সিংহাসনে উপবিষ্ট হবে, কে তাঁর রাজ্য শাসন করবে? অন্যভাবেও দেখা যায় রাজা নিঃসন্তান, তাই রাজবাড়ির চাকর-বাকর, মেথর-মালী অর্থাৎ নিম্নপদস্থ কর্মচারীরা পর্যন্ত রাজাকে এড়িয়ে চলে, পারতপক্ষে কেউই সকালে রাজার মুখ দেখতে চায় না। অপুত্রক রাজার মুখ দেখলে সারাটা দিন মন্দ কাটিবে— এই আশঙ্কা। রাজা জানতে পারেন, তিনি সকলের অবজ্ঞার পাত্র হয়েছেন, তাঁর মুখদর্শন করা থেকেও

সকলে বিরত থাকার চেষ্টা করছে। মনের দুঃখে রাজা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তিনি তাঁর রাজ্যপাট কিংবা রাণীদের ত্যাগ করে যে দিকে দু'চোখ যায় সেদিকেই চলে যাবেন! অপুত্রক হয়ে সকলের করুণা কিংবা অবজ্ঞার পাত্র হয়ে আর রাজ্যপাট চালাবেন না। কখনও বা রাজাকে দেখা যায় বনে যেতে উদ্যত, কিংবা নদীতে ডুবে মরার সঙ্কল্পে তিনি দৃঢ় হয়েছেন। অথবা গোসাঘরে খিল এঁটেছেন আমরণ অনশনের পণ করে। শেষপর্যন্ত কিন্তু দেখা যায় যে রাজাকে বনে যেতে হয়নি কিংবা নদীর জলেও জীবন বিসর্জন দিতে হয়নি। অথবা গোসাঘরে খিলও আঁটতে হয়নি। কেননা তাঁর মনোবাঞ্ছা পূরণের ব্যবস্থা হয়েছে। সন্তানহীনতার অভিশাপ থেকে তিনি মুক্ত হয়েছেন। কোনো এক সন্ন্যাসীর আবির্ভাব ঘটেছে। তিনি নিঃসন্তান রাজাকে বা বড় রাণীকে দিয়ে গেছেন গাছের শিকড় অথবা আশ্চর্য ফল কিংবা কোনো পক্ষী বা এই জাতীয় কিছু। সন্ন্যাসী প্রদত্ত এই জাতীয় কিছু ভক্ষণ ক'রেই বন্ধ্যা রাণী সন্তানবতী হয়েছেন। শুধু আমাদের রূপকথাতেই এই বিষয়টি স্থান পেয়েছে তা নয়, সমস্ত পৃথিবীব্যাপী রূপকথাতেই অলৌকিক জন্ম বৃত্তান্ত সমৃদ্ধ মটিফেব সন্ধান পাওয়া যায়। স্টিথ থম্পসন তাঁর গ্রন্থে এই আনন্যাচারাল বার্থ মোটিফগুলিকে 'টি'-এর পর্যায়ভুক্ত করেছেন। যেমন—

টি ৫১১-১ কোনো ফল খেয়ে সন্তানবতী হওয়া,
টি ৫১১-১-১ আপেল খেয়ে সন্তানবতী হওয়া,
টি ৫১১-১-৩ আম খেয়ে সন্তানবতী হওয়া,
টি ৫১১-১-৪ কমলালেবু খেয়ে সন্তানবতী হওয়া,
টি ৫১১-২ লতাগুল্মাদি ভক্ষণের মাধ্যমে সন্তান লাভ।
টি ৫১১-২-০-১ বৃক্ষের শিকড় আহারেব মাধ্যমে সন্তান লাভ।
টি ৫১১-৫-৪ কোনো পক্ষীর মাংস খেয়ে সন্তান লাভ প্রভৃতি।

বস্তুত সন্ন্যাসী প্রদত্ত এই সব ফলমূল ইত্যাদি বিশেষ গুণসম্পন্ন অর্থাৎ ঐন্দ্রজালিক গুণসম্পন্ন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই ঐন্দ্রজালিক গুণসম্পন্ন বস্তুগুলি তাই নিঃসন্দেহে লোক ঔষধ হিসেবে বিবেচিত হয়।

এই জাতীয় লোকঔষধ বশীকরণ করা, অবয়ব রূপান্তর করা— ইত্যাদি ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়— যা লোককথায় প্রায়শই লক্ষ্য করা যায়। সাধারণত কোনো বিশেষ শিকড় কারোর মাথায় বা চুলে বেঁধে দেওয়া বা টিপে দেওয়া হলে সে অন্য প্রাণীতে রূপান্তরিত হয়। যেমন 'শিকড়ে গুণ' গল্পে 'দুষ্ট বরণমালা কাঞ্চনমালার চুল ধুইয়া দিবার ছল করিয়া একখানা শিকড় যেমনি চুলের গোড়ায় বাঁধিয়া দিল, অমনি সে একটা কচ্ছপের আকার ধারণ করিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল।'[১০] আবার কচ্ছপের মাথা থেকে সওদাগর শিকড়টি সরিয়ে ফেলতেই সে মনুষ্যদেহ ধারণ করল। 'মুক্তি' গল্পে পুকুরের ভিতর সৃষ্ট বিশেষ একপ্রকার লতা ডাইনীর দেহে ঘসে দিলে ডাইনী বেহুঁস হয়ে যায়।[১১] 'ত্রিনাথ' গল্পে গুরুঠাকুর 'ত্রিনাথ' দেবের পূজার স্থান থেকে নেওয়া ধূলি অসুস্থ পুত্রদের মাথায় স্পর্শ করাতেই তারা সুস্থ হয়ে ওঠে।[১২] এ প্রকার

বহু দৃষ্টান্তই লোককথায় খুঁজে পাওয়া যায়।

বাংলা প্রবাদেও বিভিন্নভাবে লোকঔষধ ও তৎসম্পৃক্ত বিষয়ের উল্লেখ আছে, কখনো ব্যঙ্গ, কখনো পরোক্ষে ঔষধের গুণাগুণ। যেমন ভেষজ প্রতিরোধক হিসেবে পরোক্ষভাবে তেঁতুলের গুণাগুণ।

'যেমন বুনো ওল, তেমনি বাঘা তেঁতুল।' ওল বা কচু খেলে গলা ধরে। লোকসমাজে তার প্রতিষেধক হিসেবে তেঁতুল ব্যবহৃত হয়। এটি প্রত্যক্ষভাবেই প্রতিষেধক।

ফকির বা গুণিন যে ঔষধ ব্যবহার করেন, তা ঐন্দ্রজালিক। কিন্তু লোকসমাজে ঐন্দ্রজালিক ঔষধ বা ফকিরের ক্ষমতা সম্পর্কে কখনো কখনো সন্দিহান হয়ে ওঠে, আবার ভেষজ ঔষধ প্রদানকারী বৈদ্যের অক্ষমতাও কখনো কখনো ধরা পড়ে। ফলে প্রবাদে তা নিয়ে ব্যঙ্গ লক্ষ্য করা যায়—

'ঝড়ে কাক মরল, ফকিরের কেরামতি বাড়ল'।
'হরি বাঁচায় প্রাণ, বৈদ্যের বাড়ে মান'।
'মূর্খ বৈদ্য যমের সমান।'

ঐন্দ্রজালিক তাগাবাঁধা লোকসমাজের একটি পরিচিত প্রতিকার পদ্ধতি বলে তা নিয়ে প্রবাদ—

'শিরে হল সর্পাঘাত তাগা বাঁধবি কোথায়।'

ওঝার প্রতি ভরসা নিম্নলিখিত প্রবাদটিতে :

'যেমন রোগ তেমন ওঝা'।

তেমন ওঝাকে নিয়ে ব্যঙ্গ করতেও ছাড়েননি লোক কবি :

'রোজার ঘাড়ে ভূত'।

বিভিন্ন প্রবাদে ঔষধ প্রসঙ্গও স্বাভাবিকভাবে আছে—

'মরবার ওষুধ গলায় বেঁধেছে।'
'এর ওষুধ লোমান হকিমও জানে না।'
'ভিন রোগের ভিন ওষুধ'।

ফল, আনাজপাতি ওষুধ হিসেবে অনেক ক্ষেত্রেই অদ্বিতীয়। বিভিন্ন প্রবচনে তার উল্লেখ আছে। যেমন—

'কফ পিত্ত বাই তিন নাশে পটোল ভাই'।
'চক্ষু রোগে কেন মর নিজের মূলটি কণ্ঠে ধর' ইত্যাদি।[১৩]

এছাড়া বাংলা লৌকিক ছড়ার ভাণ্ডারটিতেও কিছুটা লোকঔষধ ও চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়টি প্রতিফলিত। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে রোগ নিরাময়ের জন্য বিভিন্ন দেবদেবী লোকসমাজে গড়ে উঠেছে, তাঁদের অর্চনায় মন্ত্র হিসেবে যা ব্যবহৃত হয় তা যে প্রকৃতপক্ষে ছড়া অন্যত্র তা আমরা দেখেছি। রোজা গুণীনের ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়াতেও সমভাবে ছড়ার ব্যবহার। তা ভূত তাড়ানোর ক্ষেত্রেই হোক বা সাপে

কাটার চিকিৎসাই হোক। সুতরাং লোকচিকিৎসা ও লোকঔষধ বিষয়টিকে ভিত্তি করে বাংলা লোকসাহিত্যের কিয়দংশ সৃষ্টি হয়েছে বা লোকসাহিত্যে তার কিছু প্রতিফলন ঘটেছে।

আইন ও শাস্তি — আদিম মানুষের কর্তব্য ও নীতিবোধের প্রতিফলন

(গ)

আদিমকাল থেকেই মানুষের যূথবদ্ধ জীবন-যাপনের প্রবণতা ছিল, —এই সত্য পৃথিবীর প্রত্যেক নৃবিজ্ঞানীই স্বীকার ক'রে নিয়েছেন। এর স্বপক্ষে বহু ঐতিহাসিক প্রমাণও আবিষ্কৃত হয়েছে। সুতরাং এই যুক্তি অনিবার্য যে, আদিম মানুষও ব্যক্তিগত ইচ্ছে অনিচ্ছে ও আচরণকে কতকগুলি সর্বজনীন বিধি-নিষেধের দ্বারা সীমায়িত করতে পেরেছিলেন, নতুবা গোষ্ঠী জীবন-যাপন সম্ভব হয়ে উঠত না। একটি গোষ্ঠী বা একাধিক কতকগুলি গোষ্ঠীর প্রতিটি সদস্য যখন কতকগুলি সুস্পষ্ট বিধি-নিষেধ বা নিয়ম-কানুনের দ্বারা নিজেদের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করতে শিখল, তখন নিঃসন্দেহে ঐ নিয়ম কানুনগুলি 'সার্বিক' অর্থাৎ সমাজস্বীকৃত— সে সমাজ যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন। অতএব ঐ সমাজ স্বীকৃত— সার্বজনীন নিয়ম কানুনগুলিই 'আইন' (rules) অভিধা পেতে পারে। এক বা একাধিক গোষ্ঠীর সমন্বয়ে গঠিত একটি ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ সমাজের প্রতিটি সদস্য ঐ আইন-কানুনগুলি মেনে চলতে বাধ্য এবং কোনো কারণে এই আইন অমান্য করলে তাকে বা তাদের শাস্তি পেতে হবে। কিন্তু উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, আদিম মানুষ মূলত স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই আইন মেনে চলত, কেননা আইন সৃষ্টির মূলে ব্যক্তি জীবনকে নিরাপদ ও সুখী করার প্রবণতাই প্রত্যক্ষ ছিল। নৃ-বিজ্ঞানী পিডিংটোন তাই বলেছেন :

"All communities have rules which direct human behaviour and cure human impulses, and for the most parts these are obeyed fairly generally, because it is usually easier and more profitable to conform".[১৪]

বর্তমানে, অর্থাৎ আধুনিক পৃথিবীতে 'আইন' প্রথাটির সঙ্গে দুটি বিষয় অন্বিত। একটি হল 'রাষ্ট্র' অন্যটি 'শাস্তি'। রাষ্ট্র যখন তার সার্বভৌম ক্ষমতার সাহায্যে তার প্রতিটি নাগরিকের উপর বলবৎযোগ্য নিয়ম-কানুন নির্ধারণ করে এবং যা অমান্য করলে নাগরিককে রাষ্ট্র শাস্তি দেয়— সেই নিয়ম-কানুনগুলিই আইন (rules) কিন্তু এই আইন আধুনিক আইনের (laws) সমার্থক নয়, যেহেতু আদিম সমাজে রাষ্ট্রের অস্তিত্বই ছিল না, ছিল না কোনো সংবিধান (constitution)।

তবু উদ্দেশ্যের দিক থেকে এই দু'ক্ষেত্রের মধ্যে মূলগত পার্থক্য বিশেষ কিছু নেই। প্রতিটি ক্ষেত্রেই মানুষ শৃঙ্খলিত, সংযত জীবনকেই যাচ্ঞা করেছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই মানুষের নৈতিক বুদ্ধি বা শুভবোধ কার্যকরী হতে চেয়েছে বা তার বিশেষ ভূমিকাই বড় হয়ে উঠেছে।

প্রসঙ্গত প্রথা (custom)'র সঙ্গে আইনের সাদৃশ্য আছে বলে মনে হতে পারে, কিন্তু তা আদিম আইনের সঙ্গে। কেননা প্রথা হল সমাজ বা গোষ্ঠীবদ্ধ জাতির পালনীয় বিশেষ কিছু আচার আচরণ। তা বহুলাংশেই মানুষের বিশ্বাস সংস্কার ও অভ্যাসের সঙ্গে ওতপ্রোত। প্রথা অমান্য করা নিন্দনীয়— কিন্তু আধুনিক সমাজে প্রথা লঙঘন করা দণ্ডনীয় অপরাধ নয়। কোনো কোনো প্রথা অবশ্য আইনে রূপান্তরিত হতে পারে, একমাত্র সে ক্ষেত্রেই প্রথা লঙঘনের অর্থ আইন অমান্য করা অর্থাৎ তখন তা দণ্ডনীয় অপরাধ।

কিন্তু আমরা আগেই উল্লেখ করেছি আদিম সমাজে রাষ্ট্র ও তার সার্বভৌম ক্ষমতার অস্তিত্ব ছিল না। তবু মানুষ তার আচাব-আচরণকে সর্বজনীন কতকগুলি নিয়ম-কানুন মেনে চলে নিয়ন্ত্রিত করেছে, অধ্যাপক এইচ. আর. লওঈ তাঁর Social Organisation (১৯৫০) গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। কাজেই আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি, যে আদিম মানুষ যেসমস্ত অবশ্য পালনীয় নিয়ম-কানুন মেনে চলত তা আইন (primitive law) বলে বিবেচিত হতে পারে।

আদিম সমাজেও আইন অমান্যকারীকে শাস্তি পেতে হত। প্রাগুক্ত গ্রন্থে (পৃ-১৬০) লওঈ আদিম আইন এবং আধুনিক আইনের তুলনামূলক আলোচনা করতে গিয়ে দেখিয়েছেন যে, আদিম আইন নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে বলবৎযোগ্য ছিল না— তা যেহেতু আত্মীয়তা-বন্ধনকে (kinship bond) কেন্দ্র ক'রে গড়ে উঠেছিল তাই একই আত্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে সেইসব আইন প্রযুক্ত হত। আইন ভঙ্গকারীকে এক্ষেত্রে তার আত্মীয় গোষ্ঠীই শাস্তি প্রদান করত। কখনো এই কাজে এগিয়ে আসত দলপতি, সর্দার, পুরোহিত বা যাদুকর। সমষ্টিগত অপরাধে (crime) ও ব্যক্তিগত অপরাধের (tort) মধ্যে কোনোরকম প্রভেদ ছিল না, ফলে অপরাধীর নিস্তার পাবারও উপায় ছিল না। দ্বিতীয়ত অপরাধী নিজেই নিজের শাস্তি অনেক সময়ে গ্রহণ কবত, বা সমাজ সমবেত ভাবে শাস্তি দেওয়ার চেষ্টা করত, যেহেতু আদিম আইন বহুলাংশেই নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মানুষ বা জনমতের সঙ্গে নীতিগত আদর্শ অঙ্গাঙ্গীভাবে বিরাজিত ছিল। এইজন্য আরও অপরাধীর পরিত্রাণ পাবার উপায় ছিল না, সমাজের প্রতিটি মানুষই নৈতিক তাগিদের দ্বারা চালিত হয়ে অপরাধীর শাস্তি বিধান করত। ফলে সমাজের প্রতিটি মানুষই ছিল আইন রক্ষাকারী ও শাস্তি প্রদানকারী :

"There is no escape from it and no protection against it, everybody as its representative is a police man".[১৫]

মানুষেব নৈতিক বিচার বোধের সঙ্গে ধর্মভাবনার অন্বয় গভীর। আদিম মানুষ প্রবলভাবেই প্রাকৃতিক ও অতিপ্রাকৃতিক শক্তির আরাধনা করত। বিভিন্নভাবে সেইসব শক্তিকে তুষ্ট করার চেষ্টা করত। এইসব বিশ্বাস সংস্কার থেকে তারা বুঝেছিল কোন্

আচরণ পালনীয় বা কোন্ আচরণ বর্জনীয়। এর উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছিল মানুষের ঔচিত্য অনৌচিত্য বোধ, যা তাদের আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করত। ফলে বিভিন্ন প্রকার যাদুবিশ্বাস ধর্ম বিশ্বাস প্রসূত বিধি-নিষেধ (taboo) বিশ্বাস সংস্কার— ইত্যাদিই তাদের কাছে ছিল আইন— যা তারা মনে প্রাণে পালন করতে সচেষ্ট থাকত। সেই সঙ্গে এই ধারণাও ছিল যে আইন অমান্যকারী বা বিধি নিষেধ ভঙ্গ-কারী শুধু নিজের অকল্যাণ ডেকে আনে না— তার পাপে সমাজও অবাঞ্ছিত ফল ভোগ করে। অতএব তার প্রায়শ্চিত্ত বা শাস্তি ভোগের মধ্য দিয়েই প্রতিটি মানুষের মঙ্গল সাধন সম্ভব। ফলে প্রত্যেকেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে আইন মেনে চলতে সচেষ্ট থাকত।[১৬]

আদিম আইনের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বা শাস্তি দানের প্রকার এখনো আদিবাসীদের আইনের মধ্যে প্রতিফলিত হয়ে আছে— একটু অনুসন্ধিৎসার সঙ্গে লক্ষ্য করলেই তা দেখা যাবে। যেমন, আদিম আইন আধুনিক আইনের মত উদ্দেশ্যের (intention) প্রতি সাধারণত গুরুত্ব আরোপ করে না— কৃতকর্মের দ্বারাই অপরাধ চিহ্নিত হয় বা অপরাধের গুরুত্ব নির্ণীত হয়। দ্বিতীয়ত, যৌথ দায়িত্ব (collective responsibility)-এর আর একটি বৈশিষ্ট্য। দুদিক থেকে এই দায়িত্ব প্রতিষ্ঠিত— শাস্তি দেওয়া বা বিচার করার দিক থেকে এবং শাস্তি গ্রহণের দিক থেকে। অর্থাৎ দোষীকে খুঁজে বের করা বা তার বিচার ও শাস্তি দেওয়ার দায়িত্ব যেমন গোষ্ঠীভুক্ত সকলের তেমন দোষী একাই শাস্তি পায় না, তার সহযোগী সদস্যরা বা নিকট আত্মীয়রাও সমভাবে শাস্তি পাবার যোগ্য। ফলে কোনো ব্যক্তির অপরাধের জন্য তার নিকট আত্মীয় কাউকে শাস্তি দেওয়া যেতে পারে। তৃতীয়ত, বিচার সাধারণতও সাক্ষ্য প্রামাণ (evidence) নির্ভর এবং যা মূলত শপথ গ্রহণ (oath) ও পরীক্ষাদানের (ordeal) মাধ্যমে সংঘটিত হয়। শপথ গ্রহণের ক্ষেত্রে, সকলের সামনে অপরাধী নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করে, কখনো পবিত্র কোনো পদার্থ ইত্যাদিকে স্পর্শ করে বা তার নাম স্মরণ করেও শপথ গ্রহণ করে। মানুষের বিশ্বাস মিথ্যে বললে অতিপ্রাকৃত শক্তি নিঃসন্দেহে তাকে কঠোর শাস্তি দেবে। আবার পরীক্ষা দানের ক্ষেত্রে জনসমক্ষে দোষী ব্যক্তির যন্ত্রণাদায়ক কিছু করতে হয়। যেমন দোষী ব্যক্তির কাঁটার উপর দিয়ে বা আগুনের উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া বা আগুনে হাত দেওয়া ইত্যাদি। নির্দোষ হলে ব্যক্তির রক্তপাত হবে না বা দেহ পুড়ে যাবে না বলে আদিম মানুষের বিশ্বাস।[১৭] এই প্রসঙ্গে রামায়ণে সীতার অগ্নিপরীক্ষার বিষয়টি স্মর্তব্য।

দোষী সাব্যস্ত হলে ব্যক্তিকে শাস্তি পেতে হয়। তার মধ্যে অন্যতম হল অঙ্গ হানি (mutilation), মৃত্যুদণ্ড, দণ্ডমূলক ভোজ (punitive feast) ইত্যাদি। এছাড়া গোষ্ঠী বা সমাজ থেকে বহিষ্কার বা 'একঘরে'ও করে রাখা হয়। প্রসঙ্গত আরেকটি বিষয় উল্লেখ্য, তা হল একই দোষের জন্য দোষীর পদমর্যাদা অনুযায়ী শাস্তি দান ভিন্ন ভিন্ন হয়— যা আধুনিক আইনে দুর্লক্ষ্য।

লোকআইন ও শাস্তি বিষয়টির কিছু চিত্র লোকসাহিত্যের কথা অংশে দেখতে

পাওয়া যায়। পৃথিবীর সর্বত্রই মানব সংস্কৃতির ইতিহাস যেহেতু অনেকটা একই-প্রকার, তাই যে কোনো দেশের লোককথায় ঐ প্রায় একই প্রকার আইন ও শাস্তির দৃষ্টান্ত মেলে। যাইহোক বাংলা লোকসাহিত্যের 'কথা' অংশ থেকে আদিম আইন ও শাস্তির কিছু দৃষ্টান্ত আমরা লক্ষ্য করতে পারি।

বিভিন্ন রূপকথার গল্পে রাজা যে সমস্ত শাস্তি দান করেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য গর্দান নেওয়া, শূলে চড়ানো, জীবন্ত সমাধিস্থ করা, বনবাস দেওয়া ইত্যাদি। এখানে গোষ্ঠীপতির মত রাজাই আইন এবং রাজাই যেন শেষ কথা। দুষ্কর্মের জন্য এই জাতীয় শাস্তি, প্রাণহনন, শূলে চড়ানোর মত নৃশংস প্রথা বলাবাহুল্য আদিম শাস্তিরই প্রকারভেদ। যেমন বুধকুমার রূপকুমারের প্রতি তাচ্ছিল্য, ঈর্ষা, বিশ্বাসঘাতকতা ইত্যাদির কারণে রাজা ঐ পাঁচরাজপুত্র ও পাঁচদাসীকে উপরে কাঁটা ও নিচে কাঁটা দিয়ে মাটিতে পুঁতে জীবন্ত সমাধি দিতে আদেশ দিলেন। 'বিধিলিপি' গল্পে দেখা যায়, শুধুমাত্র অদৃষ্টের কারণে ব্রাহ্মণকুমারকে রাজা শূলে চড়াবার হুকুম দিলেন। অথচ ব্রাহ্মণকুমার ছিলেন নির্দোষ, তাঁর দোষ যথার্থ কিনা তা অনুসন্ধান করা হল না এবং লোকশাস্তির ক্ষেত্রে এটিই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে স্বাভাবিক।

অনুরূপ বনবাস দান বা নির্বাসন। রূপকথাগুলি লক্ষ্য কবলে দেখা যায় যে অন্যান্য রাণীর ঈর্ষার শিকার হয়ে রাজার প্রিয় ছোটরাণীকে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই গোয়ালঘরে বা বনবাসে থাকতে হয় বিরক্ত ও আহত রাজার নির্দেশেই। শেষপর্যন্ত অবশ্য সাধুতা ও সত্যের জয় হয়। ফলে ছোটরাণীর দুঃখ যন্ত্রণা অবসিত হয় ও দোষীদের শাস্তি পেতে হয়। এক্ষেত্রে জীবন্ত সমাধির মত বনবাসও অন্যতম। যেমন 'শিকড়ের গুণ' গল্পে ঈর্ষাকাতর রতনমালা কাঞ্চনমালাকে কচ্ছপে রূপান্তরিত ক'রে ফেলে সওদাগর স্বামীকে বলে যে কাঞ্চনমালা নদীতে ডুবে গেছে। কিন্তু পরিশেষে সওদাগর কাঞ্চনমালাকে পুনরুদ্ধার করলে রতনমালা বিষ্ঠা বনে নির্বাসিত হয়। লক্ষণীয়, আদিম পুরুষতান্ত্রিক সমাজে প্রয়োজনে পুরুষ নারীকে হত্যা করতে বা কঠোর শাস্তি দিতে পারত আপন ক্ষমতাবলেই— সেখানে গোষ্ঠীপতি বা রাজার অনুমতি নিষ্প্রয়োজন, আলোচ্য দৃষ্টান্তটি অনিবার্যতই সেই সাক্ষ্য বহন করছে। (আমাদের রূপকথার বেশিরভাগ গল্পেই দেখা যায় সওদাগর ব্রাহ্মণ বা রাজার একাধিক স্ত্রী, সমাজে পুরুষ একাধিক বিবাহ করতে পারত। এবং এই বিষয়টি পুরুষতান্ত্রিক সমাজেই সম্ভব।)

'হীরামতী' গল্পেও দেখা যায় একটি কথাবলা হীরামন পাখির আকর্ষণের কারণে অবহেলিত সাত রাণী পাখিটিকে হত্যা করতে যায় এবং ব্যর্থ হয়। রাজা বিষয়টি অবগত হয়ে রাণীদের বনে নির্বাসন দেন, বনের পশু তাদের খেয়ে ফেলে।

লোককথার একটি অন্যতম মটিফ দণ্ডদাতা মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত ব্যক্তির রক্ত দেখতে চায় বা সেই রক্তে স্নান করতে চায়। যেমন, 'উমনো-ঝুমনো' গল্পে স্ত্রী

উমনো অপয়া বলে রাজা তাকে কেটে তার রক্ত দেখার নির্দেশ দিলেন মন্ত্রীকে। অবার সৎমার সৎপুত্রদের প্রতি অমানুষিক নিষ্ঠুরতা এবং পরিশেষে তজ্জনিত শাস্তিভোগ লোককথায় সহজলভ্য। যেমন 'নিষ্ঠুর বিমাতা' গল্পটিতে সওদাগরের অনুপস্থিতির সুযোগে সন্তানদের উপর বিমাতার অকথ্য অত্যাচার করা এবং সমস্ত ঘটনা অবগত হওয়ার পর সওদাগর কর্তৃক তার স্ত্রী ভূগর্ভে জীবন্ত সমাধিস্থ হল। দুষ্কর্মের জন্য যেমন শাস্তি, তেমন নিষেধ (ট্যাবু) ভঙ্গ, দেবতার অবমাননা বা অসাধুতার জন্য অলৌকিক শাস্তির দৃষ্টান্ত লোককথায় বিরল নয়। যেমন 'মুস্কিল আসান' ব্রতকথাটিতে সওদাগর তার অকৃতজ্ঞতা ও অসাধুতার জন্য শাস্তিলাভ করেছে, মুস্কিল আসান ঠাকুর কুপিত হয়ে তার অশেষ দুঃখ দুর্দশা ঘটিয়েছেন। 'প্রতিশোধ' ব্রতকথাটিতে অনুরূপ দৃষ্টান্ত। ব্রতভঙ্গকারী ও দৈব অবহেলার জন্য 'ত্রিনাথ' গল্পেও গুরু ঠাকুর শাস্তি পেয়েছেন, শিষ্য গৃহে ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে তিনি পূজার উপকরণ ছুঁড়ে ফেলেছিলেন ফলে গৃহে এসে দেখলেন যে তার পুত্ররা জ্বরে ঘোরতর কাতর। 'জিতাষ্টমী ব্রতকথা'য়[১৯] শিয়ালী লোভের বশবর্তী হয়ে ব্রতসাঙ্গ করার আগেই খাদ্য গ্রহণ করেছিল বলে তাব সবকটিই মৃত সন্তান জন্মাল। রূপকথায় বিশেষ বিশেষ দিকে তাকানো নিষিদ্ধ, ভাইরাজকুমার বা মন্ত্রীপুত্ররা কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে নিষিদ্ধ দিকে তাকানো মাত্র সমূহ বিপদের মধ্যে পড়ে— এগুলিও ট্যাবু ভঙ্গজনিত শাস্তির দৃষ্টান্ত।

শুধু ইহলোক নয়, পরলোকেও অপরাধীর নিস্তার নেই। পার্থিব জগতে অপরাধ করা বা বিশেষ নিষেধ ভঙ্গ করার জন্য পরলোকেও আত্মাকে শাস্তি পেতে হয়, তার দৃষ্টান্তও লোককথায় আছে। এই কারণে 'যেমন কর্ম তেমন ফল'— ইত্যাদি প্রবাদ সৃষ্টি হয়েছে। যেমন 'অত্যাচারী', 'মৃতের তৃষ্ণা', 'শাশুড়ীর দণ্ড'— ইত্যাদি লোককথাগুলিতে দেখা যায় পুত্রবধূর ব্রতের আয়োজনে শাশুড়ী কখনো পদাঘাত করেছেন, কখনো অবহেলা করেছেন ব্রতের উপকরণ বিনষ্ট করেছেন। ফলে পরলোকে শাশুড়ী কোথাও তৃষ্ণা নিবারণের জন্য এক ফোঁটা জল পায় না। ইহলৌকিক জগতেও অনৈতিক কাজের জন্য রাজাকেও দৈব শাস্তি পেতে হয়, তাঁর রাজত্বে খরা দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি দেখা যায়।

বস্তুত— দেখা গেল, যে, বাংলার লোককথাগুলিতে উল্লিখিত লোকশাস্তির দৃষ্টান্তগুলি আসলে মানুষের অলীক কল্পনা নয়, আদিম লোকসমাজের প্রচলিত ধ্যানধারণা ইতিহাসেরই প্রতিফলন, হাজার হাজার বছর ধরে লোকসাহিত্যের পথ ধরে সেই সত্য কল্পনা তার গল্পের নির্মোকে, জীবন থেকে জীবনে বাহিত হয়ে চলেছে।